সমকালে বিদ্যাসাগর

স্বপন বসু



পুস্তক বিপণি
২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি, ১৯৫৭

প্রকাশক
অনুপকুমার মাহিন্দার
পুস্তক বিপণি
২৭ বেনিয়াটোলা লেন
কলকাতা-৯

প্রচ্ছদ
প্রবীর সেন

প্রচ্ছদ ও আলোকচিত্র মুদ্রক
ওয়েলনোন প্রিণ্টার্স
কলকাতা-৯

মুদ্রাকর
নারায়ণচন্দ্র ঘোষ
দি শিবদুর্গা প্রিণ্টার্স
৩২ বিডন রো
কলকাতা-৬

৬০ টাকা

অশোক উপাধ্যায়কে

নিবেদন

বাঙালির বিদ্যাসাগরচর্চার শতবর্ষ অতিক্রান্ত। এই দীর্ঘকালের মধ্যে বিদ্যাসাগরের জীবন ও কর্মের নানাদিক নিয়ে অজস্র লেখালিখি হয়েছে। অনেক মূল্যবান তথ্যনিষ্ঠ, বিশ্লেষণধর্মী আলোচনা আমরা পেয়েছি। কিন্তু এইসব আলোচকরা কেউই সমকালের মানুষজন বিদ্যাসাগরকে ঠিক কেমন দৃষ্টিতে দেখতেন, তাঁর বিভিন্ন সংস্কার-প্রয়াস সম্পর্কে ঠিক কি মত পোষণ করতেন, তা নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামাননি। কৌতূহলবশে বিষয়টি সম্পর্কে জানার জন্য সমকালীন বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার পাতা ওলটাতে শুরু করি। করতে গিয়ে অজস্র তথ্য আমাদের হাতে আসে। অন্যান্য সূত্র থেকেও আমরা প্রচুর খবরাখবর সংগ্রহ করি। এসব থেকে সমকালের চোখে বিদ্যাসাগরের ছবিটি আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এই ছবিটি প্রায়-অচেনা এক বিদ্যাসাগরের। এ কাজ করার সময় মূলত চারটি উপাদানের ওপর আমরা বিশেষভাবে নির্ভর করেছি—সমকালীন পত্র-পত্রিকা, সরকারি নথিপত্র, মিশনারি পুস্তক-পুস্তিকা ও বিদ্যাসাগর সম্পর্কে বিভিন্নজনের স্মৃতিচারণ। একালের গবেষকদের রচনাকর্ম থেকেও বেশকিছু উপাদান আমরা সংগ্রহ করেছি।

বিদ্যাসাগরকে নিয়ে পূর্ণাঙ্গ একটি কাজ করার কথা প্রথম আমার মাথায় ঢোকান অধ্যাপক শ্রীশঙ্করীপ্রসাদ বসু। তাঁর কাছ থেকে অবিরাম উৎসাহ না পেলে এ-কাজ করা আমার পক্ষে সম্ভব হত না। শুধু মৌখিকভাবে উৎসাহিত করেই তিনি ক্ষান্ত হননি, আমার অপাঠ্য লেখাকে পাঠোপযোগী করার জন্য এই বইয়ের প্রথম তিনটি অধ্যায় পরম যত্নে দেখে দিয়েছেন। অসুস্থ শরীরেও তাঁকে এই কাজ করতে হয়েছে, করার সময় স্নেহ যে কত বিষম বস্তু, তা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন!

এই বইয়ের চতুর্থ অধ্যায়টি লিখিত হয়েছে বিশিষ্ট গবেষক ও লেখক শ্রীনিখিল সরকারের পরামর্শ অনুযায়ী। তবে তিনি যেমনটি চেয়েছিলেন, তেমনটি না করতে পারার জন্য দায়ী আমার অক্ষমতা।

এ বই লেখার কাজে আমি সবচেয়ে বেশি সাহায্য পেয়েছি শ্রীঅশোক উপাধ্যায়ের কাছ থেকে। বিদ্যাসাগর সম্পর্কে অজস্র তথ্য তিনি আমাকে দিয়েছেন, তার মধ্যে যেগুলি এই বইয়ে ব্যবহার করেছি সেগুলি হল—'প্রবর্ত্তকে' প্রকাশিত পূর্ণচন্দ্র দে-র স্মৃতিচারণ, হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর একটি সাক্ষাৎকার, 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত হরিশ্চন্দ্র কবিরত্নের স্মৃতিচারণ, 'কাঁচরাপাড়া প্রকাশিকা' ও 'মালা'য় প্রকাশিত বিদ্যাসাগর সংবাদ, 'অর্চনা'য় প্রকাশিত উমেশচন্দ্র গুপ্তের প্রবন্ধ ইত্যাদি। 'সনাতন ধর্মরক্ষণী সভা'র সম্পাদক চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় আর 'জ্ঞানাঙ্কুর'-'বঙ্গদর্শনে'র নিয়মিত লেখক চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় যে এক ব্যক্তি নন—এ তথ্য তাঁর কাছ থেকেই জেনেছি। এ বইয়ের অংশবিশেষ সম্পর্কে তাঁর মতামত জেনে আমি উপকৃত হয়েছি। প্রচণ্ড ব্যস্ততার মধ্যেও এ-বইয়ের প্রুফ সংশোধনের আংশিক দায়িত্ব তিনি স্বেচ্ছায় কাঁধে

তুলে নিয়েছেন। এ বইয়ের নামকরণও তাঁরই করা। অশোক আমার দীর্ঘদিনের বন্ধু, কৃতজ্ঞতা জানিয়ে তাঁকে ছোট করতে চাই না।

আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু বাংলাদেশের বিশিষ্ট গবেষক-অধ্যাপক সুকুমার রায় ১২৬৬ বঙ্গাব্দের 'পূর্ণিমা' পত্রিকায় প্রকাশিত বিদ্যাসাগর সম্পর্কিত একটি অতি মূল্যবান লেখার দিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এটি ছাড়াও 'শিক্ষাপরিচয়' ও 'উগ্রক্ষত্রিয় প্রতিনিধি'তে প্রকাশিত দুটি লেখা তিনি আমার নজরে আনেন। ভুদেব মুখোপাধ্যায়ের 'এডুকেশন গেজেটে' 'ভ্রান্তিবিলাসে'র এক দীর্ঘ সমালোচনা প্রকাশিত হয়। উত্তরপাড়া জয়কৃষ্ণ লাইব্রেরিতে রক্ষিত 'এডুকেশন গেজেট'-এর এই সংখ্যাটি লাইব্রেরি কর্তৃপক্ষ আমাকে ব্যবহার করতে দেননি। এই সমালোচনাটি "মিত্রপ্রকাশে' পুনর্মুদ্রিত হয়। রাজসাহির বরেন্দ্র রিসার্চ মিউজিয়ামে রক্ষিত 'মিত্রপ্রকাশে'র পুরোনো ফাইল থেকে এই সমালোচনাটি অধ্যাপক রায় আমাকে উদ্ধার করে এনে দিয়েছেন।

আমার প্রাক্তন সহকর্মী অধ্যাপিকা সরস্বতী মিশ্রের সৌজন্যে অনেক বই দেখার সুযোগ পেয়েছি। আমার অনুরোধে প্রচুর সময় ব্যয় করে উত্তরপাড়া জয়কৃষ্ণ লাইব্রেরিতে রক্ষিত 'এডুকেশন গেজেট' থেকে বঙ্কিম-বিদ্যাসাগরের বিরোধ সংক্রান্ত বেশকিছু অংশ তিনি আমাকে লিখে এনে দিয়েছেন। অধ্যাপিকা সুমিতা চক্রবর্তী ব্যস্ত মানুষ। তবু সময় করে এই বইয়ের প্রথম তিনটি অধ্যায়ের পাণ্ডুলিপি দেখে আমার লেখার বেশকিছু অসংগতির দিকে তিনি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। রাজেন্দ্রলাল মিত্র যে বিদ্যাসাগরের 'বর্ণপরিচয়ে'র সমালোচনা করেছিলেন একথা প্রথম শুনি অধ্যাপক বিজিতকুমার দত্তের কাছে। তাঁর প্রদত্ত সূত্র অনুসরণ করে বেথুন সোসাইটিতে পঠিত রাজেন্দ্রলালের একটি ভাষণ থেকে এ সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণ উদ্ধার করি। রামকৃষ্ণ পরমহংসের চিকিৎসক কবিরাজ গঙ্গাপ্রসাদ সেনের সুযোগ্য বংশধর কবিরাজ শ্রীজ্যোতিপ্রসন্ন সেনের সৌজন্যে 'মধ্যস্থ' পত্রিকার দ্বিতীয় বর্ষের সংখ্যাগুলি দেখার সুযোগ পেয়েছি। ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের সম্পর্ক কেমন ছিল সে বিষয়ে ডা· দেবাশিস বসুর সঙ্গে আলোচনা করে উপকৃত হয়েছি। অধ্যাপক আবুল আহসান চৌধুরী স্বতঃপ্রবৃত্তভাবে বাংলাদেশে বিদ্যাসাগর চর্চার খবরাখবর ও সেখানে প্রকাশিত দু'একটি বইপত্র পাঠিয়ে আমায় সাহায্য করেছেন। অগ্রজপ্রতিম শ্রীবিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় 'বোধোদয়' সম্পর্কে ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি ব্যঙ্গরচনা খুঁজে পেতে আমাকে সাহায্য করেছেন। এ বইয়ের নির্দেশিকা প্রস্তুতের কাজেও তাঁর অকৃপণ সহযোগিতা পেয়েছি।

এই কাজের জন্য বিভিন্ন লাইব্রেরিতে অনেকদিন ধরে যাতায়াত করতে হয়েছে। লাইব্রেরির কর্মীবন্ধুরা প্রায় সবসময়ই সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। তবে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের শ্রীঅরুণচাঁদ দত্ত, শ্রীশঙ্করলাল ভট্টাচার্য, শ্রীযামিনীমোহন আদক, উত্তরপাড়া জয়কৃষ্ণ লাইব্রেরির শ্রীগণেশ পয়রা, শ্রীপ্রণবেশ চক্রবর্তী, জাতীয় গ্রন্থাগারের শ্রীশান্তনু মুখোপাধ্যায়, কেরি লাইব্রেরির শ্রীসুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায় ও

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য অভিলেখাগারের শ্রীমৃগেন বিশ্বাস আমাকে যেভাবে সাহায্য করেছেন তা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করছি। গ্রন্থে ব্যবহৃত ছবিগুলি জাতীয় অভিলেখাগার, বরেন্দ্র রিসার্চ মিউজিয়াম, উত্তরপাড়া জয়কৃষ্ণ লাইব্রেরি, কেরি লাইব্রেরি, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ ও অধ্যাপক সুকুমার রায়ের সৌজন্যে মুদ্রিত।

পরিশেষে একটি বেদনার কথা। বিদ্যাসাগর সম্পর্কে গবেষণার জন্য কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে রক্ষিত হিন্দু কলেজের কার্যবিবরণী দেখার অনুমতি বহুবার ঘোরাঘুরি করার পরও পাইনি। যাতে আমি এগুলি দেখার সুযোগ পাই সেজন্য অনেক চেষ্টা করেছিলেন ঐ কলেজের দুই বিশিষ্ট অধ্যাপক শ্রীঅশোক মুস্তাফি ও শ্রীকৃত্যপ্রিয় ঘোষ। এঁদের দুজনকে ধন্যবাদ না জানালে আমি নিজের কাছে অপরাধী থেকে যাবো। কল্যাণীয়া চিনি নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও এ-বইয়ের প্রুফ দেখার কাজে আমাকে সাহায্য করেছেন।

বিষয়সূচী

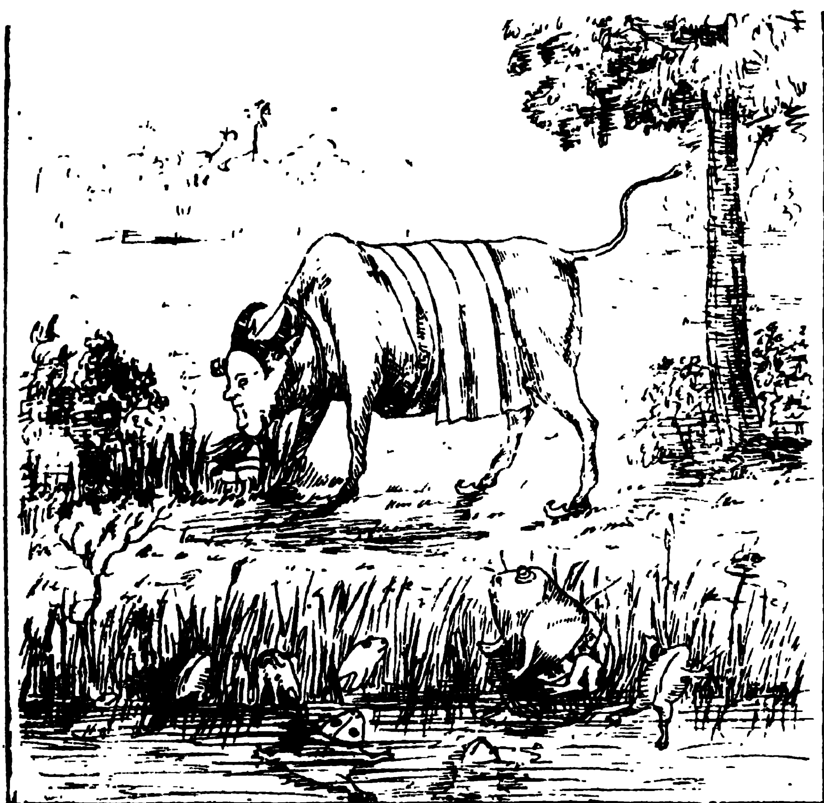
চিত্রসূচী

মহামহীম শ্রীশ্রীযুক্ত ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সমাজস্থ [illegible]
মহোদয় প্রবর প্রবরেষু

যেহেতু স্ত্রীজাতি স্বাভাবিক [illegible] পুরুষের তুল্য। পুরুষেরা স্ত্রী বিয়োগ হইলে অনায়াসে বিবাহ করিতে পারে। অথচ [illegible] বিধবার [illegible] এই প্রথা প্রচলিত থাকায় নিতান্ত [illegible] বিরুদ্ধ। ঈশ্বরের নিয়ম ভঙ্গ করায় যেসকল শক্তিহীনা কামিনীগণের অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিতে ও কাহারও [illegible] প্রবৃত্ত হয় [illegible] পুরুষদিগের ও তাহাদিগের [illegible] এবং কখন [illegible] উভয় জাতির [illegible] অসত্যাবলম্বন করিতে হয় [illegible] এই সমস্ত চিন্তা করিয়া [illegible] ও দেশহিতৈষী শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের লিখিত পুস্তক [illegible] পাঠে বিধবা বিবাহ অশাস্ত্রীয় নহে ইহা [illegible] হইয়া এই [illegible] ও [illegible] নিয়ম [illegible] করিতে [illegible] কিন্তু পাছে বিচারালয়ে এরূপ বিবাহ [illegible] ও [illegible] সন্তান বলিয়া গণনীয় নহে এই আশঙ্কায় অনেকে এই বিষয়ে প্রবৃত্ত হইতে পারেন না।

[illegible] হইতে এই ভয় [illegible] হইলে [illegible] ও অনেক [illegible] হইবার [illegible] আপনকার দিগের [illegible] ইহার [illegible] আইন হইবার [illegible] হইয়া আমরা [illegible] হইয়াছি একণে আমরা [illegible] প্রার্থনা করিতেছি যে আপনারা কৃপা [illegible] এই [illegible] ও [illegible] বিষয়ে প্রয়োজনীয় [illegible] আইন প্রচলিত করিয়া ভারতবর্ষীয় [illegible] গণের দুঃখ বিমোচন ও [illegible] উদ্ধার করিয়া দেশের [illegible] করুন [illegible] তারিখ [illegible]

বিধবাবিবাহ অশাস্ত্রীয় নয়—বিদ্যাসাগরের বই পড়ে তা জানার পর সরকারকে এ-বিষয়ে আইন প্রণয়ন করার অনুরোধ জানাচ্ছেন বারাসাতের অধিবাসীরা



The Bull and The Frog.

[illegible] "এত গরম গায়ে ছেড়ে দিলাম তবুও কিছু হোলনা, রোজ
[illegible]মি ফুলে ওর সমান হোচ্ছি। [illegible] দেখি ওর মতন হইনি।"
[illegible] ফুলে ফুলে বেংচরা "বাহবা [illegible]. আর একটু ফুলিলেই হবে।"

বঙ্কিমচন্দ্র-বিদ্যাসাগরের বিরোধ অবলম্বনে 'বসন্তক'-এ প্রকাশিত কার্টুন

হইয়া থাকে সুতরাং ঐ কুলীনেরা অনেক বিবাহ করিলে তাহাদের কন্যাগণের পরিনামে মনঃপীড়া ও সাংসারিক যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়, এতন্নিমিত্ত তাঁহারা এবম্প্রকার আন্দোলন করেন। ইহার উত্তর, অকুলীনেরা কুলীনদিগের সহিত বৈবাহিক কর্ম্ম রহিত করিলেই পারেন, তাহাতে সকল উৎপাত দূর হয় এবং তাহাতে তাঁহাদের ও ক্ষতি নিরহ। বাস্তবিক দ্বেষ ও ঈর্ষা পরতন্ত্র হইয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় যে পুস্তকখানি প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহার ভুরি ভুরি লক্ষণ ঐ পুস্তকেই লক্ষিত হয়। বহুবিবাহের অনিষ্ট ফল প্রদর্শন স্থলে বর্ত্তমান কুলীনগণ ও তাহাদের পূর্ব্ব পুরুষদিগের প্রতি কটুভাষা প্রয়োগের কি প্রয়োজন ছিল? তাহাতে তাঁহার মূল বিষয়ের কি পোষকতা হইয়াছে? হে কুলীনগণ! আপনারা এরূপ কু-উক্তিতে ক্ষুদ্র হইবেন না কারণ ইহাতে আপনাদের মর্য্যাদার হ্রাস হয় নাই। বিদ্যাসাগর মহাশয় যেমন মর্য্যাদাবান্ তদ্রূপ করিয়াছেন।

(দেশের প্রকৃত মঙ্গল সাধনের জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয় যে, রীতি সংস্করণ বিষয়ে সমুৎসুক হইয়াছেন ইহা কখনই অস্মদ্গণের হৃদয়ঙ্গম হয় না, কেবল খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভাশয়ে ও কুলীনদিগকে খর্ব্ব করিবার মানসে এতদ্ব্যাপারে নিযুক্ত হইয়াছেন।) কুলীনদিগের মান সম্ভ্রম এবং তাঁহাদের অনায়াসে পরিণয়াদি সম্পন্ন হয় ইহাতে কুল শূন্য ব্যক্তিরা ঈর্ষা পরবশ হইয়া সাগরীয় মতে অনুমোদন করিতেছেন। অকুলীন যে কুলীনের নিন্দা, অধার্ম্মিক ধার্ম্মিকের নিন্দা, ভ্রষ্টাচারী সদাচারির নিন্দা করিবে ইহা বিচিত্র নহে। কিন্তু যখন পরস্পরের এরূপ বিপরীত সম্বন্ধ দৃষ্ট হইতেছে তখন এক পক্ষের বাক্যে অপর পক্ষের প্রতি বিরুদ্ধাচরণ করা বিজ্ঞ ব্যক্তির কর্ত্তব্য নহে। অনেক কুল-হীন লোকেরা কুলীনদিগের "জাতি নাই" "ব্রাহ্মণ্য নাই" ইত্যাদি কলঙ্কারোপ করিয়া থাকেন বস্তুতঃ, বিবেচনা করিয়া দেখিলে ইহা প্রতীয়মান হইবে, যে তাহারাই মন্বাদি বচনানুসারে অব্রাহ্মণ ও জাতিচ্যুত যাহারা পণ দিয়া কন্যা গ্রহণ করিয়া থাকে। পণ দিয়া কন্যা গ্রহণ করণে পুঞ্জ পুঞ্জ প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায় যে অনেকেই বৈষ্ণব ও আচার্য্যাদি নীচ বংশের কন্যা অজ্ঞাতসারে বিবাহ করিয়া

DETAILS OF WIDOWS RE-MARRIED. *(According to Hindu Sastra's.)*

Caste	Name, parentage, and nativity of the widow	Widow's age, when re-married	Name, parentage, and nativity of the husband of the re-married widow	Date of re-marriage.
Brahmin.	Kalimati, daughter of Brahmanundo Mookerjee, of Pulladanga. Burdwan.	10 Years.	Sreeş Chunder Vidyaratna son of Ramdhone Turkobagish of Khatura—Naddia.	Bengalee style 1263. A. D. 7th. Decr. 1856
Kyastha.	Thakomonee, daughter of Eshan Chunder Mitter, of Thuuthunia. Calcutta.	12 Years.	Modoo Soodun Ghose, son of Kristo Cally Ghose, of Panihatti. 24 Pergunas.	24th. Aughran 1263.
Kyastha.	Gobind Monee, daughter of Ram Soonder Ghose, of Bhowanipore. 24 Perganas.	11 Years.	Durganarain Bose, Son of Modoo Soodun Bose, of Boral. 24 Perganas.	11th. Falgoon 1263.
Kyastha.	Nrittya Cally, daughter of Hurris Chunder Biswas, of Sookchar. 24 Perganas.	13 Years.	Madden Mohun Bose, Son of Nundololt Bose, of Boral. 24 Perganas.	26th. Falgoon 1263.
Brahmin	Lukshmi Monee, daughter of Soroop C. Chuckerbutty, of Keagaro. Hugli.	8 Years.	Jodoo Nath Chatterjee, of Goesoor. Naddia.	Aughran 1264.
Tantubaya.	Ahladini, daughter of Nobin Chunder Das, of Ramjeebunpur. Hugli.	12 Years.	Nemy Churn Dey, Son of Khudiram Dey, of Ramjeebunpur. Hugli.	12th. Ashar 1265.
Tantubaya.	Narayani, daughter of Goladhur Das, of Ramjeebunpur. Hugli.	12 Years.	Sreecanto Das, Son of Kenaram Das, of Ramjeebunpur. Hugli.	28th. Ashar 1265.
Sadgope.	Mangala, daughter of Sarthak Ghose of Basoola. Hugli.	12 Years.	Kartic Chunder Ghose Son of Gooruprosad Ghose of Sreenagar. Hugli.	10th Srabone 1265.
Brahmin.	Goneshjononi, daughter of Kally Prosad Mookerjee of Chundercona. Hugli.	7 Years.	Sreeram Chuckerbutty Son of Kenaram Chuckerbutty of Sona. Hugli.	25th Srabone 1265.
Taylik.	Malcti, daughter of Vim Churn Teeli of Anundpur. Medinipur.	13 Years	Prem Chand Das Son of Goverdhun Das of Ramjeebunpur. Hugli.	19th Srabone 1265.

হিন্দুশাস্ত্রমতে অনুষ্ঠিত বিধবাবিবাহের সংখ্যা ছিল খুবই কম—১৮৬৭-তে 'ওয়েল-উইশার'-এ প্রকাশিত এ-বিষয়ক একটি তালিকার অংশবিশেষ

বঙ্গভাষা এবং সাহিত্য-সম্বন্ধীয় বিবিধ বার্ত্তা।

৩১ শে বৈশাখের এডুকেশন গেজেটে ভ্রান্তিবিলাস কাব্যের একটী সুন্দর সমালোচনা প্রকাশিত হইয়াছে। সুদীর্ঘ হইলেও উহা আমরা এস্থলে গ্রহণ করিলাম, যেহেতু উহাতে শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের রচনা শক্তির সবিশেষরূপ আলোচিত হইয়াছে।

ভ্রান্তিবিলাস।—এই গ্রন্থখানি শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কর্তৃক প্রণীত। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের লেখনী-প্রসূত গ্রন্থ মাত্রেই যাদৃশ সমাদর পূর্ব্বক পাঠ করা উচিত আমরা এ গ্রন্থখানি তাদৃশ সমাদর সহকারে পাঠ করিয়াছি; পাঠ করিয়া আমাদিগের মনে যেরূপ বোধ হইয়াছে, তাহা পাঠক মহাশয়ের গোচর করিতেছি।

এ গ্রন্থখানি গ্রন্থকর্ত্তার স্বকপোলকল্পিত নহে, ইংলণ্ডীয় কবিকুল চূড়ামণি সেক্সপীয়র প্রণীত নাটক বিশেষের উপাখ্যান ভাগ অবলম্বন করিয়া রচিত হইয়াছে। কালিদাসের শকুন্তলা ও ভবভূতির উত্তর রামচরিত অবলম্বন করিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় বাঙ্গালাভাষায় যে দুইটী অপূর্ব্ব পদার্থ সৃজন করিয়াছিলেন সেক্সপীয়রকে অবলম্বন করিয়া সেরূপ কৃতকার্য্য হইয়াছেন কি না, আমাদিগের কৌতূহল প্রথমে সেই বিষয়ের অনুসন্ধানেই প্রধাবিত হইয়াছিল। সেক্সপীয়র পাঠী ব্যক্তি মাত্রেই জানেন, এই মহাকবি প্রতিষ্ঠিত রত্নাগারে যে সমস্ত অমূল্য রত্নরাশি নিহিত আছে, তন্মধ্যে ভ্রান্তি-প্রহসন নাটক সর্ব্ব নিকৃষ্ট। বিদ্যাসাগর মহাশয় এতদ্দেশে সেক্সপীয়রের পরিচয় দিবার নিমিত্ত তদীয় সর্ব্ব নিকৃষ্ট নাটকখানি মনোনীত করিয়া আপনার আশয়গত ত্রুটি দেখাইয়াছেন বলিতে হইবে; কিন্তু সে নিমিত্ত তাঁহাকে তিরস্কার না করিয়া কেবল আপনাদিগের অদৃষ্টেরই তিরস্কার করিতে হয়। [illegible] অধিকারী, যদি তিনি আমাদিগের কপালগুণে [illegible] পূজার অনুষ্ঠানে তৃপ্তি বোধ করিতেন; [illegible] দের পোড়া কপালের নিমিত্ত [illegible] পূর্ব্বক [illegible] আহরণ করিলেন।

কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয়ের আশয়গত ত্রুটি কেবল আপেক্ষিক মাত্র। তাঁহার অবলম্বিত ভ্রান্তি প্রহসন নাটকটী সহস্র অপূর্ণ হইলেও মহাত্মা সেক্সপীয়রের বিরচিত কাব্য। এই অলৌকিক পুরুষের লেখনীর মুখে ভারতীদেবী স্বয়ং অধিষ্ঠান করিতেন। যে ব্রহ্মবীজ সমুদ্ভূত [illegible] বৃক্ষ হইতে [illegible] মুরলী বিনির্গত হয়, সেই বৃক্ষ হইতেই সেক্সপীয়রের লেখনী সংগৃহীত ছিল। তাদৃশ লেখনী মুখ হইতে যে সমস্ত ভাষা প্রসূত হইয়াছে তাহাও প্রচুর সারগর্ভিক। ভ্রান্তি প্রহসন সেক্সপীয়রের সর্ব্ব নিকৃষ্ট নাটক হইলেও উহা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সদৃশ লোকের হস্তে [illegible] প্রকাশের সম্ভাবনা আছে সন্দেহ নাই। অতএব তিনি এ বিষয়ে কতদূর সাফল্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার বিচার করাই আবশ্যক।

বাঙ্গালাভাষায় যতগুলি গদ্য কাব্য গ্রন্থ আছে তন্মধ্যে বিদ্যাসাগর প্রণীত গ্রন্থগুলি সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিলে সর্ব্ববাদি সম্মত। অথচ তন্মধ্যে একখানিও তাঁহার স্বকপোল কল্পিত নহে। সকলগুলিই কবিদিগকে অবলম্বন করিয়া বিরচিত হইয়াছে। অন্য লোকেও এইরূপ চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু কেহই বিদ্যাসাগরের মত কৃতকার্য্য হয়েন নাই। ইহার প্রকৃত কারণ নিরূপণ করিতে পারিলে, ভ্রান্তিবিলাস সম্বন্ধে বিদ্যাসাগর মহাশয় কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছেন তাহার নির্ণয় হইয়া আসিবে।

বিদ্যাসাগর প্রণীত কোন গ্রন্থ পাঠ করিলে সর্ব্বাগ্রে তাঁহার রচনাবিষয়িণী শক্তির প্রতি বিস্ময় দৃষ্টি পড়ে। [illegible]

‘ভ্রান্তিবিলাস’-এর সমকালীন একটি সমালোচনা





Via Marseilles
Par la malle de Bombay

Pundit
Issur Chunder Vidyasagor
British Indian Assoc[illegible]
No 1 Larkin's Lane
Calcutta

18 Sept [illegible]

ভার্সাই থেকে বিদ্যাসাগরকে চিঠি লিখছেন মধুসূদন

মহামহিম শ্রীযুক্ত [illegible]
[illegible] মহাশয়গণ [illegible]

বিনয় পুরঃসর [illegible]মিদং —

কিয়দ্দিন হইল বিধবা বিবাহ বিষয়ক আইনের পাণ্ডুলেখ্য প্রচার হইয়াছে ঐ পাণ্ডুলেখ্য পাঠ করিয়া আমরা [illegible] হইলাম প্রার্থনা করি মহাশয়েরা [illegible] পূর্ব্বক ঐ আইন অবিলম্বে প্রচার করেন তাহা হইলে এদেশে [illegible] বিধবা বিবাহ প্রথা প্রচলিত হইবে এবং ঐ প্রথা প্রচলিত না থাকাতে যে সকল ঘোরতর অধর্ম্ম ঘটিতেছে তাহা একবারে দূর হইবে ইতি ।

সং ১৫ [illegible] —
১৮৫৬ —

বিধবাবিবাহ আইনের পক্ষে বাঁকুড়া ও বর্ধমানের অধিবাসীদের আবেদন

1 Spencer's
7th/10/68

My dear Vidyasagar,

I understand that Tagore of the 'Small' is going to retire & Mr. Thompson is to be named into his place. Can you put in a word for me to your Botanical friend the Lieut. Governor. They want a Barrister & a post like that w^d save me & mine. Although a Brahmin, you are no descendant, I am sure, of that irascible old fellow Durvasa, & I can't believe that my folly of mine c^d turn away that noble heart from

Yours very lovingly but unfortunately
Michael M. S. Dutt

ব্রাহ্মণ হলেও আপনি দুর্বাসার বংশধর নন—বিদ্যাসাগর সম্পর্কে মধুসূদনের শ্রদ্ধার্ঘ্য



পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

'বিদ্যাসাগর নাই'—নববর্ষের প্রারম্ভেই 'অনুসন্ধানকে' আজ এই নিদারুণ শোকসংবাদ মুখে করিয়া বাহির হইতে হইল। গত পরশ্য, ১৩ই শ্রাবণ রাত্রি ২টা ২২মিনিটের সময়, মহাত্মা ঈশ্বরচন্দ্র ঈশ্বরস্থানে প্রস্থান করিয়াছেন। বাঙ্গালীর শিক্ষাগুরু, বাঙ্গালাভাষার জন্মদাতা, কত অনাথ আতুরের সহায়-সম্বল—জগৎকে কাঁদাইয়া, বাঙ্গালাকে শোকসাগরে ডুবাইয়া—আজ অনন্তধামে চলিয়া গেলেন। বাঙ্গালা একে একে সকল রত্নগুলি হারাইয়াছিল কিন্তু এক বিদ্যাসাগর থাকায় বাঙ্গালার মুখ উজ্জ্বল ছিল, কিন্তু আজ তিনিও বাঙ্গালাকে কাঁদাইয়া চলিয়া গেলেন।

পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র ১৮২০ খৃষ্টাব্দে হুগলী-জেলার অন্তর্গত 'বীরসিংহ' গ্রামে জন্ম পরিগ্রহ করেন। তাঁহার পিতার নাম, ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। বিদ্যাসাগরই তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র। ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় অতীব নিরীহ ও সাধারণ গৃহস্থলোকের ন্যায় বড়ই দরিদ্র-অবস্থাপন্ন লোক ছিলেন। পুত্রকে ভালরূপে লেখা-পড়া শিখা-

বিদ্যাসাগর আর নেই

সমাজ-সংস্কারক বিদ্যাসাগর ঃ সমকালের চোখে

যে যুগে বিদ্যাসাগরের জন্ম, সেই যুগে প্রচলিত নানা সামাজিক বিধিনিষেধ সম্পর্কে সচেতন মানুষদের মনে নানা প্রশ্ন দেখা দেয়। এইসব বিধিনিষেধের বন্ধন থেকে বাঙালি হিন্দুসমাজকে মুক্ত করে নতুন পথে নিয়ে যেতে এইকালে অনেকেই হয়ে ওঠেন আগ্রহী। এই আগ্রহ বিদ্যাসাগরের মধ্যেও সঞ্চারিত হয়। আর সেই কারণেই চল্লিশ বছরেরও বেশি সময় ধরে তিনি বাঙালিসমাজের বিভিন্ন সংস্কারমূলক কাজ-কর্মের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন। বিধবাবিবাহ প্রবর্তন ও বহুবিবাহ নিবারণের জন্য তাঁর প্রয়াস সমকালে কি প্রচণ্ড আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল, তা নিয়ে পরে আমরা বিশদ আলোচনা করেছি। এ দুটি প্রয়াসের কথা বাদ দিলেও, উনিশ শতকের সমাজসংস্কার-মূলক অধিকাংশ আন্দোলনের সঙ্গে কোনো-না-কোনোভাবে তিনি যুক্ত ছিলেন।

১৮৫০-এ 'সর্বশুভকরী পত্রিকা'য় 'বাল্যবিবাহের দোষ' শীর্ষক প্রবন্ধ প্রকাশের মধ্য দিয়ে তাঁর সমাজ সংস্কারমূলক প্রয়াসের সূত্রপাত। এই প্রবন্ধটি একাধিক কারণে উল্লেখযোগ্য। এটি তাঁর সমাজ সংস্কারমূলক প্রথম লেখা—সেইদিক থেকে এটির ঐতিহাসিক মূল্য অনস্বীকার্য। দ্বিতীয়ত, পরবর্তীকালে সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে বারবার শাস্ত্রের দোহাই দিলেও, বাল্যবিবাহ যে 'অতিশয় নির্দয় ও নৃশংসের কর্ম' তা প্রমাণ করতে বিদ্যাসাগরকে এইকালে কোনো শাস্ত্রের মুখ চাইতে হয়নি। সহজ বুদ্ধি ও নিজস্ব যুক্তির সাহায্যেই তিনি কাজটি করেন। বাল্যবিবাহ সম্পর্কে আরো লেখালিখি করার ইচ্ছা বিদ্যাসাগরের ছিল। 'সর্বশুভকরী'তে প্রকাশিত লেখাটি তাঁর নিজের মতেই 'কেবল উপক্রম মাত্র। এতদ্বিষয়ক হেতু, যুক্তি ও দৃষ্টান্ত আমাদিগের মনে মনে অনেক পরিশিষ্ট রহিয়া গেল। ক্রমে ক্রমে তাহা প্রকাশ করিতে ত্রুটি করিব না।' একথা লেখার পর বিদ্যাসাগর আরো একচল্লিশ বছর জীবিত ছিলেন, কিন্তু বাল্যবিবাহ বিষয়ে আর কোনো কথা লেখার তাগিদ তিনি অনুভব করলেন না।

না করার কারণটি আমাদের কাছে স্পষ্ট নয়। তবে বিদ্যাসাগরের এই লেখাটি সম্পর্কে সমকালীন পত্রপত্রিকায় কোনো মন্তব্য আমাদের চোখে পড়েনি। সেই কারণে মনে হয়, বিদ্যাসাগরের লেখাটি সমকালে তেমন আলোড়ন সৃষ্টি করতে পারেনি। তাছাড়া রক্ষণশীলরাও এইকালে বাল্যবিবাহের নিন্দাবাদে কুণ্ঠাবোধ করতেন না (রক্ষণশীল কাশীপ্রসাদ ঘোষ সম্পাদিত 'হিন্দু ইন্টেলিজেন্সার'-এও 'আর্লি ম্যারেজ—দি সোর্স অব মাচ ইভিল ইন ইন্ডিয়া'র মতো লেখা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হত)। লেখাটি সম্পর্কে বাঙালিসমাজের নিস্পৃহতা কি বিদ্যাসাগরকে ক্ষুণ্ণ করেছিল? আর তাই তিনি কি বিষয়টি নিয়ে আর এগোনোর কোনো তাগিদ অনুভব করলেন না?

মনে রাখতে হবে, এই কালের সচেতন মানুষরা কিন্তু বিষয়টি সম্পর্কে নিস্পৃহ ছিলেন না, পত্রপত্রিকাগুলিতেও এ-প্রথার কুফল সম্পর্কে আলোচনা-ধারা ছিল অব্যাহত। ১৮৫২ সালের 'সংবাদ প্রভাকরে,' ১৮৫৪-এর 'বিবিধার্থ সংগ্রহে', ১৮৫৭-এর 'বঙ্গবিদ্যা-প্রকাশিকা'য় বাল্যবিবাহের বিষময় ফল আলোচিত হয়। ১৮৫৯-এ শ্রীপতি মুখোপাধ্যায় 'বাল্যবিবাহ' নামে একটি নাটক লেখেন, ১৮৬০-এ প্রকাশিত হয় শ্যামাচরণ শ্রীমানির 'বাল্যোদ্বাহ নাটক'। ১৮৬৩-তে কৈলাসবাসিনী দেবী বাল্যবিবাহ যে সমস্ত অনিষ্টের মূল—তা মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করেন। সত্তরের দশকে বাঙালি হিন্দুসমাজে বাল্যবিবাহ বিরোধী মনোভাব বেশ দানা বেঁধে ওঠে। এইকালে ঢাকায় 'বাল্যবিবাহ নিবারণী সভা' স্থাপিত হয়। ঢাকা কলেজের অধ্যাপক সোমনাথ মুখোপাধ্যায় হন এর সভাপতি। এই সভার ছাত্রসভ্যরা আঠার বছরের আগে কেউ বিয়ে করবেন না বলে প্রতিজ্ঞা করেন। এই সভার মুখপত্র হিসাবে ১৮৭৩-এ প্রকাশিত হয় 'মহাপাপ বাল্যবিবাহ'। নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত এই পত্রিকাটি বাল্যবিবাহ বিরোধী জনমত গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সক্রিয় ভূমিকা নেয়। বিদ্যাসাগর এ সময় এ-বিষয়ে কোনো কৌতূহল প্রকাশ করেছেন, এমন তথ্য আমরা পাইনি। বাল্যবিবাহের কুফল সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের বইও এইকালে লেখা হচ্ছিল। ১৮৭০-এ সোমনাথ মুখোপাধ্যায় বাল্যবিবাহের কুফল দেখিয়ে লিখলেন 'বাল্যবিবাহ'। রামচন্দ্র দত্তের 'বাল্যবিবাহ নাটক' প্রকাশিত হয় ১৮৭৪-এ। এই বছরেই প্রকাশিত ভুবনেশ্বর মিত্রের 'হিন্দুবিবাহ সমালোচন'-এ বাল্যবিবাহের তীব্র সমালোচনা চোখে পড়ে। এইকালেই 'ভারত সংস্কারক,' 'মিত্রপ্রকাশ', 'জ্ঞানাঙ্কুর', 'নবপ্রবন্ধ', 'বঙ্গমহিলা' প্রভৃতি পত্রিকাগুলি বাল্যবিবাহের কুফল বর্ণনায় উৎসাহিত হয়ে ওঠে। অথচ যে মানুষটি বাল্যবিবাহের কুফল সম্পর্কে অতিমাত্রায় সচেতন, যিনি নিজের মেয়েদের বাল্যবিবাহ দেননি, তিনি এইকালে গ্রহণ করলেন নিছক দর্শকের ভূমিকা।

'বাল্যবিবাহের দোষ' প্রবন্ধটি লেখার কিছুদিন পরে বিধবাবিবাহ বিষয়ে তিনি আগ্রহী হয়ে ওঠেন। ষাটের দশকে এ-বিষয়ে তাঁর ব্যস্ততা একটু হ্রাস পেলে, বাঙালিসমাজের অন্যান্য সমস্যা নিয়েও তিনি চিন্তা করতে শুরু করেন। এই দশকে বহুবিবাহ বিরোধী আন্দোলনের নেতৃত্ব কিভাবে বিদ্যাসাগরের হাতে চলে আসে, তা আমরা যথাস্থানে আলোচনা করব। ষাটের দশকের গোড়ার দিকে শিক্ষিত বাঙালি যুবকদের মদ্যপানের প্রতি আসক্তি কমানোর জন্য যে সুরাপান বিরোধী আন্দোলন শুরু হয়; বিদ্যাসাগর তাতে সামিল হন। এইকালে তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু প্যারীচরণ সরকারের উদ্যোগে যে 'সুরাপান নিবারণী সভা' গড়ে ওঠে, তার কার্যকরী সমিতির অন্যতম সদস্য ছিলেন বিদ্যাসাগর।

এদেশে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগরের ভূমিকা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। বেথুন স্কুলের সম্পাদকের দায়িত্ব দীর্ঘদিন তিনি নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেন। গ্রামবাংলার মেয়েরাও যাতে শিক্ষার সুযোগ পায়, তার জন্য তিনি

সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেন। ছোটলাট হ্যালিডের সঙ্গে কথা বলে ১৮৫৭-এর ২৪ নভেম্বর থেকে ১৮৫৮-এর ১৫ মে-র মধ্যে তিনি হুগলি, বর্ধমান, নদীয়া ও মেদিনীপুরের বিভিন্ন গ্রামে ৩৫টি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এ-ব্যাপারে কোনো সরকারি নির্দেশ বা লিখিত আদেশ না থাকায়, শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর গর্ডন ইয়ং বিদ্যাসাগর প্রতিষ্ঠিত বালিকা বিদ্যালয়গুলিকে অর্থসাহায্য দানের বিরোধিতা করতে থাকেন। অনেক লেখালিখির পর সরকার বিদ্যাসাগরকে আর্থিক দায়ভার থেকে মুক্তি দিলেও, বালিকা বিদ্যালয়গুলিকে স্থায়ী কোনো সাহায্য দিতে অস্বীকার করেন। ফলে অনেকগুলি স্কুল বন্ধ হয়ে যায়, দু' চারটি বিদ্যাসাগর ও অন্যান্যদের অর্থসাহায্যে কোনোরকমে টিঁকে থাকে। কিন্তু এগুলির অবস্থাও দিনদিন হয়ে উঠতে থাকে শোচনীয়, অর্থাভাবে কোনো-কোনোটির অস্তিত্ব লোপ পাবারও উপক্রম হয়। যে কারণে বর্ধমানের কাশিয়াডাঙ্গায় বিদ্যাসাগরের উদ্যোগে স্থাপিত স্কুলটির দৈন্যদশার প্রতি বিদ্যাসাগরের দৃষ্টি আকর্ষণ করে 'সাধারণী' লেখে :

'বিদ্যাসাগর মহাশয়কে স্মরণ করিয়া দিতেছি তাঁহার অতি যত্নের ধনের অন্তিমকাল উপস্থিত। অর্থাভাবে দিনদিন মলিন ভাব ধারণ করিতেছে। বালিকাগণের প্রতি একবার সস্নেহ দৃষ্টিপাত করুন।'[১]

এই সময়েই স্ত্রীশিক্ষা সংক্রান্ত বিতর্কমূলক একটি বিষয়ে তিনি জড়িয়ে পড়েন। ১৮৬৬-তে বেথুন স্কুলে একটি শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয় খোলার প্রস্তাব হলে অনেকে তার বিরোধিতা করেন। মহারাজা কালীকৃষ্ণ, কাশীপ্রসাদ ঘোষ, রাজেন্দ্রনাথ দত্ত ইত্যাদিদের সঙ্গে বিদ্যাসাগরকেও এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করতে দেখি। এককালে যাঁরা তাঁর সংস্কারমূলক কাজকর্মের সমালোচনায় ছিলেন মুখর, এখন তাঁদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে এই স্কুল স্থাপনের বিরোধিতা করতে বিদ্যাসাগর দ্বিধা করলেন না। কেন বিদ্যাসাগর এই ধরনের একটি স্কুল স্থাপনের বিরোধিতা করলেন, তার কারণ বলা মুশকিল। আমাদের অনুমান, এই সময় থেকে সামাজিক বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি কিছুটা পালটাতে শুরু করে। যে কারণে শিক্ষিকা শিক্ষণ বিদ্যালয় সম্পর্কে তাঁকে রক্ষণশীলদের মতের প্রতিধ্বনি করতে শুনি। এই প্রস্তাবের সমর্থকও সেকালে বেশ কিছু ছিলেন—প্রসঙ্গত কেশবচন্দ্র সেনের নাম স্মরণ করতে পারি। 'ইন্ডিয়ান মিরর' এই ধরনের স্কুল খোলা হলে ছাত্রীর অভাব হবে না বলে আশ্বাস দেয়। কিন্তু বিদ্যাসাগর দৃঢ়তার সঙ্গে এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করে বলেন, 'হিন্দুভাব ও হিন্দুসমাজের বর্তমান অবস্থা' এই ধরনের অনুষ্ঠানের সম্পূর্ণ বিরোধী। এই ধরনের স্কুলে ভদ্রঘরের কোনো মেয়ে শিক্ষাগ্রহণ করবে না, বাঙালিসমাজে এ ধরনের স্কুল স্থাপনের সময় এখনও আসেনি বলে তিনি মনে করতেন। ফিমেল নর্মাল স্কুল সম্পর্কে তাঁর মনোভাব সমকালে কিছুটা বিস্ময়ের সৃষ্টি করে। তাঁর এই ধরনের মনোভাবের সমালোচনা করে 'ফ্রেন্ড অব ইন্ডিয়া' লেখে : 'The pundit and the Hindoo Patriot are unconsciously we hope, opposing female education'.[২]

বিদ্যাসাগরের গুণমুগ্ধ 'বামাবোধিনী'ও ফিমেল নর্মাল স্কুল সম্পর্কে তাঁর মনোভাবকে কটাক্ষ করে লেখে :

'বয়ঃস্থা ভদ্রকুল রমণী পাইবার এই সকল প্রমাণ সত্ত্বেও যাঁহারা কৃতনিশ্চয় হইয়া বলিতেছেন যে এরূপে বিদ্যালয়ের ছাত্রী পাওয়া যাইবার সময় এখনও বঙ্গদেশে উপস্থিত হয় নাই। তজ্জন্য বিদ্যালয় সংস্থাপনের চেষ্টা নিরর্থক, এ প্রস্তাব এককালে পরিত্যাগ করা শ্রেয়ঃ এবং এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া গবর্ণমেণ্টকে যখন বিদ্যালয় সংস্থাপনের চেষ্টা হইতেও এককালে নিরস্ত করিলেন তখন তাঁহাদিগকে ঐ মহোপকারী প্রস্তাবটী সংসাধন পথের বিঘ্নকারী না বলিয়া আর কি বলা যাইতে পারে।'[৩]

ফিমেল নর্মাল স্কুল সম্পর্কে বাদানুবাদের রেশ মেলাতে না মেলাতে বেথুন স্কুলের তত্ত্বাবধায়িকা মিস পিগটের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের নানা বিষয়ে মতানৈক্য দেখা দেয়। এইসময় বেথুন স্কুলের ছাত্রীসংখ্যা কমতে থাকে। স্কুলের মানও নিম্নাভিমুখী হয়। বিদ্যালয়ের ক্রমাবনতির জন্য সরাসরি বিদ্যাসাগরকে দায়ী করে পিগট বলেন, 'সম্পাদকের নিতান্ত অমনোযোগ ও শৈথিল্য প্রকাশ পাওয়ায় বিদ্যালয়ের এই বর্তমান দুর্গতি হইয়াছে।'[৪] অন্যপক্ষ বলেন, স্কুলের এই অবনতির জন্য পিগটই দায়ী। পিগটের বিরুদ্ধে বেশকিছু অভিযোগও ওঠে। সেগুলি যথার্থ কিনা বিচার করে দেখার জন্য একটি কমিটি গঠিত হয়—বিদ্যাসাগর ছিলেন এর অন্যতম সদস্য। কমিটির রিপোর্ট অনুযায়ী স্কুলের অবনতির জন্য পিগটকে দায়ী করে তাঁকে কর্মচ্যুত করা হয়।[৫] করা হলেও, পিগট সম্পর্কে সেকালে অনেকের উঁচু ধারণা ছিল। স্ত্রীজাতির উন্নতিকল্পে নিবেদিতপ্রাণ 'বামাবোধিনী' মনে করত, পিগটের মতো 'বঙ্গবালাগণের হিতৈষিণী বিদেশীয়া স্ত্রীলোক প্রায় দেখা যায় না।' এই সময় বেথুন স্কুলের দায়দায়িত্ব পুরোপুরি সরকার গ্রহণ করায় বিদ্যাসাগর সম্পাদকের দায়িত্বভার ত্যাগ করেন (১৮৬৯)। এর পর স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে কোনো সক্রিয় ভূমিকা নিতে বিদ্যাসাগরকে আর দেখা যায়নি। সত্তরের দশকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাদানের ক্ষেত্রে মেয়েদের অধিকারের যৌক্তিকতা নিয়ে যখন বাদ-প্রতিবাদ শুরু হয়, তখন বিদ্যাসাগর নীরব থাকাই শ্রেয় মনে করেন। নীরব থাকলেও, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় মেয়েদের সাফল্য দেখে তিনি আনন্দিত হন এবং চন্দ্রমুখী বসু এম. এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে তাঁকে অভিনন্দন জানান।

সত্তরের দশকে সামাজিক বিভিন্ন আন্দোলনে বিদ্যাসাগর সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেন। ১৮৭০-এ 'সনাতন ধর্মরক্ষণী সভা' বহুবিবাহের বিরুদ্ধে আন্দোলনের সিদ্ধান্ত নিলে, বিদ্যাসাগর কিভাবে তাদের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন, সে সম্পর্কে আমরা যথাস্থানে আলোচনা করব। এই সময় 'সনাতন ধর্মরক্ষণী সভা'র অনুসরণে বাংলার বিভিন্ন জেলায় অনেকগুলি হিন্দু ধর্মসভা গড়ে ওঠে। এরকম যে দু'একটি সভার সঙ্গে বিদ্যাসাগর যুক্ত ছিলেন, 'ভারেঙ্গা হিন্দুধর্মরক্ষণী সভা' তার অন্যতম। এই সভাটি সম্পর্কে সমকালীন একটি পত্রিকা লেখে :

'কয়েকদিন হইল, এই ভারেঙ্গানিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু কেদারনাথ চৌধুরী, শ্রীযুক্ত বাবু হরকান্ত চৌধুরী, শ্রীযুক্ত বাবু মহিমচন্দ্র চৌধুরী, শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্ননারায়ণ চৌধুরী, শ্রীযুক্ত বাবু নীলকান্ত চৌধুরী, শ্রীযুক্ত বাবু অন্নদাপ্রসাদ চৌধুরী, শ্রীযুক্ত বাবু শশিভূষণ চৌধুরী, শ্রীযুক্ত বাবু দুর্গানারায়ণ চৌধুরী ও শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্নকুমার চৌধুরী মহাশয়গণ একমত হইয়া একটি হিন্দুধর্মরক্ষিণী সভা সংস্থাপিত করিয়াছেন। ...সভাতে কেবল হিন্দুধর্মের আলোচনা আর দেশের হিতকর কার্য্য (যথা বিদ্যালয় স্থাপন, দরিদ্র পরিবার পালন, অনাথ পরিবারকে ঔষধদান ইত্যাদি) করা হইবে।... পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, শ্রীযুক্ত হরকুমার বিদ্যারত্ন, শ্রীযুক্ত চন্দ্রকুমার বিদ্যাভূষণ মহাশয়গণ সভার অধ্যক্ষতাপদ গ্রহণ করিয়াছেন। ইঁহারা এ দেশের মধ্যে বিশেষ শাস্ত্রজ্ঞ, বহুদর্শী ও বুদ্ধিমান। ইঁহারা যে প্রণালী অবলম্বন করিয়া কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন, তাহাতে এ দেশের বিশেষ উপকার হইবে।'[৬]

হিন্দুধর্ম রক্ষাকল্পে স্থাপিত এইসব সভাগুলি বহুবিবাহ ও কন্যাপণের বিরুদ্ধে মতামত প্রকাশ করতে থাকে। ফিমেল নর্মাল স্কুল স্থাপনের বিরোধিতার সময় থেকে রক্ষণশীল হিন্দুদের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের যে সুসম্পর্ক স্থাপিত হয়, এইকালে তা আরো ঘনীভূত হয়। সত্তরের দশকে হিন্দুদের সমুদ্রযাত্রার বিষয়টি নিয়ে হিন্দু ধর্মসভাগুলি যখন আলোচনা শুরু করে, তখন বিদ্যাসাগর তাতে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেন। শিক্ষার জন্য কেউ যদি সমুদ্রযাত্রা করে তাহলে তাকে জাতিচ্যুত করা হবে না—এই মর্মে 'সনাতন ধর্মরক্ষিণী সভা' সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কাজ করার কোনো আগ্রহ কিন্তু সভার মধ্যে দেখা গেল না। বিদ্যাসাগর তাই বলে এ-ব্যাপারে নিছক দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করলেন না। বন্ধুপুত্র সুরেন্দ্রনাথ বিলেত থেকে ফিরলে তিনি তাঁকে সমাজভুক্ত করবার চেষ্টা করলেন। সুরেন্দ্রনাথ ছাড়া অন্যান্য যুবকরাও যাতে সমাজে গৃহীত হয়, তার জন্য তিনি সচেষ্ট হয়ে ওঠেন। তাঁর এই তৎপরতা সম্পর্কে সমকালীন একটি পত্রিকা মন্তব্য করে, 'পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ইংলণ্ড-গামী যুবকদিগকে সমাজভুক্ত করিবার নিমিত্ত চেষ্টা করিতেছেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উৎসাহকে ধন্যবাদ। সনাতন ধর্মরক্ষিণী সভা কি করিতেছেন?'[৭]

এ-বিষয়ে বিদ্যাসাগর তৎপর হবার কিছুদিন আগেই তিন আইনে বিবাহকে কেন্দ্র করে বাঙালিসমাজে রীতিমতো আলোড়ন সৃষ্টি হয়। রক্ষণশীল হিন্দু ও আদি ব্রাহ্মসমাজের নেতাদের বিরোধিতা উপেক্ষা করে ১৮৭২-এ তিন আইনে বিবাহ-বিধি চালু হয়। বিদ্যাসাগর-জীবনীকার চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন: 'যে সময়ে ব্রাহ্মবিবাহবিধি লইয়া দেশমধ্যে মহা আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল, যখন চারিদিকে আপত্তি নিবন্ধন বর্তমান ব্রাহ্মবিবাহ আইন এক কিম্ভূতকিমাকার রূপ ধারণ করিয়াছিল, সে ঘোরতর আপত্তি ও আন্দোলনের দিনে বিদ্যাসাগর মহাশয় আইনের সপক্ষতা করিয়াছিলেন। ১৮৭২ খৃস্টাব্দের ৩ আইন বিধিবদ্ধ হইবার পক্ষে নিজ অনুকূল অভিপ্রায় দিয়াছিলেন এবং কাশীর অধ্যাপকমণ্ডলীর নিকট হইতে আইনপ্রার্থী

ব্রাহ্মদের প্রয়োজনসিদ্ধির উপযোগী ব্যবস্থা আনাইবার জন্য অনুরুদ্ধ হইয়া তিনি চন্দ্রনাথ মৈত্র মহাশয়কে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহার কিয়দংশ এই—'আমার বিবেচনায় এইরকম আইন বিধিবদ্ধ হওয়া উচিত ও আবশ্যক। ব্রাহ্মমতে মধ্যে মধ্যে বিবাহ হইয়াছে—আমার নিকট ও কতকগুলি পণ্ডিতের নিকট নূতন ব্রাহ্মেরা ব্যবস্থা চাহিয়াছিলেন, আমরা সকলে সেই ব্যবস্থা লিখিয়া দিয়াছি।'[৮] নতুন এই বিবাহ-বিধিতে বহুবিবাহের সুযোগ না থাকায় তিনি খুশি হয়েছিলেন। এই সুবিধা যাতে হিন্দু বিধবারা পেতে পারে, তার জন্য উদ্যোগ নিয়েও তিনি সফল হতে পারেননি। এই বিবাহবিধিকে সমর্থন করলেও, ব্যাপারটি হিন্দুশাস্ত্র বহির্ভূত বলে এ সম্পর্কে ব্যক্তিগত কোনো আগ্রহ বিদ্যাসাগরের ছিল না। আসলে একজন হিন্দুসমাজ সংস্কারক হিসাবে বাঙালি হিন্দুসমাজে বিধবাবিবাহ প্রবর্তনই ছিল তাঁর লক্ষ্য। সেই কারণে যেসব বিধবাবিবাহের ক্ষেত্রে হিন্দুশাস্ত্রবিধি পরিপূর্ণভাবে মেনে চলা হত না, তার সঙ্গে তিনি কোনো সংস্রব রাখতেন না। এই কারণেই গুরুচরণ মহলানবিশের বিধবাবিবাহের সঙ্গে তিনি নিজেকে যুক্ত করেননি। গুরুচরণ মহলানবিশের বিধবাবিবাহকে কেন্দ্র করে একসময় প্রচণ্ড উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। গুরুচরণকে হাতের কাছে পেলে মেরে ফেলায় আশঙ্কা দেখা দেওয়ায়, তাঁকে কলকাতায় এনে প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের কলুটোলার বাড়িতে লুকিয়ে রাখা হয়। তাঁর বিবাহের ব্যাপারে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী উদ্যোগী ভূমিকা নেন, তাঁর নামে নিমন্ত্রণপত্রও ছাপা হয়। শেষমুহূর্তে লোকের কথা শুনে বিজয়কৃষ্ণ পিছিয়ে গেলে, নির্দিষ্ট দিনে বিবাহের অনুষ্ঠান হতে পারল না। গুরুচরণের এক বন্ধু রামপ্রসাদ সেন সমস্ত ব্যাপারটি বিদ্যাসাগরকে জানালে তিনি বললেন, 'তুমি মহলানবিশকে বল গিয়া মহলানবিশ যদি আমার পদ্ধতি অনুসারে বিবাহ করেন, তবে আমি পাত্রীর গহনা এবং বিবাহের ব্যয় দিতে প্রস্তুত আছি। আবশ্যক হইলে মহলানবিশকে কোন চাকরি লইয়া দিতে চেষ্টা করিব।'[৯] বিদ্যাসাগরের কথা শুনে রামপ্রসাদ সেন গুরুচরণকে এসে বললেন, 'বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিয়াছেন তাঁহার পদ্ধতি অনুসারে বিবাহ হইলে তিনি পাত্রীর সমস্ত গহনা দিবেন। বিবাহের সমস্ত ব্যয় দিবেন এবং আবশ্যক হইলে আপনার চাকুরি জুটাইয়া দিবেন।' গুরুচরণ 'আত্মকথা'য় লিখেছেন, 'তখন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মতে বিবাহ হইলে আমার খুব সুবিধা হইবে আর কেহ কিছু বলিতেও পারিবে না, বিবাহের খরচ, পাত্রীর গহনা এবং আমি একটি চাকুরিও পাইতে পারিতাম। ইহা জানিয়াও আমি সেই মতে সায় দিতে পারিলাম না। কারণ আমি যে উপবীত ত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলাম, আমি যে আর পৌত্তলিকতা করিব না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছি। এখন আবার বিবাহ করি কিরূপে?'[১০] এর অল্পদিন পরে গুরুচরণ ব্রাহ্মমতে বিবাহ করেন। এই বিধবাবিবাহে আচার্যের কাজ করেন ব্রাহ্মসমাজের তৎকালীন উপাচার্য কেদারনাথ রায়। বিবাহসভায় দুশোর বেশি লোক এলেও, বিদ্যাসাগর আসেননি।

এর কিছুদিন পরে কলকাতা হাইকোর্টে অসতী বিধবার উত্তরাধিকার সংক্রান্ত একটি চাঞ্চল্যকর মামলা শুরু হয়। আসামের গোলাঘাটের জনৈক অপুত্রক সম্পত্তি-শালী ব্যক্তির মৃত্যু হলে তাঁর বিধবা পত্নী কেরি কলিতানি সেই বিষয়ের অধিকারিণী হন। কিছুদিন পরে মৃত ব্যক্তির জ্ঞাতি ভাই মণিরাম কলিতা গোলাঘাটের মুন্সেফের কাছে তাঁর ভ্রাতৃবধূর বিরুদ্ধে কলঙ্কের অভিযোগ এনে বলেন, এ বিষয় ভোগ করার কোনো অধিকার তাঁর নেই। মোকদ্দমার বিচার্য হয়—হিন্দু রমণী স্বামীর মৃত্যুর পর স্বামীর পরিত্যক্ত বিষয়ের একবার অধিকারী হবার পর যদি তার চরিত্র কলঙ্কযুক্ত হয়, তা হলে হিন্দুশাস্ত্রমতে পুনরায় সেই অধিকার থেকে কি সে বঞ্চিত হবে? গোলাঘাটের মুন্সেফের রায় কেরির পক্ষে যায়। বাদী মণিরাম এতে অসন্তুষ্ট হয়ে শিবসাগরের কমিশনারের কাছে আপিল করলে, কমিশনার মণিরামের পক্ষে রায় দেন। এই রায়ের বিরুদ্ধে কেরি কলিতানি হাইকোর্টে আপিল করেন। প্রথমে এই মামলার বিচারের ভার পড়ে দ্বারকানাথ মিত্র ও বিচারপতি বেলির ওপর। পরে বিষয়টির গুরুত্ব বুঝে হাইকোর্টের সব বিচারককে নিয়ে একটি বোর্ড গঠন করে মামলাটির বিচার করা হয়।

মামলাটি সমকালে প্রচণ্ড উত্তেজনা সৃষ্টি করে। বিচারপতিদের মধ্যেও বিষয়টি সম্পর্কে মতভেদ দেখা যায়। শেষপর্যন্ত সংখ্যাগরিষ্ঠের রায়ে (৭-৩) কলিতানি জয়লাভ করেন। হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে প্রিভি কাউন্সিলে আপিল হয়, সেখানেও হাইকোর্টের রায় বহাল থাকে। বিহারিলাল সরকার তাঁর বিদ্যাসাগর জীবনীতে জানিয়েছেন, অসতী রমণীর বিষয়াধিকারের প্রশ্নে বিদ্যাসাগরের সঙ্গে দ্বারকানাথের মতভেদ দেখা দেয়। দ্বারকানাথ বিশ্বাস করতেন, বিধবা কলঙ্কিনী হলে স্বামীর সম্পত্তি ভোগ করার কোনো অধিকার থাকে না, বিদ্যাসাগর নাকি তা মনে করতেন না। বিষয়টি সম্পর্কে রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে তিনি জানান, 'আমি অন্যায় কিরূপে বলিব? অন্যায়ই বা শুনিবে কে? আমি অবশ্য ভ্রষ্টাচারের পক্ষপাতী নহি; কিন্তু একজন বিষয়ের অধিকারিণী হইলে কেমন করিয়া বলিব, আবার সে বিষয়চ্যুত হইবে।'[১১] রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে মৌখিকভাবে বিদ্যাসাগর এ কথা বলে থাকতে পারেন। কিন্তু হাইকোর্টে বিচার শুরুর আগে 'এ সম্বন্ধে হিন্দুশাস্ত্রের অভিপ্রায় জানিবার জন্য পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন, ভরতচন্দ্র শিরোমণি এবং তারানাথ তর্কবাচস্পতি এই কয়েকজন বিখ্যাত মহামহোপাধ্যায়কে আদালতে আহ্বান করিয়া তাঁহাদের মতামত জিজ্ঞাসা করা হয়। বিদ্যাসাগর মহাশয় ব্যতীত অপর সকলে উপস্থিত হইয়া এ সম্বন্ধে কলিতানির বিষয়াধিকারের বিরুদ্ধে হিন্দুশাস্ত্রের মত প্রকাশ করেন।'[১২] বিষয়টি সম্পর্কে মতামত প্রকাশে বিদ্যাসাগর কেন বিরত থাকলেন? হিন্দুশাস্ত্রে এ-বিষয়ক নির্দিষ্ট কোনো বিধি কি তাঁর চোখে পড়েনি? নাকি খোলাখুলি অসতী বিধবার পক্ষ সমর্থন করতে তাঁর নীতিবোধে আটকেছিল?

এ বিষয়ে চূড়ান্ত কোনো সিম্ধান্তে আসতে না পারলেও এটুকু বলতে পারি, শাস্ত্রবিধির প্রতি নিষ্ঠা জীবনের অন্তিমকাল পর্যন্ত তাঁর মধ্যে বর্তমান ছিল—শেষজীবনে সহবাস সম্মতি আইন সম্পর্কে তাঁর মতামতই এর প্রমাণ। উনিশ শতকের আশির দশকে বাল্যবিবাহ ও বাধ্যতামূলক বৈধব্যের বিরুদ্ধে পার্শি সমাজ-সংস্কারক বেরামজি মালাবারি আন্দোলন শুরু করেন। ১৮৮৪-তে তাঁর 'নোটস অন ইনফ্যান্ট ম্যারেজ ইন ইন্ডিয়া' ও 'এনফোর্সড উইডোহুড' প্রকাশিত হলে সমাজে প্রচণ্ড আলোড়ন সৃষ্টি হয়। এইকালেই তাঁর জীবনীকার ও সহকর্মী দয়ারাম গিদমল একটি পুস্তিকা প্রকাশ করে সহবাসের ন্যূনতম বয়স দশ থেকে বাড়িয়ে বারো করার প্রস্তাব করেন। ১৮৬০-এ ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৭৫ ধারা অনুসারে দশ বছরের কমবয়সী কোনো স্ত্রীলোকের সঙ্গে সহবাস নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করা হয়।[১৩] সরকারের এই কাজকে সেই সময় বিদ্যাসাগর অনুমোদন করেন।[১৪] সরকারি এই সিদ্ধান্ত সম্পর্কে সেকালে কোনো বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয়েছিল বলে আমাদের জানা নেই। ১৮৮৯-এর আগস্ট মাসে সমাজ সংস্কার সমিতির পক্ষ থেকে সম্মতির বয়স বাড়ানোর জন্য সরকারের কাছে আবেদন করা হয়। সম্মতির বয়স বাড়ানোর প্রস্তাবটি সরকার বিবেচনা করার মনোভাব দেখালে চারিদিকে হৈ চৈ পড়ে যায়। বাংলা সংবাদপত্রগুলি সরকারের এই মনোভাবের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে ওঠে। বিষয়টি নিয়ে যখন বাদানুবাদ শুরু হয়েছে, সেই সময়ে খাস কলকাতার বুকে চাঞ্চল্যকর একটি ঘটনা ঘটে। হরিমোহন মাইতি নামে ৩৫ বছরের এক ব্যক্তি ১৮৯০-এর মে মাসে ফুলমণি নামে একটি বছর দশেকের মেয়েকে বিয়ে করে। বিয়ের মাসখানেক পরে ১৫ জুন ১৮৯০-এ সে বলপূর্বক তার বালিকাবধূর সঙ্গে সহবাস করার পরদিনই বালিকাটির মৃত্যু হয়। মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে সরকারি রিপোর্টে বলা হয়: 'death was caused by intercourse between a full grown man and an immature female.'[১৫]

ঘটনাটি বাঙালিসমাজে ভীষণ চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে। এ ধরনের অমানবিক ঘটনার পুনরাবৃত্তি যাতে না হয়, সেজন্য সরকারকে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য চাপ দেওয়া হতে থাকে। এ ঘটনার কয়েকদিন পরে ৯ জুলাই, ১৮৯০-এ স্যার হেনরি কটন তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু বাংলার লেফটেনান্ট গভর্নর স্টুয়ার্ট বেলিকে এ-ব্যাপারে উদ্যোগী হবার আহ্বান জানিয়ে লিখলেন:

'I forgot to mention it yesterday; but may I take the liberty of suggesting in connection with the horrible case of Hurry Mohun Mytee, that the Bengal Govt. should take the opportunity of suggesting that the age limit twice fixed in section 375 of the IPC at 10 years should be raised by legislation to 12 at least.

This suggestion will be sure to be made by others, and must be

given to soon or late, and I think the Bengal Govt. should take the initiative.'[১৬]

জনমতের গতিপ্রকৃতি আঁচ করে ও কটনের চিঠি পেয়ে বাংলার লেফটেনান্ট গভর্নর বিষয়টি সম্পর্কে বিভিন্নজনের মত জানতে চান। ইংরেজ রাজকর্মচারীদের অধিকাংশই সহবাস সম্মতির ন্যূনতম বয়স বারো করার পক্ষে মত দেন। ডাক্তার কে· ডি· ঘোষ বা অভয়াচরণ দাসের মতো কোনো-কোনো বাঙালি রাজকর্মচারীও এর পক্ষে মত প্রকাশ করেন। বর্ধমানের কালেক্টর রমেশচন্দ্র দত্ত প্রস্তাবিত এই আইন সম্পর্কে কোনো মন্তব্য না করলেও, কলকাতা ও বাংলাদেশের অন্যত্র রজঃস্বলা হবার পূর্বেই যে মেয়েরা সহবাসে বাধ্য হয়, তা স্বীকার করেন। দু'একজন অবশ্য এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন, কবি নবীনচন্দ্র সেনের কথা প্রসঙ্গত স্মরণীয়। এই ধরনের কোনো আইন তার উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে পারবে না বলে তিনি মনে করতেন। বিভিন্ন জনের মতামত সংগ্রহের পর ৮ নভেম্বর, ১৮৯০-এ বাংলা সরকারের মুখ্যসচিব স্টিভেন্স ভারত সরকারের সচিবকে সহবাস সম্মতির বয়স বারো করার জন্য সুপারিশ করেন। প্রস্তাবিত এই আইনটির নাম দেওয়া হয় সহবাস সম্মতি আইন। বাংলার লেফটেনান্ট গভর্নরের মতে এ ধরনের কোনো আইন চালু হলে 'There will be much opposition from the more conservative among the Hindus, but no other class is likely to be obstructive; and he has a firm conviction that legislation would be welcomed by the great majority of the educated and really patriotic throughout the country.'[১৭]

লেফটেনান্ট গভর্নরের আশঙ্কাকে সত্য প্রমাণ করতে এগিয়ে এলেন রক্ষণশীল হিন্দুর দল। এই ধরনের কোনো আইন চালু হলে হিন্দুদের ধর্মীয় ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা হবে, এই অভিযোগ তুলে তাঁরা এর বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিরোধ গড়ে তুললেন। একটি সামাজিক সমস্যাকে তাঁরা ধর্মীয় রূপ দেবার চেষ্টা করলেন এবং তাতে সফলও হলেন। রক্ষণশীল হিন্দু নেতা কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন, শশধর তর্কচূড়ামণি প্রভৃতিরা প্রস্তাবিত এই আইনের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তুলতে প্রধান ভূমিকা নেন। রক্ষণশীলদের মুখপত্র 'বঙ্গবাসী' এই আইনের বিরোধিতা করতে গিয়ে রাজদ্রোহের দায়ে পড়ে। এই বিলটি সম্পর্কে আপত্তির কারণ ব্যাখ্যা করে কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন লেখেন:

'কতিপয় হিন্দুকুলকুঠার একত্র হইয়া সনাতন ধর্মানুশাসিত হিন্দুসমাজকে কলুষিত ও নির্যাতিত করিবার জন্য বরবর্ণিনী কুলকামিনীগণের কুলমর্যাদা লঙ্ঘন করিয়া 'স্ত্রী-সমাগম-সম্মতি-কাল' (Age of consent) নিরূপণার্থ রাজদ্বারে আইন প্রার্থী হইয়া সভাসমিতি ও সংবাদপত্রে তুমুল আন্দোলন করিয়া তুলিয়াছে।... 'মনে করুন যদি "সমাগম সম্মতিকাল" ১২ বর্ষ স্থির হয়, আর কুলবধূ যদি তৎপূর্বেই রজঃস্বলা হয়েন তবে গর্ভাধান সংস্কার হইতেই পারিবে না। বৈধ সংস্কার না হইলে সে গর্ভে যে পুত্রটি উৎপন্ন হয়, সে শাস্ত্রানুসারে বর্ণাশ্রম ধর্মের, পিণ্ডদান,

তর্পণাদির উপযুক্ত অধিকারী হয় না। অতএব আইনটি প্রচলিত হইলে ধর্মাধিকারের মূলোচ্ছেদ হইবে।

'এক্ষণে যাহাতে এই আইনটি প্রচলিত হইতে না পায়, তজ্জন্য হিন্দুসমাজের প্রতিনিধিস্বরূপ সমস্ত সভা হইতেই ইহার প্রতিবাদ হওয়া অবশ্যাবশ্যকীয়।'[১৮]

এই আইন কার্যকর হলে কি ভীষণ অবস্থা হবে তা জানাতে গিয়ে 'ধর্মপ্রচারক' লিখল:

'আজ আইনের বলে, বালিকার দ্বাদশ বর্ষ বয়সের পরই সহবাসের উপযুক্ত সময় এইরূপ একটা গণ্ডি যদি বাঁধিয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে ভাবিয়া দেখুন কিরূপ ভয়ানক অত্যাচার হইবে। কুলবধূ যদি একাদশ বর্ষ বয়সেই রজঃস্বলা হয়েন তাহা হইলে গর্ভাধান সংস্কাররূপ ধর্মরক্ষার্থ হিন্দু স্বামী যদি সেই স্ত্রীতে উপগত হয়েন তাহা হইলে সে সম্বাদ কোনোক্রমে জানিতে পারিলে ম্যাজিস্ট্রেট তৎক্ষণাৎ শমন দিয়া তাহাকে ধরিয়া লইয়া যাইবেন। অতএব স্পষ্টতঃ ধর্মের উপর আক্রমণ হইল। এ বিষম অত্যাচারের কথা ভাবিতে গেলেও শরীর শিহরিয়া উঠে।'[১৯]

'গর্ভাধান' যে হিন্দুর অপরিহার্য কর্তব্য তা বোঝাতে গিয়ে 'জন্মভূমি'তে শশধর তর্কচূড়ামণি লিখলেন, স্ত্রীর বারো বছর পূর্ণ হবার আগে তার সঙ্গে সহবাস করলে স্বামীর দণ্ড হবে 'এইরূপ আইন প্রকাশিত হইলে, হিন্দুর ধর্মের প্রতি অতি গুরুতর আঘাত করা হইবে।' কারণ 'হিন্দুর গর্ভাধান কার্য্য…অতি গুরুতর ও পরমাদরণীয় ধর্মানুষ্ঠান।…দ্বাদশ বৎসরের আইন করিলে হিন্দুর সেই চিরাচরিত পূজনীয় ধর্মের প্রতি গুরুতর আঘাত করা হইবে, হিন্দুর মস্তকে বজ্রপাত করা হইবে, হিন্দুর হৃদয়ে শূল বিদ্ধ হইবে।…অতএব আমরা করপুটে সবিনয়ে কাতর হইয়া প্রার্থনা করিতেছি —মহামান্য গবর্ণমেন্ট আমাদের ধর্মরক্ষা করুন।'[২০] এইকালে রক্ষণশীল হিন্দুরা বিশ্বাস করতেন, কন্যা রজঃস্বলা হলে গর্ভাধান সংস্কার একান্ত আবশ্যক—গর্ভাধান ব্যতীত ধর্মহানি হয়, অথচ সরকার আইন করতে যাচ্ছেন বারো বছরের কম বয়সী মেয়েদের সঙ্গে সহবাস করা যাবে না। তাই ধর্মের ওপর বিদেশি শাসকের এই আক্রমণকে ঠেকানোর জন্য প্রস্তাবিত এই আইনের বিপক্ষে খুলনা, বরিশাল, কালনা, বীরভূম, ময়মনসিংহ, ডায়মন্ডহারবার, বর্ধমান, বনপাস, নন্দনপুর, বোয়ালিয়া, সিরাজগঞ্জ, বহরমপুর, রাজপুরহাট, শ্রীহট্ট, কুচবিহার, নবদ্বীপ, পাবনা, বাখরগঞ্জ প্রভৃতি স্থান থেকে সরকারের কাছে আবেদনপত্র ও টেলিগ্রাম পাঠানো হয়। প্রস্তাবিত এই আইনের বিরুদ্ধে কলকাতাতেও প্রতিবাদের ঢেউ ওঠে। গোলদিঘিতে, এলবার্ট হলে, বিডন স্কোয়ারে, ওয়েলিংটন স্কোয়ারে, কালীঘাট মন্দিরে, গঙ্গার ঘাটে, রাধাকান্ত দেবের নাটমন্দিরে, কমলকৃষ্ণ দেবের বাড়িতে, খেলাতচন্দ্র ঘোষের প্রাসাদে একের পর এক সভা হয়। কলকাতা ময়দানে এক লক্ষ লোকের বিশাল এক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে ৮টি বক্তৃতামঞ্চ নির্মিত হয়েছিল এবং সেখান থেকে চল্লিশ জনেরও বেশি বক্তা বিভিন্ন ভাষায় প্রস্তাবিত এই আইনের বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখেন। বক্তাদের

মধ্যে ছিলেন শশধর তর্কচূড়ামণি, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন, বীরেশ্বর পাঁড়ে, ভূধর চট্টোপাধ্যায়, কালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন, নবগোপাল মিত্র ও আরো অনেকে। বাঙালি গ্রাজুয়েটরা স্টার থিয়েটারে এক সভায় মিলিত হয়ে এই আইনের বিরোধিতা করেন। এই সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন বলেন :

'অনেকের বিশ্বাস ছিল…যে ইংরাজী শিক্ষিত হিন্দুসন্তান স্বধর্মরক্ষায় ততটা যত্নবান নহেন—এ সকল বিষয়ে তাঁহারা একরকম উদাসীন বলিলেই চলে। কিন্তু আজিকার এ অপূর্ব দৃশ্য দেখিয়া, আমার সে বিশ্বাস একেবারে লোপ পাইল,… বস্তুতঃ শিক্ষিত সম্প্রদায়ের এ সাধু উদ্যম ও আন্তরিক যত্ন বিশেষ প্রশংসনীয়।'[২১]

সবাই কিন্তু শিক্ষিত সম্প্রদায়ের এই উদ্যমকে প্রশংসনীয় মনে করেননি। 'ইন্ডিয়ান মিরর' স্টার থিয়েটারের এই সভাটিকে বাংলার লজ্জা হিসাবে চিহ্নিত করে।[২২] শিক্ষিত বাঙালিদের একাংশ বিলের সমর্থনে এগিয়ে আসেন। এই বিলকে সমর্থন করার জন্য কলকাতায় একটি কমিটি গঠিত হয়। কমিটির সেক্রেটারি ছিলেন যোগেশচন্দ্র দত্ত ও আবদুর রহমান। কমিটির অফিস হয় ১২ নং ওয়েলিংটন স্কোয়ারে। কমিটির পক্ষ থেকে প্রস্তাবিত আইনের সমর্থনে ১৮৯১-এ 'গর্ভাধান ব্যবস্থা' নামে একটি পুস্তিকা প্রকাশিত হয়। শান্তিপুরের রামনাথ তর্করত্ন ছিলেন এটির লেখক। এই বিলকে সমর্থন করে যোগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য 'রইস অ্যান্ড রায়ত'-এ যেসব প্রবন্ধ লেখেন, কমিটি সেগুলি *On the legislation of the Rishis and the Age of Consent* নাম দিয়ে প্রকাশ করে বিনামূল্যে বিতরণ করেন। ১৫ মে, ১৮৯১-এ কমিটির পক্ষ থেকে এই বিলের সমর্থনকারীদের একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই বিলের সমর্থনে ৮০০০ জন স্বাক্ষরিত একটি আবেদনপত্রও কমিটির পক্ষ থেকে সরকারের কাছে পেশ করা হয়। এই আবেদনপত্রে স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য, যোগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, দুর্গাচরণ লাহা, গোপাললাল মিত্র, ভূপেন্দ্রনাথ বসু, আনন্দকৃষ্ণ বসু, ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, মহেন্দ্রলাল সরকার, গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, নরেন্দ্রনাথ সেন, শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, দ্বিপেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতিকে পাই। মুসলমানসমাজের একাংশ এই বিলের সমালোচনা করলেও,[২৩] নবাব আবদুল লতিফের মতো বিশিষ্ট মানুষ এই বিলকে সমর্থন করেন। এই বিলকে সমর্থন করায় বিপিনচন্দ্র পালকে বেনামী চিঠিতে ভয় দেখানো হয়। এমনকি তাঁকে লক্ষ্য করে অন্ধকারে একবার গুলিও ছোঁড়া হয়।[২৪] এই বিল সম্পর্কে প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে সেকালের বিশিষ্ট ব্যবহারজীবী রাসবিহারী ঘোষ বলেন, 'এগার বৎসরের মেয়ের সঙ্গে সহবাস না করলে ধর্ম নষ্ট হয়, জাত যায়—এই বিল সম্পর্কে পৃথিবীর অন্যান্য সভ্য দেশের লোকেরা যখন এ কথা শুনবে তখন তারা আমাদের সম্বন্ধে কি ধারণা করবে? এরা বন্য জন্তু হতেও অসভ্য, বিবেক বুদ্ধিহীন—এই তো? সাহেবরা এ বিল নিয়ে যখন আমাদের সঙ্গে কথা কয়, তখন লজ্জায় যেন আমার মাথা খসে পড়ে।…বিলটা হিন্দু শাস্ত্র-বিরুদ্ধ প্রমাণ করতে যে শাস্ত্রের নজির দেখানো হচ্ছে সে সব মিথ্যা। আর যদি তা

সত্য হয়, আমি সে শাস্ত্র মেনে হিন্দু থাকতে চাই না। তাতে আমাকে যার যা বলে গাল দিতে ইচ্ছা হয় দিন।'[২৫] গর্ভাধান ব্যবস্থাকেও আবশ্যক বলে মনে করতেন না তিনি। তাঁর মতে অনেক সম্ভ্রান্ত হিন্দু পরিবারেই গর্ভাধান অনুষ্ঠান পালন না করাটাই সম্মানজনক বলে বিবেচিত হয়।[২৬] প্রতাপচন্দ্র মজুমদার বিশ্বাস করতেন, কলকাতা ও তার বাইরে শতকরা ৯৮টি হিন্দু পরিবারই গর্ভাধান অনুষ্ঠান নিয়ে মাথা ঘামায় না। যে 'বীভৎস ব্যবস্থায়' বাপ-মা দশ বছরের একটা মেয়েকে 'মোটা ধেড়ে স্বামীর কাছে' ছেড়ে দেয়, তাকে ধিক্কার জানিয়ে স্বামী বিবেকানন্দ বলেন, 'কনসেন্ট আইন করবার সময়ে সমাজের নেতারা লাখো লোক জড় করে চেঁচাতে লাগল—আমরা আইন চাই না। অন্য দেশ হলে সভা করে চেঁচানো দূরে থাকুক, লজ্জায় মাথা গুঁজে লোকে ঘরে বসে থাকত—আমাদের সমাজে ওহেন কলঙ্ক আছে।'[২৭] 'সঞ্জীবনী', 'নব্যভারত', 'সহচর', 'ইন্ডিয়ান মিরর' প্রভৃতি পত্রিকাগুলি সম্মতি আইনের পক্ষে মতামত প্রকাশ করতে থাকে। 'রইস অ্যান্ড রায়ত'-এর সম্পাদক শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এই বিলের সমর্থনে তাঁর পত্রিকায় একের পর এক লেখা প্রকাশ করতে থাকেন। গর্ভাধান ব্যবস্থার প্রধান সমর্থক শশধর তর্কচূড়ামণিকে পত্রিকাটি 'দি চ্যাম্পিয়ন গর্ভাধানিস্ট' হিসাবে চিহ্নিত করে। বাঙালি সমাজের একাংশ এ-বিষয়ে মধ্যপন্থা অবলম্বন করাই শ্রেয় মনে করেন। বঙ্কিমচন্দ্রকে এই দলের প্রতিনিধি বলা যায়। তিনি মনে করতেন, এরকম কোনো আইন হলেও ক্ষতি নেই, না হলেও নয়।

প্রস্তাবিত আইন সম্পর্কে সামাজিক এই প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করে সরকার এ-বিষয়ে বিদ্যাসাগরের মত জানতে চাইলেন। বাল্যবিবাহের বিরোধী, মুক্তদৃষ্টিসম্পন্ন এই মানুষটি এই আইনকে সমর্থন জানাবেন, নব্যশিক্ষিতের দল এটাই আশা করেছিলেন। বিদ্যাসাগর কিন্তু শাস্ত্রবিধির ওপর অতিমাত্রায় গুরুত্ব দিয়ে প্রস্তাবিত এই বিলটি সম্পর্কে অভিমত জানাতে গিয়ে বললেন :

'এই বিলের সর্বতোভাবে অনুমোদন করিতে আমি সমর্থ নহি। যেস্থলে স্ত্রী দ্বাদশ বর্ষ বয়ঃক্রমের পূর্বে ঋতুমতী হয়, সে স্থলে উক্ত বিল আইনে পরিণত হইলে, সর্ববিধায়ে গর্ভাধান সংস্কারানুষ্ঠানের প্রতিপক্ষ হইয়া দাঁড়াইবে। গর্ভাধান সংস্কার শাস্ত্রবিহিত ; সকলের পক্ষে অনুষ্ঠেয় ও সাধারণত বঙ্গদেশে প্রচলিত।…যেহেতু কতকগুলি বালিকা দ্বাদশ বর্ষ অতিক্রম করিবার পূর্বেই প্রথম রজোদর্শন করে, বিল আইনে পরিণত হইলে, তাহাদিগের সম্বন্ধে উক্ত বিধির অনুষ্ঠান আদৌ হইতে পারিবে না, সুতরাং রাজবিধি দ্বারা উক্ত ধর্মানুষ্ঠানের প্রতিরোধ করিলে…জনসমাজে ইহার বিরুদ্ধে অভিযোগ যুক্তিযুক্ত বলিয়া প্রতীয়মান হয়।…যদিও এইসকল কারণে আমি বিলের সমর্থন করিতে অপারগ, তথাপি প্রচলিত কোন ধর্মসংস্কারের প্রতিকূলাচরণ না করিয়া, এমন কোন আইন হউক, যাহাতে বালিকা স্ত্রীগণ সমুচিত আশ্রয় প্রাপ্ত হয়। তাহাতে আমি সম্পূর্ণ অভিলাষী। আমার প্রস্তাব এই যে,

স্ত্রী রজঃস্বলা হইবার পূর্বে তৎসহবাস দণ্ডনীয় অপরাধ বলিয়া নির্দিষ্ট হউক। অধিকাংশ বালিকা ত্রয়োদশ, চতুর্দশ অথবা পঞ্চদশ বর্ষের পূর্বে প্রায় রজঃস্বলা হয় না। সুতরাং আমার প্রস্তাব বিধিবদ্ধ হইলে, তাহাদিগকে প্রস্তাবিত আইন অপেক্ষাকৃত বাস্তবিক ও অধিকতর প্রশস্ত আশ্রয় প্রদানে সমর্থ হইবে, তৎসঙ্গে ধর্মানুষ্ঠানের বিরোধী বলিয়া উক্ত বিধির বিরুদ্ধে কোনপ্রকার আপত্তি উত্থাপিত হওয়া সম্ভবপর নহে। হিন্দু শাস্ত্রানুসারে রজঃস্বলার পূর্বে স্ত্রী-সহবাস স্বামীর পক্ষে নিতান্ত ধর্মবহির্ভূত কার্য।...

'এইরূপ সবিশেষ পর্য্যালোচনা করিলে, ইহাই যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধহয় যে, রজঃস্বলার পূর্বে স্ত্রী-সহবাস দণ্ডনীয় অপরাধ বলিয়া গণনীয় হইবে। ঈদৃশ আইন বিধিবদ্ধ হইলে যে, কেবল জনসমাজের উপকার ও বালিকা পত্নীগণের সমুচিত রক্ষা হইবে, তাহা নহে, বরং শাস্ত্রানুমোদিত ধর্মানুষ্ঠানের বিরোধী না হইয়া শাস্ত্রনির্দিষ্ট বিধির সমর্থন বাড়িবে। উক্ত নিয়মের বিরুদ্ধাচরণ করিলে শাস্ত্রে যে দণ্ডবিধির উল্লেখ আছে, তাহা আধ্যাত্মিক; সুতরাং অধিকাংশের অগ্রাহ্য। আইনানুসারে ইহা দণ্ডের দ্বারা নিষিদ্ধ হইলে, শাস্ত্রীয় বিধি অধিকতর কার্য্যকরী হইবে।'[২৮]

বিদ্যাসাগরের এই অভিমত সম্পর্কে দুটি জিনিস লক্ষণীয়। প্রথমত, রাজবিধি দ্বারা গর্ভাধানের মতো ধর্মানুষ্ঠানে বাধা সৃষ্টি করার তিনি যে বিরোধী, তা স্পষ্টভাষায় জানাতে তিনি দ্বিধাবোধ করেননি। যদিও তাঁরই সমকালে স্বামী বিবেকানন্দ, রমেশ-চন্দ্র দত্ত, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, রাসবিহারী ঘোষ, শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও আরো কেউ কেউ গর্ভাধান ব্যবস্থার তীব্র সমালোচনা করেন। প্রসঙ্গত স্মরণীয়, এই আইনের দুই প্রধান বিরোধী শশধর তর্কচূড়ামণি ও কৃষ্ণপ্রসন্ন সেনের বক্তব্য ছিল, এই আইন প্রচলিত হলে হিন্দুদের গর্ভাধান অনুষ্ঠানের বিঘ্ন হবে; কাজেই এই আইন চালু করা একেবারেই উচিত নয়। তবে প্রচলিত ধর্মসংস্কারের বিরুদ্ধতা না করে বালিকা পত্নীদের জন্য রক্ষাকবচের ব্যবস্থায় বিদ্যাসাগরের কোনো আপত্তি ছিল না। যেহেতু হিন্দুশাস্ত্রমতে রজঃস্বলা হওয়ার পূর্বে স্বামীর স্ত্রী-সহবাস ধর্মবহির্ভূত, তাই তিনি প্রস্তাব করলেন, 'স্ত্রী রজঃস্বলা হইবার পূর্বে তৎসহবাস দণ্ডনীয় অপরাধ বলিয়া নির্দিষ্ট হউক।' সম্ভবত তিনি বিশ্বাস করতেন রজঃস্বলা হলে কেউ আর বালিকা থাকে না। বিদ্যাসাগরের এই মত অভিনব কিছু নয়। গর্ভাধান ব্যবস্থার একনিষ্ঠ সমর্থক শশধর তর্কচূড়ামণিও রজঃস্বলা হবার আগে মেয়েদের সঙ্গে সহবাসের বিরোধী ছিলেন। সহবাস সম্মতি বিষয়ে বিতর্কের সময়ে তিনি বলেন, 'স্ত্রী ঋতুমতী হইবার পূর্বে তাহার সহিত সহবাস করিবার রীতির আমরা বিরোধী।...বালিকা ঋতুমতী হইবার পূর্বে তাহার সহিত সহবাস আমরা মহাপাপ বলিয়া মনে করি এবং আমাদের এই বিশ্বাস যে উহা আমাদের অবনতির ভীষণ কারণ। আমরা জানি যে হিন্দুসমাজ এই রীতিকে মহাপাপ বলিয়া মনে করে না সেই জন্যই হিন্দুদিগের অবনতি।'[২৯] হিন্দু-শাস্ত্র অনুমোদিত গর্ভাধান ব্যবস্থার প্রতি বিদ্যাসাগরের এই অভিমতায় নিষ্ঠা

ঈশ্বরচন্দ্র তাই শাস্ত্র দিয়ে শাস্ত্রের মুখ বন্ধ করতে চাইলেন। শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে সমাজ সংস্কারের সূত্রপাত রামমোহন থেকে—বিদ্যাসাগরও এবার থেকে নিষ্ঠার সঙ্গে সেই পথ অনুসরণ করলেন।

বিদ্যাসাগর যখন বিধবাবিবাহের সমর্থনে শাস্ত্রবচন সংগ্রহে ব্যস্ত, বাংলার নব্যযুবকরা তখন বিষয়টি নিয়ে আলাপ-আলোচনায় মত্ত। ২৫. ৩. ১৮৫২-য় 'সংবাদ প্রভাকর'-এ প্রকাশিত একটি কবিতায় বিধবাবিবাহ বিষয়ে উৎসাহী যুবকদের সাফল্য কামনা করে লেখা হয়ঃ

'কয়জন জ্ঞানিবাবু, জ্ঞানিদ্রা হত।
বিধবার বিয়ে দিতে, হোয়েছেন ব্রত॥
মন খুলে আশীর্বাদ করিতেছি সবে।
বাবুদের অভিলাষ, পরিপূর্ণ হবে॥
উঠিয়া লাগুন সব, দৃঢ় অনুরাগে।'

১৮৫৩-র গোড়ার দিকে বিধবাবিবাহের সমর্থনে কলকাতায় খানতিনেক সভা হয়। এর প্রথমটিতে আশিজনের ও দ্বিতীয়টিতে একশোজনের মতো লোক হয়েছিল। শেষটিতে এত লোক হয়েছিল যে সকলের বসার ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়নি। সমবেত সকলে বিধবাদের শোচনীয় অবস্থার বর্ণনা করে বিধবাবিবাহের প্রতি তাঁদের সমর্থন জানান। এর অল্পদিন পরে ২৯ অক্টোবর, ১৮৫৩-য় রাধাকান্ত দেবের বাড়িতে অনুষ্ঠিত এক সভায় বিধবাবিবাহকে হিন্দুশাস্ত্রসম্মত বলে স্বীকার করে নেওয়া হয় (অবশ্য এই সভায় যাঁরা বিধবাবিবাহের পক্ষ সমর্থন করেছিলেন, পরবর্তীকালে তাঁরাই আবার এর বিরোধিতা করেন)। শুধু বাক্যব্যয় না করে শিক্ষিত বাঙালি যুবকদের দু'একজন বিধবাকে বিয়ে করতে এগিয়ে এলেন। এইরকম এক যুবক ১৮৫৪-য় 'বেঙ্গল হরকরা'য় চিঠি লিখে জানান, বিধবাবিবাহের প্রশ্নটি বাংলার শিক্ষিতসমাজে প্রায় ৩০ বছর ধরে আলোচিত হচ্ছে। এ নিয়ে কাগজে প্রচুর লেখালিখিও হয়েছে, কয়েকটি পুস্তিকাও বেরিয়েছে, বিভিন্ন সভায় বিষয়টি সমর্থিত হয়েছে, কিন্তু দুঃখের বিষয়, এ-পর্যন্ত কাজের কাজ কিছু হয়নি। দেশবাসীর লাঞ্ছনা ও গঞ্জনার ভয়ে এ কাজে কেউ এগিয়ে আসেনি। সেই কারণে দেশবাসীর ব্যঙ্গবিদ্রূপের ঝুঁকি মাথায় নিয়ে তিনি স্বজাতির (কায়স্থ) একজন বিধবাকে বিবাহ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। হরকরা-সম্পাদক যুবকটির মনোভাবের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন। এই সময়েই শান্তিপুরের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষাল বিধবাবিবাহ সম্পর্কে পণ্ডিতদের এক সভা আহ্বানে উদ্যোগী হন।

একদিকে যখন এত উদ্যোগ-আয়োজন, অন্যদিকে ঈশ্বরচন্দ্র তখন খুঁজে পেয়েছেন বিধবাবিবাহের সমর্থনে পরাশর সংহিতার সেই বিখ্যাত বচন (এই বচনটি অবশ্য ১৮৪২-এ 'বেঙ্গল স্পেক্টেটর'-এর পঞ্চম সংখ্যায় বিধবাবিবাহ সম্পর্কিত লেখাটিতে প্রকাশিত হয়েছিল)। এরই সাহায্যে বিধবাবিবাহ যে শাস্ত্রীয় কর্ম তা প্রমাণ করে

১৮৫৫-র জানুয়ারি মাসে তিনি প্রকাশ করলেন 'বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব'। প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে বাঙালি হিন্দুসমাজ হয়ে উঠল চঞ্চল, আলোড়িত। ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাতে বিদ্যাসাগরকে পনেরো হাজার কপি বই ছাপতে হল। বইটির অবিশ্বাস্য চাহিদা দেখে 'হিন্দু পেট্রিয়ট' লিখল ঃ

'We have called the circulation of Pundit Issur Chunder Bidyasagur's pamphlet unprecedented, for we do not think that the history of Bengali literature presents another instance of so universal, yet so rapid, a dissimination of a writing. From the moment it issued from the press, it created a sensation which extended itself to the very corners of the country. It stirred Bengalee society to its very depths.'[৩৪]

পত্রপত্রিকাগুলি ছোট এই পুস্তিকাটির পরিচয় দিতে ব্যস্ত হয়ে উঠল। 'সংবাদ প্রভাকর' সম্পাদক একবার নয়, বারবার পুস্তিকাটি সম্পর্কে তাঁর মতামত প্রকাশ করলেন। ৮.২.১৮৫৫-য় তিনি লিখলেন, 'বিধবা বিবাহ উচিত কিনা, এই প্রস্তাব বিষয়ে সংস্কৃত কালেজের প্রিন্সিপেল অদ্বিতীয় পণ্ডিতবর শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন, তিনি পরাসর সংহিতা হইতে যে সমস্ত প্রমাণ লিখিয়াছেন তাহা একপ্রকার অকাট্য বলিতে হইবেক। ঐ পুস্তক পাঠ করা হিন্দুমাত্রেরই পক্ষে অতি প্রয়োজনীয়।' পরের দিন 'প্রভাকর' সম্পাদক আবার পুস্তিকাটি সম্পর্কে বললেন, 'পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় বিধবা বিবাহের কর্ত্তব্যতা বিষয়ে যে পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা অতি উত্তম হইয়াছে, ঐরূপ পুস্তকসকল প্রকাশপূর্বক বিধবা মহিলাগণের বিবাহ বিষয়ে সাধারণের উৎসাহ বৃদ্ধি করা অতি আবশ্যক বলিতে হইবেক।'[৩৫] এর পরের দিনের 'প্রভাকরে' আবার বিদ্যাসাগরের পুস্তিকা সম্পর্কে লেখা হল, 'সংস্কৃত কালেজের প্রধানাধ্যাপক অদ্বিতীয় পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় এক পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন, ঐ পুস্তকে তিনি অনেক অকাট্য যুক্তিসকল প্রয়োগ করিয়াছেন।' পুস্তিকাটি বেরোনোর পর জনরব ওঠে, বিষয়টি নিয়ে বিচার-বিবেচনার জন্য খুব শীঘ্র রাধাকান্ত দেবের বাড়িতে এক সভা হবে। এই খবর দিয়ে 'প্রভাকর' মন্তব্য করে 'ঐ সভায় অনেক বিচক্ষণ পণ্ডিতগণের আগমন হইবেক, এবং অনুমান করি বিদ্যাসাগর মহাশয়ও ঐ সভায় উপস্থিত থাকিবেন, দেখা যাউক, তিনি কতদূর পর্য্যন্ত কৃতকার্য্য হয়েন।'[৩৬] সভা আহ্বানের প্রস্তাবকে এইকালের বিশিষ্ট পত্রিকা 'মর্নিং ক্রনিকল'ও স্বাগত জানায়। সভা আহ্বানে বিলম্ব দেখে 'কেসাঞ্চিৎ হিন্দুনাং' নামান্তরালে জনৈক ব্যক্তি 'প্রভাকরে' রাধাকান্তকে পরামর্শ দিয়ে বললেন, তিনি যদি বিধবাবিবাহকে অশাস্ত্রীয় বলে মনে করেন, তাহলে যেন প্রকাশ্য এক সভা আহ্বান করে 'শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের

সহিত যথার্থ বিচারে মস্তকোত্তোলন করেন…।' যে-কোনো কারণেই হোক, বিষয়টি বিচার করে দেখার জন্য কোনো সভা এ-সময়ে আহ্বান করা হয়নি।

না হলেও, বিদ্যাসাগরের বইটি সম্পর্কে উৎসাহের কোনো অভাব দেখা গেল না। ১৮৫৫-র মার্চ মাসের গোড়ার দিকে বইটি সম্পর্কে সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে 'সংবাদ প্রভাকর' আবার লিখল:

'হিন্দু শাস্ত্রানুসারে বিধবাদিগের পুনঃপরিণয় হয়, এরূপ বিধি আছে, তৎ-প্রমাণার্থে বিদ্যানিধি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় এক পুস্তক রচনা করিয়াছেন, সেই পুস্তকপাঠে ধর্মানুরাগী মনুষ্যমাত্রেই নিতান্ত সুখী হইয়াছেন, এবং যাহাতে তাহার প্রচলন হয় এমত চেষ্টা করিতেছেন। যুক্তি অনুসারে বিচার করিলে বিধবাবিবাহের আবশ্যকতাই হৃদয়ঙ্গম হয়, এবং শাস্ত্রে তাহার পোষক প্রমাণ থাকুক বা না থাকুক, তথাপি বিধবাদিগের এখনি পুনরায় পরিণয়ের প্রথা সম্যগরূপে প্রচলিত হওয়া আবশ্যক বোধহয়, ইহাতে যদি সৌভাগ্যক্রমে অস্মদশাস্ত্রে ইহার অনুকূল বচন রহিল তবে কেন বৃথা কলহ ও বিবাদ।'[৩৭]

'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' ১৭৭৬ শকের ফাল্গুন সংখ্যায় বিদ্যাসাগরের 'বিধবাবিবাহ' পুস্তিকাটি সম্পূর্ণ পুনর্মুদ্রিত করে এবং চৈত্র সংখ্যায় একটি প্রবন্ধে যুক্তিপথ আশ্রয় করে বিধবাবিবাহের অনুকূলে মত প্রকাশ করে। পুস্তিকাটির প্রাপ্তিস্বীকার করে সমকালীন একটি সাহেবি কাগজ বলে: পুস্তিকাটি বাংলায় লেখা, আর এই ভাষা আমাদের ভাল জানা নেই বলে এর গুণাগুণ সম্পর্কে কোনো মন্তব্য করা আমাদের সাধ্যাতীত। তবে বর্তমান সময়ে হিন্দুরা নিজেরাই যখন বিধবাবিবাহের সমর্থনে সাহসের সঙ্গে এগিয়ে এসেছেন তখন বিষয়টি সম্পর্কে নীরব থাকা সমীচীন নয় বলে সম্পাদক পুস্তিকাটির গুণাগুণ একজন দেশীয় ব্যক্তিকে যাচাই করতে দেন। তিনি বিদ্যাসাগরের প্রচেষ্টাকে প্রশংসনীয় ও সাধুবাদের যোগ্য বলেন। তাঁর মতে এ-ব্যাপারে প্রত্যেকেরই উৎসাহ দেওয়া উচিত। তবে পুস্তিকাটির লিখনশৈলী উচ্চাঙ্গের বা সাধারণ পাঠকের উপযোগী নয়—একথা জানাতেও তিনি দ্বিধা করলেন না।[৩৮] এইকালের আর একটি প্রভাবশালী দৈনিক কিন্তু বিদ্যাসাগরের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে বলে:

'The author with his wanted perspecuity of language ; soundness of argument based on texts deduced from accredited Hindoo Scriptures most clearly and rationally proves that the marriage of Hindoo widows is not only desireable but is in no way antagonistic with the dogmas of the Hindoo Shaster. The interesting brochure in question is very neatly got up....and reflex credit on the learned author in having boldly taken the lead in unhesitatingly advocating the cause of Hindoo widow Marriage being himself a Brahmin and a Pandit of the first order of the present time.'[৩৯]

'সিটিজেন' এত প্রশংসা করলেও, 'হিন্দু ইনটেলিজেন্সার'-এর দেশীয় সম্পাদক বিদ্যাসাগরের বইটিকে প্রসন্নমনে গ্রহণ করতে রাজি হলেন না। পত্রিকাটির সম্পাদক কাশীপ্রসাদ ঘোষ হিন্দু কলেজে শিক্ষিত হলেও, মনোভাবের দিক দিয়ে ছিলেন রক্ষণশীল। বিদ্যাসাগরের পুস্তিকার দীর্ঘ সমালোচনাসূত্রে তিনি বললেন : সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বাংলায় লেখা বিধবাবিবাহ বিষয়ক একটি পুস্তিকা আমরা পেয়েছি। এতে পরাশর বচনের ওপর ভিত্তি করে বিদ্যাসাগর বলেছেন, বিধবাবিবাহ শাস্ত্রসম্মত। তিনি আরো বলেছেন, পরাশর বচন বিশেষভাবে কলিযুগের জন্য, তাই অন্যান্য শাস্ত্রকারের চেয়ে তাঁর মত আমাদের গ্রহণ করা উচিত। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, কলিযুগ শুরুর পর পাঁচ হাজার বছর কেটে গেছে, অথচ এই যুগের জন্য বিশেষভাবে নির্দিষ্ট পরাশর সংহিতার সারা হিন্দুস্তানেই বলতে গেলে কোনো প্রচলন নেই। সংস্কৃত কলেজের পণ্ডিত অধ্যক্ষ—বিদেশিরা যাঁকে উদার দৃষ্টিসম্পন্ন ও নিষ্ঠাবান গবেষক বলে মনে করেন, তিনি যদি এই ব্যাপারটার একটু ব্যাখ্যা করেন তাহলে ভাল হয়। আমাদের মনে হয়, পরাশরের বচন কোনোদিনই হিন্দুরা গ্রহণ করেনি এবং অদূর ভবিষ্যতে করবে এমন কোনো সম্ভাবনাও নেই।[৪০] কাশীপ্রসাদ পরাশর বচনকে ভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করে প্রশ্ন তুললেন, পরাশরের সমস্ত বচনকে সংস্কারকরা কি আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করতে প্রস্তুত? তিনি আরো বললেন, তর্কের খাতিরে যদি ধরেও নিই, হিন্দুশাস্ত্রে বিধবাবিবাহের সমর্থন আছে, তাহলেও পরাশর সংহিতা রচিত হবার পাঁচ হাজার বছরের মধ্যে এ ঘটনা ঘটেনি, পূর্ববর্তী তিন যুগেও এরকম কোনো কিছু ঘটেছে বলে আমাদের জানা নেই। আলোচনার শেষে সংস্কারকদের কাছে আবেদন জানিয়ে তিনি বললেন, সমাজে আরও বহু কুপ্রথা আছে—যা অল্পায়াসে দূর করা যায়, আর সংস্কারকদের উচিত সেদিকে মনোযোগ দেওয়া। বিধবাবিবাহের প্রশ্নটি কাল ও শিক্ষার ওপর ছেড়ে দেওয়াই শ্রেয়। কারণ আমাদের পারিবারিক জীবনে এরকম কোনো কিছু ঘটার আশা সুদূরপরাহত।[৪১]

এই লেখাটি বেরোনোর দিন দুয়েক পরে 'হিন্দু পেট্রিয়ট' বিদ্যাসাগরের পুস্তিকাটি সম্পর্কে লেখে : পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বিধবাবিবাহের বিষয়টি খোলা মনে অনুসন্ধান করেছেন। হিন্দুশাস্ত্রে বিধবার বিবাহ বিষয়ে বিধান আছে কিনা সে বিষয়ে অনুসন্ধান করতে গিয়ে তিনি পরাশর সংহিতার একটি বচন উদ্ধার করে দেখিয়েছেন, যে পাঁচটি ক্ষেত্রে নারীর পুনর্বিবাহ শাস্ত্রসম্মত, তার মধ্যে স্বামীর মৃত্যু একটি। বর্তমান কালে পুনর্বিবাহ ছাড়া বিধবার অন্য কোনো পথ নেই—বিদ্যাসাগরের এই বক্তব্যকে সমর্থন করে 'হিন্দু পেট্রিয়ট' বলে, এ-বিষয়ে লেখকের যুক্তিগুলি খুবই দৃঢ় এবং সঙ্গত। 'হিন্দু ইনটেলিজেন্সার' সম্পাদক বিষয়টি ভিন্নভাবে দেখায় ক্ষোভ প্রকাশ করার সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যাসাগরের পুস্তিকার দু' একটি অসম্পূর্ণতার উল্লেখ করে সম্পাদক লিখলেন :

'The principal of the Sanscrit College has omitted, we think not improperly, any mention of the mode in which the re-marriage of widows might be celebrated consistently with the rules of the Hindu law, the rights which the off spring of such marriages acquires, and other minor details, his chief aim being to convince his countrymen that the existing obnoxious practice may be removed without a breach of the Hindu law.'[৪২]

'বেঙ্গল হরকরা'তেও একজন দেশীয় ব্যক্তি বিধবাবিবাহ সম্পর্কে 'হিন্দু ইনটেলিজেন্সার'-এর সম্পাদকের মনোভাবের সমালোচনা করে তাঁকে বিদ্যাসাগরের বইটি ভালোভাবে পড়ার উপদেশ দিলেন। সেকালের পত্রপত্রিকাগুলি বিদ্যাসাগরের পুস্তিকাকে যে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছিল, তা বোঝাই যাচ্ছে। পুস্তিকাটির আলোচনাকালে বিদ্যাসাগরের মৃদু সমালোচনাও করেছিলেন কেউ কেউ, কিন্তু বিদ্যাসাগরের বক্তব্যকে সরাসরি উড়িয়ে দিতে পারেননি। পত্রিকার সম্পাদকরা যা পারেননি, সে কাজ করতে এগিয়ে এলেন হিন্দুসমাজের স্বাস্থ্যরক্ষায় তৎপর একদল ব্যক্তি। এঁদের নেতা হলেন রাধাকান্ত দেব। বিদ্যাসাগরের পুস্তিকায় তিনি 'want of true reasoning, profound reflection, just observation and faithful version of the passages cited from Parasara'[৪৩] লক্ষ্য করলেন। তাই তিনি পণ্ডিতদের নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন এর উপযুক্ত জবাব দিতে। নামী-অনামী বহুজন ছোট-বড় পুস্তক প্রকাশ করে বিদ্যাসাগরের বক্তব্যের প্রতিবাদ জানালেন। প্রতিবাদকারীদের মধ্যে ব্রাহ্মণ-পুরোহিতরাই দলে ভারি।[৪৪] ১৭৭৬ শকের চৈত্র মাসের 'তত্ত্ববোধিনী'তে প্রকাশিত 'বিধবাবিবাহ' নামক লেখাটি থেকে জানা যায়, বিদ্যাসাগরের পুস্তিকার প্রত্যুত্তরস্বরূপ চার-পাঁচটি বই ইতিমধ্যেই প্রচারিত হয়েছে। এর একটি ভবশঙ্কর বিদ্যারত্ন—যিনি বছর দেড়েক আগে এই বিষয় প্রচলিত হওয়া উচিত বলে বিধান দিয়েছিলেন, তাঁরই সহায়তায় প্রস্তুত। অন্য একটি সূত্র থেকে জানতে পারি, ১৮৫৫-র মার্চ মাসের মধ্যেই এর প্রত্যুত্তরে সাত-আটখানি পুস্তিকা প্রচারিত হয়।[৪৫] বছর ঘুরতে না ঘুরতে প্রতিবাদ পুস্তকের সংখ্যা পৌঁছল তিরিশে।[৪৬] সমকালীন একটি পত্রিকা বাংলায় এ-বিষয়ক পুস্তিকার উল্লেখপ্রসঙ্গে কাশীপুরের শশিজীবন ও রামজীবন ভট্টাচার্য, কৃষ্ণকিশোর নিয়োগী ও ভবশঙ্কর বিদ্যারত্ন, ভবানীপুরের প্রসন্নকুমার মুখোপাধ্যায়, পলতার শ্যামনাথ রায়চৌধুরী প্রভৃতি রচিত পুস্তিকা ছাড়াও 'ধর্মমর্মসভা' প্রকাশিত একটি পুস্তিকার উল্লেখ প্রসঙ্গে মন্তব্য করে, বিধবাবিবাহের পক্ষে যেখানে একটিমাত্র পুস্তিকা, সেখানে এর বিপক্ষে সাত-আটটি পুস্তিকাই বলে দিচ্ছে, দেশীয় মন এ-আন্দোলনের জন্য কতখানি প্রস্তুত।[৪৭] বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ সংক্রান্ত বইটির প্রতিবাদে যেসব বই লেখা হয়েছিল, তার মধ্যে অনেকগুলিই বেশ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। বর্ধমানের গঙ্গাধর দে-র লেখা একটি বইয়ের হাজার কপি দেখতে দেখতে বিক্রি হয়ে যায়।

বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহের প্রতিবাদ পুস্তকের মধ্যে যেগুলি আমাদের চোখে পড়েছে, সেগুলিতে মোটামুটিভাবে দুটি রীতি অনুসৃত। প্রথমটি শাস্ত্রবিচারের, দ্বিতীয়টি নিছক কটূক্তি ও গালিগালাজের। যেসব বইতে শাস্ত্রবিচারের পথ অনুসরণ করা হয়েছে, সেগুলির মধ্যে ১৭৭৭ শকাব্দে বর্ধমানের মহারাজার আদেশানুসারে পদ্মলোচন ন্যায়রত্ন সংগৃহীত 'বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া অত্যন্ত অনুচিত এতদ্বিষয়ক প্রমাণসমূহ'-এর কথা প্রথমেই উল্লেখ্য। ১১২ পৃষ্ঠার এই বইটি বিদ্যাসাগরের প্রথম পুস্তিকার প্রত্যুত্তরে লেখা হলেও, বিদ্যাসাগর বিধবাবিবাহ বিষয়ক দ্বিতীয় পুস্তক রচনার পর পদ্মলোচনের উত্তর-পুস্তকটি পান। গ্রন্থটিতে লেখকের সৌজন্য ও বিনয় চোখে পড়ার মতো। 'মহামান্য' ও 'বিশ্ববিখ্যাত' পণ্ডিত বিদ্যাসাগর শাস্ত্রব্যাখ্যায় কি ধরনের চাতুর্যের পরিচয় দিয়েছেন, তার আলোচনা করে, তিনি বিদ্যাসাগরকে 'স্বীয় দুরাশা' ত্যাগ করার পরামর্শ দিয়েছেন। বিদ্যাসাগরের পুস্তিকার প্রায় প্রতি পৃষ্ঠার সমালোচনা করেছেন তিনি। গ্রন্থশেষে বিদ্যাসাগর যে শাস্ত্রনিরপেক্ষ লৌকিক যুক্তিযুক্ত আবেদন রেখেছেন, তার সমালোচনা করে তিনি বলেছেন, 'লৌকিক কষ্টের ভয়ে কে কবে ধর্মত্যাগ করিয়াছে।' বিধবাবিবাহের অভাব নয়, রাজদণ্ডাভাবই তাঁর মতে ব্যভিচারের মূল কারণ। পরিশেষে মহামান্য পাঠক ও দেশমান্য বিদ্যাসাগরের কাছে গ্রন্থকারের বিনীত নিবেদন, নিরপেক্ষভাবে এ পুস্তক পর্যালোচনা করে সকলে দেখুন, 'বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া অত্যন্ত অনুচিত কিনা।'

ব্রাহ্মমতাবলম্বী ভবানীপুরের প্রসন্নকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর 'বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত নহে'তে সোজাসুজি বললেন, 'ব্যবহারবিরুদ্ধ' বিধবাবিবাহ প্রচলিত না থাকাতে উপকার ছাড়া অপকার নেই। সূচনাতেই বিদ্যাসাগরকে নমস্কার জানিয়ে নিবেদন করা হয়েছে যে তাঁর বই পড়ে লেখকের অন্তঃকরণে নানা সন্দেহের উদয় হওয়াতেই তিনি এই পুস্তিকা রচনা করেছেন। 'মহাশয় বা মহাশয়ের কোন হিন্দু বিধবাবিবাহে উৎসাহী বান্ধব কৃপাবলোকনে অত্র পত্রিকা পাঠান্তে সংসয়চ্ছেদ করিলে কৃতকৃতার্থ জ্ঞান করিব।' প্রসন্নকুমারের মতে বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহের অনুকূলে গৃহীত বচন বর্তমান কালোপযোগী নয়, তার ওপর এদেশের আচার-ব্যবহারের সঙ্গে বিধবাবিবাহ কোনোমতেই খাপ খায় না। এ-প্রথা চালু নেই বলেই এদেশে 'সতী স্ত্রী সংখ্যা' সবচেয়ে বেশি। অশাস্ত্রীয় এ-প্রথা চালু করা মোটেই উচিত বা কর্তব্য নয়। বিশেষ করে, যেখানে বিধবাবিবাহ প্রচলিত আছে, সেখানেও তো ভালো ফল কিছু দেখা যাচ্ছে না। 'সভ্যজাতীয় সম্ভ্রান্ত লোকেরা'ও এ কাজকে 'ঘৃণা' করেন। অন্য আশঙ্কাও প্রকাশ করলেন প্রসন্নকুমার। বিধবাবিবাহ প্রচলিত হলে স্বামী যদি মনের মতো না হয়—তাহলে মেয়েরা হয়তো তাকে হত্যাই করে বসবে। তাই তাঁর অভিমত 'এতদ্দেশে বহুবিবাহ ও অল্পবয়সে বিবাহ ইত্যাদি যেসব কুসংস্কার প্রচলিত আছে তাহা নিবারিত হইলে বিধবাবিবাহের কোনো প্রয়োজন থাকিবেক না।'[৪৮] আর সেগুলি নিবারণে সচেষ্ট না হয়ে, 'নিষ্প্রয়োজনীয়, লজ্জাস্কর, শাস্ত্রবিরুদ্ধ

বিধবাবিবাহের নূতন নিয়ম প্রচলিত করণে' যত্নবান হওয়ায় তিনি ক্ষোভপ্রকাশ করেন।

বোঝা যাচ্ছে, প্রসন্নকুমার সমস্যাটি নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করেছিলেন। আর তাঁর সেই চিন্তার ফসল শাস্ত্রালোচনার উপযোগী ভাষায় বিনীতভাবে অথচ দৃঢ়তা সহকারে লেখা এই ছোট পুস্তিকাটি। বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ বিষয়ক প্রথম পুস্তিকার প্রতিবাদে লেখা বইগুলির মধ্যে আমাদের মতে এটিই শ্রেষ্ঠ।

'ধর্মমর্ম প্রকাশিকা সভা'র অবৈতনিক সহকারী সম্পাদক দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন ১২৬১ বঙ্গাব্দে গুরু-শিষ্যের কথোপকথনের ভঙ্গিতে লিখলেন 'বিধবাবিবাহবাদ' (১ম খণ্ড)। ছাব্বিশ পৃষ্ঠার এই পুস্তিকাটির মূল প্রতিপাদ্য বিধবাবিবাহের অশাস্ত্রীয়তা। বিদ্যাসাগরের গ্রন্থকেন্দ্রিক গুরুগম্ভীর এই শাস্ত্রীয় বিচারে দীনবন্ধু কোথাও বিদ্যাসাগরের প্রতি এতটুকু শ্লেষ বা কটাক্ষ করেননি।

তা না করেও, পীতাম্বর সেন কবিরত্ন তাঁর 'বিধবাবিবাহ নিষেধঃ'-এ আর একধাপ এগিয়ে গিয়ে বললেন, পরাশর সংহিতায় 'বিধবাবিবাহের' কথা দূরে থাক, 'বিধবা' শব্দই নেই। আর যা নেই, তা নিয়ে এত গণ্ডগোল কিসের! বিধবা সে তো মেয়েরা পূর্বজন্মের পাপে হয়। কাজেই আবার বিয়ে হলে, আবারও তারা বিধবা হবে—তাহলে 'কতবার নারীদিগের বিবাহ হইতে পারে।' শুধু তাই নয়, মেয়েরা কি সহজ চিজ! একবার যদি তারা শোনে, বিধবাবিবাহ চালু হবে—তাহলে যাদের স্বামী 'নির্গুণ' বা 'নির্ধন' বা যাদের স্বামী পছন্দসই নয়, তারা তো স্বামীকে হত্যাই করবে। পথের কাঁটা হয়ে যদি কোনো ছেলে থাকে, তাকেও মারতে হাত কাঁপবে না। আর ছেলেকে যদি নাও মারে, ছেলে মায়ের কাণ্ড দেখে লজ্জায় প্রাণত্যাগী কিংবা দেশত্যাগী হবে। শেষে বিদ্যাসাগরের প্রতি তিনটি মোক্ষম প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়ে তিনি তাঁর বই শেষ করেছেন। প্রশ্নগুলি এইরকম:

'হেগ বিদ্যাসাগর মহাশয় আপনে যত্নক্রমে রত্ন উত্থাপন করিয়া নবীন নাগরদিগের মনোভিলাস প্রকাশ করিয়াছেন অত্র বিষয়ে আমার কতিচিৎ প্রশ্নের ব্যবস্থাবিধি রচনাযুক্ত কিনা বিবেচনা করুন। আদৌ পুত্রবতী যুবতী বিধবা পুনর্বিবাহিতা হইয়া তৎপক্ষে পুত্রকন্যা বর্তমানে স্বর্গগতা হইলে তাহার একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ পূর্বপতিজাত পুত্রে করিবে কি অপর পতিজাত পুত্রে করিবে এবং পূর্বপুত্রে করিলে কোন জাতির কতদিনে শ্রাদ্ধ হইবে এবং তদ্বাক্যে কোন গোত্র উল্লেখ হইবে এবং পূর্বপুত্র অথবা পরপুত্র উভয়মধ্যে একের মরণ হইলে অন্যের অশৌচ হইবে কিনা এবং পূর্বপুত্র ভিন্নগোত্র হেতু অপর কন্যা বিবাহ করিতে পারিবে কিনা পূর্বপতি ক্লীব অথবা পতিত বিবেচনা করিয়া পুনর্বার বিবাহিতা হইলে পূর্বপতি অথবা অপরপতি উভয়ের মধ্যে একের মরণ হইলে উক্তা স্ত্রী বৈধব্য কি সাধব্য আচরণ করিবে পূর্বপতির মরণ হইলে উক্তা স্ত্রী অশৌচ গ্রহণ করিবে কিনা এবং পূর্বপতির অন্য শ্রাদ্ধাধিকারী

অসম্বে অন্যপাতি আশ্রিতা স্ত্রী তাহার শ্রাদ্ধাধিকারিণী এবং তৎসত্বাধিকারিণী হইবে কিনা।'[৪৯]

শাস্ত্রবিচারের ধার দিয়ে না গিয়ে কটূক্তি ও গালিগালাজের পথ ধরলেন অন্য একদল। ১২৬১ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত গ্রন্থকারের নামহীন একুশ পৃষ্ঠার 'বিধবাবিবাহ বিধায়ক কুলপঞ্জিকার কোন বর প্রদত্ত ভ্রমোদ্ধারক প্রত্যুত্তর'-এর কথাই ধরা যাক। লেখকের মতে 'পরাশর মতে বিধবাবিবাহের বিধি কল্পনা প্রতারণা মাত্র', এ-প্রথা প্রচলিত হওয়া 'কোনোমতেই উচিত ও শাস্ত্রবিহিত' নয়। কারণ বিধবা হওয়া তো মেয়েদের জন্মান্তরের পাপের ফল। তাই এ-প্রথা প্রচলনের চেষ্টা করে বিদ্যাসাগর ভদ্রসমাজে 'হাস্যাস্পদ' হয়েছেন। বিদ্যাসাগর বলেছিলেন, বিধবাবিবাহ প্রচলিত হলে অসহ্য বৈধব্যযন্ত্রণা, ব্যভিচারদোষ, ভ্রূণহত্যাপাপের নিবারণ ও তিনকুলের কলঙ্ক নিরাকরণ হতে পারে। গ্রন্থকার সরাসরি বিদ্যাসাগরকে আক্রমণ করে লিখলেন, 'ইহা যদি বিদ্যাসাগর মহাশয় নিশ্চয় জানিয়া থাকেন তবে তিনি এই প্রথা স্বগৃহে প্রচলিত করিয়া নিজ শিষ্যানুচরবর্গকে কেন পথ প্রদর্শন না করান।'[৫০] পুস্তিকাটিতে এ ধরনের অশালীন ব্যক্তিগত আক্রমণে বিদ্যাসাগর ব্যথিত হয়েছিলেন। বিধবাবিবাহ—দ্বিতীয় পুস্তকে বিষয়টির উল্লেখ করে তিনি লেখেন:

'একটি উত্তর পাঠ করিয়া, আমার সকল ক্ষোভ এককালে দূরীভূত হইয়াছে। উল্লিখিত উত্তরে লেখকের নাম নাই, এক বর ঐ উত্তর লিখিয়া প্রচার করিয়াছেন। এই বর, বয়সে বৃদ্ধ ও সর্বত্র প্রধান বিজ্ঞ বলিয়া বিখ্যাত হইয়াও, উত্তরপুস্তকে মধ্যেমধ্যে উপহাসরসিকতা ও কটূক্তিপ্রিয়তা প্রদর্শন করিয়াছেন। সুতরাং, আমি সিদ্ধান্ত করিয়াছি, ধর্মশাস্ত্রবিচারে প্রবৃত্ত হইয়া বাদীর প্রতি উপহাসবাক্য ও কটূক্তি প্রয়োগ করা এদেশে বিজ্ঞের লক্ষণ। অবিজ্ঞের লক্ষণ হইলে, যাঁহাকে দেশশুদ্ধ লোক একবাক্য হইয়া, সর্বপ্রধান বিজ্ঞ বলিয়া, ব্যাখ্যা করে, সেই মহানুভব বৃদ্ধ মহাশয় কখনও ঐ প্রণালী অবলম্বন করিতেন না।'[৫১]

ঐ একই প্রণালী অবলম্বন করে বেলঘরিয়ার গোবিন্দচন্দ্র শর্মা (মুখোপাধ্যায়) 'বিধবাবিবাহের নূতন প্রকার উত্তর'-এ শালীনতা ও সৌজন্যের রীতিকে পুরোপুরি বিসর্জন দিলেন। লেখকের মতে 'মহাম্লেচ্ছমত' বিধবাবিবাহপক্ষ ব্যক্তিদের মধ্যে আছে 'গেঁজেল, গুলিখোর', অল্পকিছু 'অর্থপিশাচ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত' ও 'ম্লেচ্ছমতে কুসংস্কারিত মহোদয়গণ'। সেযুগের আরো অনেকের মতো তাঁরও বিশ্বাস, বিধবা হওয়া পূর্বজন্মের পাপের ফল। বিধবাবিবাহের সমর্থকদের ব্যঙ্গ করে পুস্তিকাটির সঙ্গে 'শ্রী মহেশ্বরাদিত্য বিদ্যামহার্ণব' এই কাল্পনিক নামে 'বিবাহপ্রথা অপ্রচলিত হওয়া উচিত' নামক একটি ব্যঙ্গাত্মক রচনায় কয়েকটি অভিনব যুক্তি দেখিয়ে তিনি বিধবাবিবাহের বিপক্ষতা করেন। সধবাবিবাহের মতো বিধবাবিবাহও প্রচলিত হওয়া উচিত নয়—এই হল লেখকের বক্তব্য। শালীনতার অভাব, বিদ্যাসাগরের প্রতি কটাক্ষ, অমার্জিত রুচি—সব মিলিয়ে পুস্তিকাটি একটি অপদার্থ রচনা।

রুচিহীনতায় এদের সবাইকে অতিক্রম করে গেলেন 'নিত্যধর্মানুরঞ্জিকা'র সম্পাদক নন্দকুমার কবিরত্ন। পত্রিকার পৃষ্ঠায় বিধবাবিবাহ আন্দোলনের আদ্যশ্রাদ্ধ করেও সন্তুষ্ট না হয়ে বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ পুস্তিকার প্রত্যুত্তরে ইনি লিখলেন 'বৈধব্য ধর্মোদয়' (প্রথম পুস্তক)। পুস্তিকাটি প্রকাশের আগে বিজ্ঞাপনেই ইনি সমস্ত সৌজন্যের রীতি বিসর্জন দিয়ে বিদ্যাসাগরকে কুৎসিতভাবে আক্রমণ করায় 'সংবাদ প্রভাকর' ক্ষোভপ্রকাশ করে বলে:

'ধর্মানুরঞ্জিকা সম্পাদক মহাশয়···সংপ্রতি যে এক বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে শুদ্ধ ক্রোধ ও অভিমানের চিহ্নমাত্র দেখিতেছি। তিনি তন্মধ্যে নানা কটূক্তি করিয়াছেন, কিন্তু সেসব কটূক্তিপ্রতি আমরা ক্ষণমাত্রও কর্ণস্থাপনা করিব না। আমরা ইচ্ছা করিলে এখনি কটূক্তির ভান্ডার নির্মুক্ত করিতে পারি। কিন্তু তাহাতে কিছু ফল নাই। শুদ্ধ আপন স্বভাবকে নীচ ও জঘন্যাবস্থায় নিক্ষিপ্ত করা হয়। বিচারানুসারেই বিচার করা কর্ত্তব্য। যদি যথার্থই বিদ্যাসাগরের ভ্রম হইয়া থাকে ধর্মানুরঞ্জিকা সম্পাদক কোন সুমিষ্ট বচনে ভর্ৎসনা করুন, অনর্থক গালাগালি দিয়া আপন রসনা হইতে কটূক্তি নির্গত কেন করেন? আমারদিগেরই তিনি অশিষ্ট মতাবলম্বী বলেন, কিন্তু শিষ্টাচারের লক্ষণ কি? কুৎসিত বচন রচনা করা ও পরকে তুচ্ছতাচ্ছীল্য শব্দ প্রয়োগ করা যদি শিষ্টাচারের এই লক্ষণ হয়, তবে তিনিই শিষ্ট এবং আমরা অভদ্র। তিনি শীঘ্রশীঘ্র আপনার পুস্তক প্রকাশ করুন, আমরা অভদ্র মতাবলম্বী ক্ষুদ্র বুদ্ধি মনুষ্যেরা একমাত্র বিদ্যাসাগর আশ্রয়পূর্বক তাঁহার পুস্তক খণ্ডবিখণ্ড করিয়া কাটিয়া ফেলিব। যখন বিজ্ঞাপনেই এত আড়ম্বর, তখন পুস্তক মধ্যে কিনা লেখা হইবেক।'[৫২]

পুস্তিকাটি দেখার সুযোগ না হলেও, রাধাকান্ত-অনুরাগী গোঁড়া হিন্দু নন্দকুমার বিধবাবিবাহকে কি চোখে দেখেছিলেন ও বিদ্যাসাগরকে কি কুৎসিতভাবে আক্রমণ করেছিলেন, তা অনুমান করতে বিশেষ অসুবিধা হয় না।

এই ধরনের অশালীন আক্রমণগুলি বাদ দিলে বিদ্যাসাগরের প্রতিবাদ গ্রন্থগুলির অধিকাংশতে 'গভীর অকাট্য যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্যের সমাবেশ' দেখা যায়। মোটামুটি-ভাবে প্রতিবাদ পুস্তিকাগুলির প্রধান বক্তব্য তিনটি—বিধবাবিবাহ অশাস্ত্রীয়, বিধবা-বিবাহ এদেশীয় প্রথা ও আচারবিরুদ্ধ, বিধবা হওয়া পূর্বজন্মের পাপ—এর সঙ্গে অন্যান্য হরেকরকম বক্তব্য তো ছিলই। এইসব বক্তব্যকে খণ্ডন করে বিদ্যাসাগর ১৮৫৫-র অক্টোবর মাসে প্রকাশ করলেন 'বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব' (দ্বিতীয় পুস্তক)। আগড়পাড়ার মহেশচন্দ্র চূড়ামণি, কোন্নগরের দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন, আড়িয়াদহের শ্রীরাম তর্কালঙ্কার, পুটিয়ার ঈশানচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ, সয়দাবাদের গোবিন্দকান্ত বিদ্যাভূষণ, কৃষ্ণমোহন ন্যায়পঞ্চানন, রামগোপাল তর্কালঙ্কার, মাধবরাম ন্যায়রত্ন, রাধাকান্ত তর্কালঙ্কার, জনাই-এর জগদীশ্বর বিদ্যারত্ন, আন্দুল রাজসভার সভাপণ্ডিত রামদাস তর্কসিদ্ধান্ত, ভবানীপুরের প্রসন্নকুমার মুখোপাধ্যায়,

নন্দকুমার কবিরত্ন, আনন্দচন্দ্র শিরোমণি, গঙ্গানারায়ণ ন্যায়বাচস্পতি, হারাধন কবিরাজ, সর্বানন্দ ন্যায়বাগীশ, ভাটপাড়ার রামদয়াল তর্করত্ন, কমলকৃষ্ণ বাহাদুরের সভাসদগণ, কাষ্ঠশালীর শিবনাথ রায়, বারাণসীর ঠাকুরদাস শর্মা, পীতাম্বর সেন কবিরত্ন, শ্রীরামপুরের কালিদাস মৈত্র, কৃষ্ণকিশোর নিয়োগী, মুর্শিদাবাদের রামনিধি বিদ্যাবাগীশ প্রভৃতি পণ্ডিতদের মত তিনি তাঁর দ্বিতীয় পুস্তকে খণ্ডন করলেন।

বইটি বেরোনোর অল্পদিন পরে 'সমাচার সুধাবর্ষণ'-এ প্রকাশিত একটি কবিতায় বলা হল, বিধবাবিবাহের বিপক্ষে যত বই লেখা হয়েছিল, বিদ্যাসাগরের যুক্তির সামনে তার কোনোটিই দাঁড়াতে পারেনি। যেসব আপত্তি উঠেছিল, ঈশ্বরচন্দ্র সেগুলির যথাযথ সমাধান করে দিয়েছেন। তাই বিধবাদের আবার বিবাহের জন্য প্রস্তুত হবার আহ্বান জানিয়ে বলা হল ঃ

'দ্বিতীয় পুস্তক যাহা সাগর হইতে।
উঠিয়াছে সুপ্রমাণ রত্নাদি সহিতে ॥
সেসব প্রমাণরত্ন যত্নে করি হার।
বিবাহ সময়ে দিব গলে বিধবার ॥
সাজগো বিধবাগণ ফুটিয়াছে ফুল।
তোমাদের সৌভাগ্যে ঈশ্বর সানুকূল।'[৫৩]

বিদ্যাসাগরের দ্বিতীয় পুস্তকটি শুধু যে আকারে বড় তাই নয়, এটির রচয়িতা নিজের বক্তব্যে আরো আস্থাবান, আরো একনিষ্ঠ যুক্তিপরায়ণ। বিদ্যাসাগরের দরদী মনের স্পর্শে পুস্তকটি উষ্ণ। গ্রন্থের উপসংহারে বিদ্যাসাগরের নারীদরদী মনটি প্রকাশিত। 'হা অবলাগণ! তোমরা কি পাপে ভারতবর্ষে আসিয়া জন্মগ্রহণ কর, বলিতে পারি না'—এ যেন 'বাঙালি মা' বিদ্যাসাগরের দু' ফোঁটা চোখের জল!

১৭৭৭ শকের অগ্রহায়ণ সংখ্যা 'তত্ত্ববোধিনী'তে বিধবাবিবাহ দ্বিতীয় ভাগের পরিচয় প্রসঙ্গে বলা হয় ঃ

'শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় ইতিপূর্বে বিধবাদিগের পুনঃসংস্কার শাস্ত্রসম্মত বলিয়া যে পুস্তক প্রকাশ করেন, তাহা প্রচারিত হইয়া অবধি ঐ প্রস্তাব লইয়া হিন্দুসমাজে ঘোরতর আন্দোলন হইতেছে। এতদ্দেশীয় অনেক পণ্ডিত ও প্রধান বিষয়ী লোকদিগের মধ্যে অনেকে উক্ত বিষয় অপ্রচলিত রাখিবার অভিপ্রায়ে এক এক পুস্তক প্রচার করিয়া তাঁহার ঐ মতে বিস্তর আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন। সেই সকল আপত্তি যে নিতান্ত ভ্রান্তিমূলক ইহা প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত, বিদ্যাসাগর মহাশয় সংপ্রতি ঐ বিষয়ে দ্বিতীয় এক পুস্তক প্রকটন করিয়া প্রতিবাদীগণের সমুদয় পুস্তকের একত্র উত্তর দিয়াছেন।' বিদ্যাসাগরের বইয়ের উপক্রম ও উপসংহারভাগ উদ্ধৃত করে সম্পাদকীয় মন্তব্যে বলা হয় ঃ 'বিধবা স্ত্রীদিগের পুনর্বার বিবাহ *নিরাবলম্ব যুক্তি অনুসারে সর্বতোভাবেই কর্তব্য, তাহাতে সন্দেহ নাই।* ভারতবর্ষীয় শাস্ত্রানুসারে সম্পূর্ণ বিধেয় বলিয়া অবধারিত হইল। অতএব এক্ষণে উহা প্রচলিত

করিয়া তাহাদিগের অসহ্য বৈধব্যযন্ত্রণা ও ঘোরতর পাতকরাশি নিবারণ করিতে ক্ষণমাত্রও বিলম্ব করা উচিত নহে।'[৫৪]

'তত্ত্ববোধিনী'র বক্তব্য ও এতে প্রকাশিত বিদ্যাসাগরের বইয়ের অংশবিশেষ 'নিত্যধর্মানুরঞ্জিকা'র সম্পাদক নন্দকুমার কবিরত্নের ভালো লাগেনি। তাঁর মতে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার লেখক মহাশয় অতি সুবিচক্ষণ, স্বীয় চাতুর্য্যে এমত কৌশলে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন; যে তাহাতে তাঁহারাই যথার্থ ধর্মিষ্ঠ শাস্ত্রবিৎ সুসভ্য। তদিতর এতদ্ভারতবর্ষস্থ তাবতীয় হিন্দু জাতিমাত্রেই এককালে ভ্রষ্টাচারী শাস্ত্র বহিস্কৃত বিধর্মী নির্দয় পাষণ্ডরূপে পরিগণিত হইয়াছেন; তদর্থে হেতু দর্শন করাইয়াছেন; যে ইহারা দেশাচারে আবদ্ধ হইয়া বিধবাবিবাহে সম্মত নহেন।' বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ দ্বিতীয় পুস্তকে দেশাচারের প্রতি যে কটাক্ষ করা হয়েছে, নন্দকুমারের মতে তা প্রাচীন হিন্দুদের প্রতি প্রতিপন্ন না হয়ে যথেষ্টাচারী ইয়ংবেঙ্গলের সম্পর্কেই প্রযোজ্য। তাঁর মতে দেশাচারের প্রতি যে শ্লিষ্টবাক্য প্রযুক্ত হয়েছে, তা তাদের যথেষ্টাচারের প্রতিই প্রযোজ্য। বিদ্যাসাগর লিখেছিলেন, 'ধন্য রে দেশাচার! তোর কি অনির্বচনীয় মহিমা! তুই তোর অনুগত ভক্তদিগকে, দুর্ভেদ্য দাসত্বশৃঙ্খলে বদ্ধ রাখিয়া, কি একাধিপত্য করিতেছিস। তুই, ক্রমে ক্রমে আপন আধিপত্য বিস্তার করিয়া, শাস্ত্রের মস্তকে পদার্পণ করিয়াছিস, ধর্মের মর্মভেদ করিয়াছিস, হিতাহিতবোধের গতিরোধ করিয়াছিস, ন্যায় অন্যায় বিচারের পথ রুদ্ধ করিয়াছিস।'

এই রীতির অনুসরণ করে নন্দকুমার লিখলেন ঃ

'অরে যথেষ্টাচার, তুই ধন্য; তোর কি অনির্বচনীয় মহিমা। তুই কি এককালে তোর অনুগত ইয়ংবেঙ্গালদিগকে দুর্ভেদ্য মহামোহপাশে আবদ্ধ করিয়া নিতান্তই দাসত্বে নিযুক্ত করিয়া রাখিলি। অনুগত ভক্তমণ্ডলিমধ্যে একাধিপত্য করিতে বাসনা করিয়াছিস। তুই কি নিজ একাধিপত্য বিস্তারে সমস্ত বেদবেদান্ত পুরাণেতিহাসাদি শাস্ত্রের মস্তকোপরি পদার্পণ করিয়া পরাৎপর সনাতন ধর্মের মর্মভেদ করিতে উদ্যুক্ত হইয়াছিস! জনাকয়েক ইয়ংবেঙ্গালের সাহায্য পাইয়া হিতাহিতবোধের ও ন্যায় অন্যায় বিচারের এককালে গতিরোধ করিতে বসিয়াছিস।'[৫৫]

গ্রন্থের একেবারে শেষভাগে এদেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানিয়ে বিদ্যাসাগর লেখেন ঃ

'হা ভারতবর্ষীয় মানবগণ! আর কতকাল তোমরা, মোহনিদ্রায় অভিভূত হইয়া প্রমোদশয্যায় শয়ন করিয়া থাকিবে। একবার জ্ঞানচক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখ, তোমাদের পুণ্যভূমি, ভারতবর্ষ ব্যভিচারদোষের ও ভ্রূণহত্যাপাপের স্রোতে উচ্ছলিত হইয়া যাইতেছে।'

এর অনুকরণে নন্দকুমার লিখলেন ঃ

'হাঃ ভারতবর্ষীয় মানবগণেরা একবার নির্মলজ্ঞান দৃষ্টিতে অবলোকন করিয়া

আপনারদিগের অবস্থা দেখ ; যে তোমরা কি ছিলে কি হইতেছ। তোমরা পুণ্যক্ষেত্র ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করিয়াও ভোগে বঞ্চিত হইয়াছ।'

'নিত্যধর্মানুরঞ্জিকা' সম্পাদক এত কথা বললেও, বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ সম্পর্কিত দ্বিতীয় পুস্তকটি প্রথমটির মতো তাৎক্ষণিক সাড়া জাগাতে পারেনি। প্রকাশিত হবার তিন মাসের মধ্যে এর একখানিও প্রতিবাদ প্রকাশিত না হওয়ায় 'সম্বাদ ভাস্কর' লিখল, 'শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের দ্বিতীয় পুস্তক অনেকদিন বাহির হইয়াছে, সকলে পাঠে ২ তাহা পুরাতন করিয়া ফেলিয়াছেন তথাপি যে কেহ উত্তরের একখানা ঠাটমাত্রও বাহির করিলেন না, ইহাতেই বোধহয় ভাড়া পুঁজি শেষ হইয়া গিয়াছে।' 'হিন্দু পেট্রিয়ট', 'সিটিজেন', 'মর্নিং ক্রনিকল' প্রভৃতি যেসব পত্রিকা তাঁর প্রথম পুস্তিকা সম্পর্কে সোচ্চার হয়ে উঠেছিল, তারাও এটি সম্পর্কে বিশেষ কোনো আগ্রহ প্রকাশ করল না। তবে 'হিন্দু ইনটেলিজেন্সার'-এ জনৈক পত্রলেখক বিধবাবিবাহ প্রবর্তনের জন্য রচিত বিদ্যাসাগরের দুটি বইয়ের প্রশংসা করে বললেন ঃ বিধবাবিবাহের মতো একটি কাঙ্ক্ষিত অনুষ্ঠানের জন্য বিদ্যাসাগর তাঁর সমস্ত মনপ্রাণ নিয়োগ করেছেন। এ-বিষয়ে তাঁর গভীর নিষ্ঠা ও গবেষণা বিশেষ প্রশংসার দাবি রাখে। এই মহৎ মানুষটি বিধবাবিবাহের পক্ষে শাস্ত্রীয় প্রমাণ সংগ্রহের জন্য প্রচুর সময় ব্যয় করেছেন সত্য, কিন্তু প্রাচীনপন্থী জনগণ তাঁর এই মতের দ্বারা কতখানি প্রভাবিত হয়েছেন বলা মুশকিল। রক্ষণশীল হিন্দুরা যে তাঁর এই মত মেনে নেবেন না, পত্রলেখক তা জোর দিয়ে বললেন।[৫৬] এই ধরনের রক্ষণশীল মানুষরাই বিদ্যাসাগরের দ্বিতীয় পুস্তকটির প্রতিবাদ রচনায় ব্যস্ত হয়ে উঠলেন— যদিও সংখ্যায় তাঁরা নিতান্তই মুষ্টিমেয়। এইসব প্রতিবাদ পুস্তকের মধ্যে প্রসন্নকুমার দানিয়াড়ি ও ভাটপাড়ার পঞ্চানন তর্করত্নের প্রতিবাদ উল্লেখযোগ্য। প্রসন্নকুমার অভিযোগ করেন, বিদ্যাসাগর নিজের মত সমর্থনের জন্য অনেক শাস্ত্রের প্রকৃত পাঠ পরিবর্তন করেছেন। তাঁর এ অভিযোগের কতখানি ভিত্তি আছে বলা মুশকিল।

নন্দকুমার কবিরত্ন ও হারাধন বিদ্যারত্ন রচিত 'বৈধব্য ধর্মোদয়' গ্রন্থটিতে সাধারণ সৌজন্যের রীতি পদে পদে লঙ্ঘিত। লেখকদ্বয় বিদ্যাসাগরের বিরুদ্ধে 'মোহজালে আবদ্ধ' হয়ে 'এককালে ভদ্রাভদ্রজ্ঞানে' জলাঞ্জলি দেবার অভিযোগ করেছেন। বইটিতে দেশাচার ও শাস্ত্রাচারবিরুদ্ধ বিধবাবিবাহ নয়, ব্রহ্মচর্যই বিধবাদের একমাত্র উপায়— একথা বলা হয়েছে।

এই ধরনের আরেকটি বই কোঁড়কাদি নিবাসী রামধন দেবশর্মার 'বিধবাবেদন নিষেধক পুস্তক'। সংস্কৃত ঘেঁষা নিতান্ত আড়ষ্ট ভাষায় রচিত এই বইটিতে বিদ্যাসাগরের গ্রন্থের প্রায় প্রতি পৃষ্ঠার সমালোচনা করে তাঁর মতকে 'প্রলপিত অসাধু' বলা হয়। বিভিন্ন শাস্ত্রবচন ও তার অনুবাদ কণ্টকিত এই পুস্তকে সবদিক বিচার করে লেখকের সিদ্ধান্ত ঃ 'কলিযুগে বিধবাবিবাহ বিধি নাই, নিষেধই আছে প্রতিপন্ন করা

হইল।' বিদ্যাসাগরের 'ধন্য রে দেশাচার, হা অবলাগণ!' ইত্যাদি আক্ষেপোক্তিগুলিও লেখকের মতে অতি অযোগ্য। কারণ, বিধবা তো মেয়েরা অদৃষ্টানুসারে হয়!

বিধবাবিবাহ আন্দোলন শুধু শাস্ত্রীয় বিচার আর বাদ-প্রতিবাদেই সীমাবদ্ধ রইল না। স্বভাবকবি ধীরাজ বিদ্যাসাগরের নামে গান বাঁধলেন 'বিদ্যাসাগরের বিদ্যে বোঝা গিয়েছে।' 'অশ্লীল ও রুচিবিগর্হিত' এই গানটি শুনতে বিদ্যাসাগর রীতিমতো ভালোবাসতেন। ছড়ায়, গানে বিধবাবিবাহের কথা বাংলার সর্বশ্রেণীর লোকের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল। শান্তিপুরের তাঁতিরা কাপড়ের পাড়ে 'বেঁচে থাকুক বিদ্যাসাগর চিরজীবী হয়ে / সদরে করেছে রিপোর্ট, বিধবাদের হবে বিয়ে।' গান তুলে বেশ দু' পয়সা করে নিল। এই জনপ্রিয় গানকে ব্যঙ্গ করে 'শুয়ে থাক বিদ্যাসাগর চিররোগী হয়ে' বলে অন্য একটি গানও প্রচারিত হল। 'বিশ্বকোষে'র আদিকল্পক রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায়ও এই উপলক্ষে একটি গান লিখে ফেললেন—

'বেঁচে গেলুম ওলো দিদি একাদশীর দায়ে,
বিদ্যাসাগর দেবে নাকি, বিধবা রমণীর বিয়ে।
শাঁখা খাড়ু নড়বে হাতে, খেতে পাব মাছে ভাতে,
সাড়ি সিঁদুর পরে আবার বেড়াবো লো এয়ো হয়ে।
জামাই আসবেন শ্বশুরবাড়ি, সাজ করিব তাড়াতাড়ি,
গা দুলিয়ে চলবো আবার হরেক রকম বাহার দিয়ে।'[৫৭]

চন্দ্রকোণার রমাপতি বন্দ্যোপাধ্যায়ও এ-বিষয়ে একটি গান বাঁধলেন। এই গানগুলি লোকের মুখেমুখে সমাজের সর্বস্তরে ছড়িয়ে পড়ল। ঘরের বউ-ঝি থেকে আরম্ভ করে গরুর গাড়ির গাড়োয়ান পর্যন্ত তা গাইতে আরম্ভ করে। বাজার বুঝে বিখ্যাত পাঁচালিকার দাশরথি রায় লিখে ফেললেন 'বিধবাবিবাহ' নামে এক পালা। বিদ্যাসাগরকে ঈশ্বরের দূত হিসাবে চিহ্নিত করে তিনি লিখলেন:

'তোমরা এই ঈশ্বরের দোষ ঘটাবে কিরূপে?
রাখিতে ঈশ্বরের মত, হইয়ে ঈশ্বরের দূত,
এসেছেন ঈশ্বর বিদ্যাসাগর রূপে।'

আসার উদ্দেশ্য?

'আমাদিগকে দিতে নাগর,
এলেন, গুণের সাগর বিদ্যাসাগর
বিধবা পার করতে, তরীর গুণ ধরেছেন গুণনিধি।'

বিধবাবিবাহ আন্দোলনে বিদ্যাসাগর নেতৃত্ব দেবার পর সারা বাংলাদেশের মানুষজন বিষয়টি সম্পর্কে কি পরিমাণ আগ্রহী হয়ে ওঠে, সমকালীন একটি পত্রিকায় প্রকাশিত একটি চিঠি থেকে তার পরিচয় মেলে। পত্রলেখকের মতে, 'by the sudden publication of a Bengalee pamphlet from the pen of Baboo Isser Chunder Bidyasagore....it has become the mouth topic of all men

born under the canopy of the oriental skies, of the old and young, of the learned and the illiterate, of the peasant and the prince, of the rich and the poor, of the Brahmin and the chandal. Even in distant villages where chasas form the majority of the population, you hear nothing but of husbands and wives jointly sharing the favorite topic of the Metropolis widow-marriage.'[৫৮]

বিধবাবিবাহ বিষয়ে বিদ্যাসাগরের বক্তব্য সম্পর্কে বাংলার জনমত মোটামুটিভাবে দু'ভাগে ভাগ হয়ে গেল—মুক্তদৃষ্টিসম্পন্ন মানুষরা বিদ্যাসাগরের বক্তব্যকে সমর্থন জানালেন, অজ্ঞ আর গোঁড়ার দল ভীষণভাবে এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালেন। কোনো যুক্তিতেই কর্ণপাত করলেন না তাঁরা, ব্যাপারটা যে কোনোভাবেই সমর্থন করা উচিত নয়, অন্যদেরও তা বোঝাতে উঠেপড়ে লাগলেন। মেয়েদের মধ্যেও প্রতিক্রিয়া কম হল না। কলকাতার ঘোষ, বোস, মিত্তির, দত্ত, চাটুজ্যে, বাঁড়ুজ্যে প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ঘরের চোদ্দ-পনেরজন বিধবা ও বিবাহিতা মহিলা বিদ্যাসাগরের বই নিয়ে ১৮৫৫-র মে মাসে এক আলোচনা সভায় বসলেন। সভায় সকলেই বিদ্যাসাগরের সঙ্গে একমত হয়ে স্বীকার করলেন যে বিধবাবিবাহ ব্যাপারটা পুরোপুরি শাস্ত্রীয়।[৫৯] একালের একটি প্রভাবশালী দৈনিকের খবর থেকে জানা যায়, সম্ভ্রান্ত হিন্দু মহিলাদের একটা বড় অংশ বিধবাবিবাহ বিধিবদ্ধ হবার অপেক্ষায় অধীরভাবে প্রতীক্ষা করছেন এবং এ-বিষয়ে অগ্রণীর ভূমিকা নেবার জন্য প্রতিদিনই তাঁরা ঈশ্বরচন্দ্রকে আশীর্বাদ করছেন।[৬০]

শুধু কলকাতায় কেন, গ্রামের মেয়েরাও বিদ্যাসাগরের বই-এর কথা শুনতে ও এ-বিষয়ে মতামত প্রকাশে ব্যগ্র হয়ে উঠলেন। মেদিনীপুরের একটি গ্রামের বিধবা মহিলারা 'সংবাদ প্রভাকর'-এ একটি চিঠিতে জানালেন ঃ

'অধুনা শ্রুত হইলাম দেশহিতৈষী গুণরাশি বিপুল যশস্বী অদ্বিতীয় পণ্ডিতবর গুণসাগর শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বহুয়াসে বিবিধ শাস্ত্রান্বেষণ করত পরিশেষে বর্ত্তমান কলিযুগের প্রচলিত শাস্ত্র অর্থাৎ পরাশর সংহিতা হইতে বিধবাবিবাহ হওনের যে শাস্ত্র প্রচার করিয়াছেন, তৎপাঠে বিদিত হইল যে বিধবাদিগের পুনঃপরিণয় কিছু অশাস্ত্রিক নহে। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে আমারদিগের দেশীয় পণ্ডিত মহোদয়েরা শ্রীযুত বিদ্যাসাগরের এই উৎকট পরিশ্রমে বাধিত না হইয়া তাহাতে নানাপ্রকার ফন্দি তুলিতেছেন এবং স্থানে স্থানে দলবদ্ধ হইয়া এই যুক্তিসিদ্ধ শাস্ত্রীয় প্রথা যাহাতে প্রচলিত না হয় তাহারই চেষ্টায় যত্নশীল হইয়াছেন, কিন্তু বিদ্যাসাগরের প্রকাশিত ভগবান পরাশরের বচন অদ্যাবধি কেহই খণ্ডন করিতে পারগ হয়েন নাই।'[৬১]

বিদ্যাসাগরের বই সম্পর্কে মেয়েদের প্রতিক্রিয়ার চমৎকার বিবরণ মেলে সমকালীন একটি পত্রিকা থেকে। এতে জানা যায়, বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ বিষয়ক কয়েকটি বই বিতরণের জন্য একটি ছেলে নিজের গ্রামে নিয়ে যায়। খবর পেয়ে পথের

মধ্যেই গ্রামের একদল মেয়ে (বালিকা থেকে বৃদ্ধা পর্যন্ত) তাকে ঘিরে ধরে বইয়ের কিছু অংশ পড়ে শোনাতে বলে। শোনানোর পর ১৫/১৬ বছরের একটি বিধবা মন্তব্য করেন, ছেলেদের যখন একাধিকবার বিয়ে করার সুযোগ আছে, তখন মেয়েদেরই বা তা থাকবে না কেন ? অন্য একটি মহিলা টিপ্পনি কেটে বলেন, শাস্ত্রের বচন এতদিন চাপা ছিল, এইবার তা আস্তে আস্তে বেরোচ্ছে। আর একজনের মন্তব্য, বিদ্যাসাগরের কৃপায় একাদশীর যন্ত্রণা থেকে যদি রেহাই মেলে, তাহলে তার চেয়ে বড় আশীর্বাদ আর কি হতে পারে। শুধু এক প্রাচীনা (যাঁর পুনর্বিবাহের আর কোনো আশা নেই) গম্ভীর মুখে বলেন, বিদ্যাসাগর যাই লিখুন, ব্যাপারটা প্রচলিত ধর্মের একান্ত বিরোধী।[৬২]

এই বৃদ্ধা বা বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসের সূর্যমুখীর মতো কোনো-কোনো মহিলা হয়তো সেকালে বিশ্বাস করতেন 'যে বিধবার বিবাহের ব্যবস্থা দেয়, সে যদি পণ্ডিত তবে মূর্খ কে ?' আবার এরই পাশাপাশি দেখতে পাই, বিদ্যাসাগরের এই বইটি বেরোনোর পর বিধবারা তাঁদের দুঃখ ঘুচল বলে মনে করছেন। সমকালীন একটি পত্রিকায় প্রকাশিত 'বিধবাদ্বয়ের কথোপকথন'-এ তৎকালীন নারীদের মনোভাব চমৎকার ফুটে উঠেছে—

'কামিনী। বলি দিদি বুঝি ঈশ্বরের ইচ্ছায় কপাল ধল্ল লো।

কিশোরী। সে কিলো। কপাল ধরা আবার কেমন ?

কা। ওগো আমাদের আবার বিয়ে হবে।

কি। না ভাই কেমন করে হবে, পদে পদে শত্রু।

কা। দিদি তুই যানিসনে। শত্রুর মুখে যে চুণ কালি পড়েছে।

কি। না ভাই, আমি তোর কথায় বিশ্বাস যাই না। ও বাড়ির বড়ঠাকুরের মুখে শুনে এলাম, তর্কলঙ্কার বিপক্ষে কি লিখিয়াছেন। তবেইত সব গেল।

কা। রেখে দে তোর তর্কলঙ্কার, অমন কত তর্কলঙ্কার উপর চালাকি খাটিয়াছেন, তাহাতে সবই কল্লেন। সাগর হইতে এক নূতন পুস্তক উঠিয়াছে তার উপরে আর চালাকি চলবে না।

কি। দিদি তবে এত দিনের পর বুঝিলাম, টুলো পণ্ডিতের ভড়ংই সার।

কা। তা বৈ কি দিদি, ওদের কি জ্ঞানগম্য আছে।

বুঝিলাম এতদিনে কপাল ফলিল।
করবো না আর একাদশী এবার ঘুচিল ।।
দিননদিন তনুক্ষিণ, ভেবে দিন রেতে।
সকল ঘুচিল দুখ, ঈশ্বর কৃপাতে ।।'[৬৩]

কোনো-কোনো মহিলা বিধবাবিবাহ প্রবর্তনের জন্য বিদ্যাসাগরকে আশীর্বাদ করে ঈশ্বরের কাছে তাঁর দীর্ঘ পরমায়ু কামনা করে লিখলেন :

'হে জগদীশ্বর। বিদ্যাসাগর মহাশয়কে শত হস্তে লেখনী সঞ্চালনে ক্ষমতাবান

করুন। তিনি যেন সহস্রলোচন হইয়া একেবারে সহস্র গ্রন্থ অবলোকন করিয়া সংযুক্তি ক্রমে সঙ্কলন করিতে পারেন। তিনি দীর্ঘজীবী ও বৃহস্পতিতুল্য বুদ্ধিমান হউন।'[৩৪]

এ-জাতীয় প্রশংসা অথবা নিন্দা কোনোকিছু নিয়েই মাথা ঘামাবার মতো অবস্থা এ-সময় বিদ্যাসাগরের ছিল না। তাঁর সামনে তখনও অনেক কাজ। বাস্তব সমাজ-বোধ থেকে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, বিধবাবিবাহকে কাগজে কলমে শাস্ত্রসম্মত প্রমাণ করা গেলেও, সমাজ ও রাষ্ট্রের সমর্থন ভিন্ন তাকে কার্যকর করা সম্ভব নয়, রাষ্ট্রীয় আইনের জোরেই সতীপ্রথা নিবারণের কথা নিশ্চয়ই তাঁর মনে ছিল। তাই বিধবা-বিবাহ আন্দোলনে একদিকে তিনি শাস্ত্রসন্ধানী, অন্যদিকে বিধবাবিবাহ আইন তৈরির জন্য একটি আবেদনপত্র রচনা করে স্বাক্ষর সংগ্রহ অভিযানে অবতীর্ণ। ৯৮৭ জনের স্বাক্ষর সম্বলিত একটি আবেদনপত্র ৪ অক্টোবর, ১৮৫৫-য় তিনি ভারত সরকারের বিবেচনার জন্য পাঠান। আবেদনপত্রটিতে এই নীতিবিরুদ্ধ নিষ্ঠুর দেশাচারকে অশাস্ত্রীয় ও সামাজিক অকল্যাণের কারণ বলা হয়। আবেদনকারীদের মতে বিধবা-বিবাহ বিবেকবিরুদ্ধও নয়, তাই তাঁরা ব্যবস্থাপক সভার কাছে বিধবাবিবাহের বৈধতা স্বীকার করে এমন একটি আইন প্রণয়ন ও প্রচারের অনুরোধ করেন, যাতে 'হিন্দুদের বিধবাবিবাহের সর্বপ্রকার বাধা দূর হয় এবং বিবাহজাত সন্তানেরা সমাজে বৈধ সন্তান বলিয়া গৃহীত হয়।' আবেদনপত্রের প্রথম সইটি উত্তরপাড়ার জমিদার জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের, শেষটি বিদ্যাসাগরের। অন্যান্য স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে তারানাথ তর্ক-বাচস্পতি, শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন, অযোধ্যানাথ পাকড়াশি, গোবিন্দচন্দ্র সেন, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রামচন্দ্র বসু, রাধামাধব মিত্র, রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ, সূর্যকুমার চট্টোপাধ্যায়, কেদারনাথ দত্ত, রাজীবলোচন শর্মা, রাজনারায়ণ বসু, হরচন্দ্র দত্ত প্রভৃতি ছিলেন। আবেদন পাঠানোর পর বিধবাবিবাহ বিষয়ে আইন প্রণয়নে উৎসুক ব্যক্তিদের বিদ্যা-বুদ্ধিকে কটাক্ষ করে 'নিত্যধর্মানুরঞ্জিকা' লেখে ঃ

আবেদনকারীদের মধ্যে 'কেহ কেহ রাজসংক্রান্ত বিদ্যালয়াদিতে অধ্যক্ষতা করিবার ভার প্রাপ্ত হইয়াছেন; এবং জনসমাজে অদ্বিতীয় পণ্ডিতরূপে বিখ্যাত। কিন্তু তাঁহারদিগের পাণ্ডিত্য এককালিন হিতসমুদ্র উথলিয়া উঠিয়াছে, তাহারদিগের যত পাণ্ডিত্য যত চতুরতা সে সমস্তই এক বিধবাবিবাহেই পর্যবসিত হইতেছে। এবং তাঁহারদিগের করুণাবেগ কেবল এক বিধবার ইন্দ্রিয়বেগের শান্তিতেই লগ্ন হইয়াছে।

'ইহাঁরা বিবিধশাস্ত্রধ্যয়ন করিয়া শাস্ত্রসাগর মন্থনে বিধবাবিবাহ রূপ এক অমূল্য রত্নকে উদ্ধার করিয়াছেন; সেই রত্নকেই আভরণ করিবার নিমিত্ত ইয়ংবেঙ্গল দলে মহাকোলাহল করিতেছেন, যে এ রত্নহার অগ্রে কাহার গলায় দেওয়া যায়, রত্নের যত্নে এককালে অগাধ সাগরে ঝাঁপ দিয়াছেন। পণ্ডিত মহাশয়রা বিধবাবিবাহকেই দেশের হিতবোধে কতইবা বক্তৃতা করেন।

'হাঃ পরমেশ্বর, ইহাঁরা পণ্ডিতাভিমানু কেন করেন চিরকাল পর্যন্ত যে প্রথা দেশে বিদেশে নীচলোকে প্রচলিত আছে, ভদ্রলোকের গৃহে কদাপি প্রচলিত নহে সে

প্রথা উত্তম গৃহে চালিলে আর এদেশের উত্তম লোকের গৌরব কি থাকিবে। অর্থলোলুপ হইয়া চিরকালের নিমিত্ত ধর্মনাশের সোপান বন্ধ করিয়াও যদি ইহাঁরা পণ্ডিত হইতে পারেন তবে নির্বোধ অধার্মিক মূর্খতম শব্দের বাচ্য আর কে হইবে। যেমন অদ্বিতীয় পণ্ডিতাখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেইরূপ স্বদেশের ধর্মরক্ষার্থ যদি অদ্বিতীয় কার্য্য করিতে যত্নবান হইতেন, তবে তাঁহারদিগের দেশহিতৈষিতা গুণের অত্যন্ত ঔজ্জ্বলতা হইত।'[৬৫]

'নিত্যধর্মানুরঞ্জিকা'র কটাক্ষের মূল লক্ষ্য যে বিদ্যাসাগর, লেখাটি পড়লেই তা বোঝা যায়। বিদ্যাসাগরের আবেদনটি সমাজে যথেষ্ট চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করলেও, এটি যে ত্রুটিমুক্ত নয়, তা সেকালে অনেকেই বুঝতে পেরেছিলেন। বিদ্যাসাগর-অনুরাগী একটি পত্রিকা মন্তব্য করে :

'We give every credit to the pundit for having emancipated himself from the fetters of antiquated bigotry which still cleave to the rest of his fraternity, but we must be permitted to observe that his petition is very defective.'[৬৬]

রাধানাথ শিকদার, প্যারীচাঁদ মিত্র প্রভৃতি ইয়ংবেঙ্গলের প্রতিনিধিরাও বিদ্যাসাগরের আবেদনটিকে ত্রুটিপূর্ণ মনে করতেন। সেইজন্য একটি বিশেষ বিবাহবিধি প্রবর্তনের জন্য সরকারের কাছে তাঁরা স্বতন্ত্রভাবে আবেদন করেন।[৬৭]

যাইহোক, বিদ্যাসাগরের আবেদনটি প্রেরিত হবার পর প্রস্তাবিত আইনের সমর্থনে বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে একের পর এক আবেদন আসতে থাকে। ইয়ংবেঙ্গলের পূর্বোক্ত আবেদনটির কথা বাদ দিলে এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল :

(১) কৃষ্ণনগরের অধিবাসীদের আবেদন (১. ১২. ১৮৫৫)
(২) কলকাতা মিশনারি কনফারেন্সের আবেদন (৭. ১২. ১৮৫৫)
(৩) বারাসাতের অধিবাসীদের আবেদন (৭. ১২. ১৮৫৫)
(৪) কলকাতার অধিবাসীদের আবেদন ;
(৫) কৈলাসচন্দ্র দত্ত ও অন্যান্যদের আবেদন (১. ১২. ১৮৫৬)
(৬) শান্তিপুরের ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষালের আবেদন ;
(৭) কৃষ্ণনগরের রাজা, শান্তিপুরের জমিদার ও তালুকদারদের আবেদন ;
(৮) ধুলিয়ানের অধিবাসীদের আবেদন (১২. ২. ১৮৫৬)
(৯) চট্টগ্রামের অধিবাসীদের আবেদন (১৫. ২. ১৮৫৬)
(১০) মুর্শিদাবাদের অধিবাসীদের আর একটি আবেদন (২১. ২. ১৮৫৬)
(১১) রাজনারায়ণ বসু ও মেদিনীপুরের অন্যান্য অধিবাসীদের আবেদন (২৯, ৩. ১৮৫৬)
(১২) মুর্শিদাবাদের অধিবাসীদের আর একটি আবেদন ;
(১৩) হুগলির অধিবাসীদের আবেদন (৮. ৪. ১৮৫৬)

(১৪) বাঁকুড়া ও বর্ধমানের অধিবাসীদের আবেদন (১৫. ৪. ১৮৫৬)
(১৫) বারাসাতের অধিবাসীদের আর একটি আবেদন ;
(১৬) রংপুরের অধিবাসীদের আবেদন ;
(১৭) বোলপুরের অধিবাসীদের আবেদন ;
(১৮) বারাসাতের অধিবাসীদের আর একটি আবেদন (২০. ৬. ১৮৫৬)
(১৯) ঢাকাবাসীদের আবেদন (২৪. ৭. ১৮৫৬)[৬৮]

বাংলাদেশের বাইরে থেকেও প্রস্তাবিত আইনটিকে সমর্থন করে খানছয়েক আবেদন আসে।

বিধবাবিবাহের বিরোধীরাও চুপচাপ বসে রইলেন না। বিদ্যাসাগরের আবেদনটি সরকারের কাছে পেশ করার কিছুদিন পরে ২৫ নভেম্বর, ১৮৫৫-য় রাধাকান্ত দেবের বাড়িতে রক্ষণশীল হিন্দুদের এক বিরাট সমাবেশ হয়। সমাবেশে প্রায় হাজারপাঁচেক লোক উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে ঘন ঘন 'হরিবোল' ধ্বনির মধ্যে বিধবাবিবাহ বিষয়ক আইনের বিরোধিতা করার জন্য 'হিন্দু ধর্মরক্ষাসভা' প্রতিষ্ঠিত হয়। নবগঠিত সভার সভাপতি হলেন রাধাকান্ত দেব, সম্পাদক অবিনাশচন্দ্র গাঙ্গুলি, কোষাধ্যক্ষ কাশীপ্রসাদ ঘোষ। সমাবেশে বিধবাবিবাহ আইন পাশ হতে যাচ্ছে বলে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়। সরকার যাতে এ-ব্যাপারে উদ্যোগী না হন, সেই মর্মে সরকারের কাছে আবেদন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।[৬৯] অল্পদিনের মধ্যেই 'হিন্দু ধর্মরক্ষাসভা'র তৎপরতায় প্রস্তাবিত আইনের বিরোধিতা করে সরকারের কাছে একের পর এক আবেদন পাঠান হতে থাকে। প্রথম প্রতিবাদটি আসে ১৩ ফেব্রুয়ারি, ১৮৫৬-য় নদীয়া, ত্রিবেণী, ভাটপাড়া, বাঁশবেড়িয়া ও কলকাতা অঞ্চলের স্মৃতিশাস্ত্রের অধ্যাপক ও অধিবাসীদের কাছ থেকে—এতে স্বাক্ষরকারীর সংখ্যা প্রায় এক হাজার। এরপর বিধবাবিবাহের বিপক্ষে যেসব আবেদন আসে, সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল :

(১) রংপুরের অধিবাসীদের আবেদন ;
(২) হিন্দু ধর্মরক্ষাসভার সভাপতি রাধাকান্ত দেব ও অন্যান্যদের আবেদন ;
(৩) বাংলার অধিবাসীদের আবেদন ;
(৪) মুর্শিদাবাদের অধিবাসীদের আবেদন ;
(৫) ময়মনসিংহের অধিবাসীদের আবেদন ;
(৬) কলকাতা ও সন্নিহিত অঞ্চলে বসবাসকারী পশ্চিমা অধিবাসীদের আবেদন ;
(৭) বাংলার অধিবাসীদের আবেদন ;
(৮) চট্টগ্রামের অধিবাসীদের আবেদন ;
(৯) ঢাকাবাসীদের দু'টি আবেদন ;
(১০) পাবনার অধিবাসীদের আবেদন ;
(১১) বাংলার অধিবাসীদের আর একটি আবেদন ;
(১২) কলকাতা ও নিম্নবঙ্গের অধিবাসীদের আবেদন।[৭০]

এগুলি ছাড়াও ত্রিপুরা, পুনা, ধারওয়ার, সাতারা, উড়িষ্যা, বোম্বাই, আমেদাবাদ, সুরাট প্রভৃতি অঞ্চল থেকে প্রস্তাবিত আইনের বিরোধিতা করে কমপক্ষে বারোটি আবেদন আসে।

আবেদনপত্রগুলির দিকে তাকালে বোঝা যাবে, বাংলাদেশ থেকেই বিধবাবিবাহের সমর্থনে বেশি আবেদন এসেছিল। বিদ্যাসাগরের আবেদনটি ছাড়া বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এই আইনের পক্ষে কমকরে কুড়িটি ও বিপক্ষে চোদ্দটি আবেদন পেশ করা হয়েছিল। পক্ষান্তরে বাংলার বাইরের আবেদনগুলির অধিকাংশই (ছটি ছাড়া) এই আইনের বিরোধিতা করে। বাংলাদেশের অধিবাসীদের বিধবাবিবাহের প্রতি সমর্থনের পেছনে বিদ্যাসাগরের প্রভাবই প্রধান কারণ। বিদ্যাসাগরের বিধবা-বিবাহ সংক্রান্ত পুস্তক প্রকাশিত হলে অনেকেই তা পড়ে এর শাস্ত্রীয়তা সম্পর্কে অবহিত হন এবং এটি বিধিবদ্ধ করার জন্য আবেদন করেন। যেমন ৭ ডিসেম্বর, ১৮৫৫-য় বারাসাতের অধিবাসীরা যে আবেদন করেন তাতে তাঁরা বলেন, 'ধর্মশাস্ত্রজ্ঞ ও দেশহিতৈষী বিদ্যাসাগর মহাশয়ের' পুস্তক পাঠ করে তাঁরা জেনেছেন যে বিধবাবিবাহ অশাস্ত্রীয় নয়—সেইজন্য তাঁরা এ-বিষয়ক আইন প্রণয়ন করতে সরকারের কাছে আবেদন করছেন।

আবেদন-নিবেদনের পালা সাঙ্গ হলে দেখা গেল, বিধবাবিবাহ আইনের প্রতিকূলে স্বাক্ষরকারীর সংখ্যা (৫৫,৭৪৬) এই আইনের সমর্থকদের সংখ্যাকে (৫,১৯২) বহুগুণে অতিক্রম করে গেছে। সরকার কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতকে গুরুত্ব না দিয়ে বিধবাবিবাহ আইনের পক্ষপাতীদের মতই গ্রহণ করলেন। রক্ষণশীলরা বলতে লাগলেন, হিন্দুদের ধর্মনাশ করার জন্যই রাজপুরুষেরা এই আইন পাশ করেছেন।[৭১] আইন পাশ হবার পর পানিহাটির এক বিধবা মহিলা এই কাজের জন্য গ্রান্ট, ভাস্কর-সম্পাদক গৌরীশঙ্কর ও মানবদরদী বিদ্যাসাগরকে অভিনন্দন জানান।[৭২]

জানালে কি হবে, আইন পাশ হবার মাসখানেকের মধ্যে বিদ্যাসাগর অসুস্থ হয়ে পড়লেন। সুস্থ হবার জন্য তিনি স্থানান্তরে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করলে সেকালের একটি পত্রিকা বলে, বিদ্যাসাগরের এখন কলকাতা ছেড়ে যাওয়া ঠিক হবে না। দুর্গাপুজা আসন্ন 'বিদ্যাসাগর দুর্গোৎসব করেন না, বিধবা বিবাহোৎসবই তাঁহার মহোৎসব···বিদ্যাসাগর ভট্টাচার্য্য মহাশয় চিন্তাজ্বরে জ্বরীভুত হইয়াছেন, দুশ্চিন্তা পরিত্যাগপূর্বক অস্ত্রশস্ত্র পরিহীন সমরকাতর কর্ণের ন্যায় গর্জন করিয়া গাত্রোত্থান করুন।'[৭৩]

গাত্রোত্থান করার পরও কয়েকমাস কেটে গেল, কিন্তু একটিও বিধবার বিয়ে হল না। সবকিছু দেখে শুনে এই আইনের পক্ষপাতীরাও বিধবার বিবাহ সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে পড়েন। এই মনোভাবের চমৎকার প্রতিফলন মেলে সমকালীন একটি পত্রিকায় প্রকাশিত মোহিনী ও কামিনী নামক দুই নারীর কথোপকথনে—

'মোহিনী। বিদ্যাসাগর ভট্টাচার্য্যের কল্যাণে রাঁড়ের বিয়ার আইন হইয়াছে,

আবার হিন্দুদিগের বহুবিবাহ নিবারণ হওন প্রার্থনায় এদেশের সমস্ত হিন্দুরা আইনের সভায় আবেদন করিয়াছেন, এ আইনও শীঘ্র জারী হইবে, তবে আর ভয় কি ? তোকে আর বৈধব্যযাতনা ভুগিতে হইবে না, মনোমত দিব্যবর পাইবি, সতীনও হইবে না।

কামিনী। আ, তোর মুখে আগুন, আমার জন্যই কি বিধবাবিবাহ আইন প্রচলন হইয়াছে, আর সে পোড়া আইন হইয়াই বা কি সুখ হইল, আগে শুনা গিয়াছিল, কত ২ রম্ডা ও ষম্ডারা প্রস্তুত হইয়া আছে, আইনজারী হইলেই বিবাহ চলিবেক। দুই তিন মাস গত হইল আইনজারী হইয়া গিয়াছে এখন আর কেহ বিবাহের নাম মুখেও আনে না, যে দেশহিতৈষী গুণরাশীরা উদ্যোগী হইয়া বিধি প্রচার করাইলেন তাঁহারা এখন কুর্মবৎ অঙ্গ শঙ্কোচ করিয়াছেন, তাঁহারা যদি আপনাপন ঘরের বিধবাবিবাহ দিয়া দৃষ্টান্ত দেখান তবে তদনুযায়ী অনেক লোক তৎকর্মে প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে অচিরেই এ হতভাগিনীদিগের দুর্দশা খণ্ডন হইয়া যায়, প্রধান মহাশয়েরা কেবল অন্য লোককে প্ররোচনা দিতে পারেন, আপনারা জাতিভয়ে মাথা হেট করিয়া আছেন, অতএব বন, এ পাপ দেশের বিধবাদিগের সে সুদিন কদাপি হইবে না।'[৭৪]

বিধবাবিবাহ প্রবর্তনে উৎসাহী যুবকদের কার্যকলাপকে কটাক্ষ করে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত লিখলেন 'মুখে বলা বলা নয়, কাজে করা করা।' অবশেষে সেই কাজ করতে এগিয়ে এলেন শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন। ১৮৫৬-র ৭ ডিসেম্বর বিদ্যাসাগরের বন্ধু রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুকিয়া স্ট্রিটের বাড়িতে শ্রীশচন্দ্রের সঙ্গে কালীমতী দেবীর প্রথম আইনসম্মত বিধবাবিবাহ হল। এই বিবাহ অনুষ্ঠানের বর্ণনা দিতে গিয়ে ৯. ১২. ১৮৫৬-য় 'মর্নিং ক্রনিকল' লেখে :

'We cannot refrain even in its brief and imperfect account of such an important affair from alluding in terms of the highest eulogium to the perseverance, earnestness, moral courage and indefatigable energy displayed by Pundit Essur Chander Bidyasagur through out all the stages of the progress of the movement till his exertions were happily crowned with success on Sunday night.'[৭৫]

এই অনুষ্ঠানের বিশদ বিবরণ দিয়ে ঐ একই দিনে 'সম্বাদ ভাস্কর' লিখল, 'এই ক্ষণে শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে...যথাযোগ্য নমস্কার ও আশীর্বাদ করি। তাঁহারদিগের সচ্চেষ্টায় হিন্দুবিধবাদিগের বৈধব্য কষ্ট নিবারণের এই সুপথ প্রস্তুত হইল...পরমেশ্বর তাঁহাকে চিরজীবী করুন।'

কয়েকদিন পরে এক ব্যক্তি 'সম্বাদ ভাস্কর'-এ বিদ্যাসাগরের ঔদার্য ও মহত্ত্বের প্রশংসা করে লিখলেন, 'বিদ্যাসাগর মহাশয় সামান্য মনুষ্য নহেন। জগদীশ্বরের নিতান্ত অনুগৃহীত পাত্র অথবা কৃপানিধান পরমেশ্বর এতদ্দেশীয় বিধবাদিগের

অসহ্য যন্ত্রণা দর্শনে স্বয়ং ঈশ্বর রূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন বলিলেও বলা যাইতে পারে।'[৭৬]

এই কালেই এক মহিলা 'মর্নিং ক্রনিকল'-এ চিঠি লিখে হিন্দুদের মধ্যে বিধবাবিবাহ প্রবর্তনের গৌরব শুধু বিদ্যাসাগরেরই প্রাপ্য, তা মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করলেন।[৭৭]

শ্রীশচন্দ্র বিধবাবিবাহ করার পরের দিন পানিহাটির মধুসূদন ঘোষ বিধবাবিবাহ করলেন। এই দুটি বিধবাবিবাহের সংবাদ দান প্রসঙ্গে বিদ্যাসাগরের প্রচেষ্টার প্রতি সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' লিখল ঃ

'এই মহৎ ব্যাপার যে কএক ব্যক্তি অসামান্য ধী-সম্পন্ন প্রসন্নমতি মহাত্মাদিগের সমবেত চেষ্টা দ্বারা সম্পন্ন হইয়াছে তাহাতে আর সন্দেহ নাই, কিন্তু তন্মধ্যে মহামান্য ও সর্বাগ্রগণ্য শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের গুণ আমরা জীবনসত্ত্বেও ভুলিতে পারিব না। তাঁহার অদ্বিতীয় নাম এই অসাধারণ কীর্ত্তির সহিত মহীতলে চিরকাল জীবিত থাকিবে। এই মহৎ ব্যাপার সম্পন্ন করিবার জন্য তিনি যে পর্যন্ত পরিশ্রম ও যে পর্যন্ত যত্ন স্বীকার করিয়াছেন, তাহা আমরা শত বর্ষেও বর্ণন করিয়া শেষ করিতে পারিব না, তাঁহার অসাধারণ অধ্যবসায়, অদ্বিতীয় তিতিক্ষা ও তুলনারহিত ধীশক্তিই এই মহৎ ব্যাপার সম্পন্ন হইবার অতি প্রধান কারণ। তিনিই অসাধারণ বুদ্ধিবলে হিন্দুদিগের সমস্ত ধর্মশাস্ত্র সমন্বয় করিয়া তাহার শেষ সিদ্ধান্ত স্থির করিলেন এবং বিধবাবিবাহ যে হিন্দুধর্ম বিরুদ্ধ নহে, তিনি স্বীয় বিচারকৌশলে তাহা সকল লোককে শিক্ষা প্রদান করিলেন, তাঁহারই প্রভাবে হিন্দুশাস্ত্রের এ কলঙ্ক দূর হইল এবং তাঁহারই প্রসাদাৎ হিন্দু বিধবারা অসহ্য যন্ত্রণা হইতে পরিত্রাণ পাইল। তিনি এই শুভ সঙ্কল্প সিদ্ধ করণার্থে নিন্দাকে নিন্দাবোধ করেন নাই, অপমানকে অপমান জ্ঞান করেন নাই এবং কটু কাটব্য এবং উপহাস্যাদির প্রতি ভ্রূক্ষেপও করেন নাই। তিনি যখন বিধবাবিবাহ বিষয়ক প্রথম পুস্তক প্রচার করেন, তখন প্রতিবাদিগণ তদুত্তরে তাঁহাকে কটু কহিতেও অপেক্ষা রাখে নাই, নিন্দা করিতেও ত্রুটি করে নাই এবং নানা শত্রু নানামতে বৈরতা সাধন করিতেও ক্ষান্ত হয় নাই, কিন্তু তাঁহার ভূধরসম নিশ্চল-স্বভাব কিছুতেই বিচলিত হয় নাই। বজ্র যেমন পর্বত উপর পতিত হইয়া আপনিই তেজোহীন হয় শত্রুগণের নিন্দাবাদ ও কটুবাক্য সকলও সেইরূপ তাহার উপর পতিত হইয়া আপনা হইতেই নিস্তেজ হইয়াছে। তিনি যদি জ্ঞানহীন অবোধলোকের বৈর ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া এই শুভানুষ্ঠান সিদ্ধ করিতে কোনরূপে ক্ষান্ত থাকিতেন, তাহা হইলে ভারতবর্ষীয় বিধবাদিগের প্রজ্বলিত বৈধব্য যন্ত্রণানল নির্বাণ হইবার আর কোন উপায় হইত না এবং দুর্ভাগ্য ভারতবর্ষ ভ্রূণ হত্যা ও ব্যভিচারাদি পাপভার হইতে কস্মিনকালেও পরিত্রাণ পাইত না, অন্যথা বিধবাদিগের হৃদয়স্থিত শোকাগ্নি নিঃসৃত নিশ্বাসানলে ভারতবর্ষ চিরদিনই দগ্ধ হইত।'[৭৮]

বিধবাবিবাহ চালু হবার পর শুধু প্রশংসাবাণীই বিদ্যাসাগরের ওপর বর্ষিত হয়নি, গালিগালাজ ঠাট্টা-বিদ্রূপও প্রচুর পরিমাণে তাঁকে সহ্য করতে হয়েছিল।

প্রাচীনরা তাঁকে 'পাষণ্ড, কুলাঙ্গার, দেশের শত্রু, ধর্মের উচ্ছেদকর্তা' বলে কটূক্তি করতে লাগলেন। দ্বারে দ্বারে বিজ্ঞাপন প্রচারিত হল, যে বিদ্যাসাগরের সঙ্গে আহার করবে, তাকে অবিলম্বে সমাজচ্যুত করা হবে। 'নব্যভারত'-এ প্রকাশিত যোগেন্দ্রনাথ শর্মার এই বক্তব্যের সমর্থন মেলে বিদ্যাসাগরের মৃত্যুর পর 'ইংলিশম্যান'-এ প্রকাশিত একটি লেখায়। সেখানে বলা হয়েছে, বিধবাবিবাহ চালু হবার পর তাঁকে একরকম জাতিচ্যুত করা হয়—'Hindu priests issued a proclamation to the effect that anyone eating and drinking with him, or accepting his views, would at once be ex-communicated from the Hindu samaj !'[৭৯] এমনকি তাঁর ব্যক্তিগত চরিত্রেও কলঙ্ক লেপন করতে প্রতিবাদীরা পেছপা হল না। বিদ্যাসাগর নিজেই বলেছেন, 'সৎ কাজ করিবার সময় লোকের নিন্দাকে, লোকের কথাকে ভুলিতে না পারিলে এ পথে যাওয়া ঘোরতর অন্যায়। আমাকে লোকেরা এতদূর নীচ কথা পর্যন্ত বলিয়া সময়ে সময়ে গালি দিয়াছে যে, আমি চরিত্রহীন বলিয়া অল্পবয়স্কা বিধবাদিগকে বাড়িতে আশ্রয় দেই।'[৮০]

কেন তিনি বিধবার বিয়ে দিতে এতখানি আগ্রহী হয়ে উঠলেন, তা নিয়েও সেকালে মতভেদ ছিল। অনেকেই বিশ্বাস করতেন, বিধবাদের দুঃখ দূর করার জন্যই এই কাজে তিনি হাত দেন। কেশবচন্দ্র সেন 'সুলভ সমাচার'-এ লেখেন :

'আমাদের দেশে এখন অনেকে ভালরূপে লেখাপড়া শিখিয়াছেন, সাহেবী ধরনেও অনেকে চলিতেছেন, অনেকেই মুখে লম্বা লম্বা কথাও বলিয়া থাকেন, কিন্তু স্ত্রীলোকদিগের দুঃখ দেখিয়া কয়জনের প্রাণ কাঁদিয়া ওঠে। একমাত্র বিদ্যাসাগর মহাশয়কেই স্ত্রীলোকদিগের দুঃখের নিমিত্ত কাতর দেখিতে পাওয়া যায়। তিনিই তো অনাথা চিরদুঃখিনী বিধবাদের দুঃখ নিবারণের নিমিত্ত কায়মনপ্রাণে চেষ্টা করিয়াছেন।'[৮১]

বিধবার দুঃখে কাতর হয়েই যে বিদ্যাসাগর এ-বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেছিলেন, এইকালে 'হালিসহর পত্রিকা'য় প্রকাশিত একটি কবিতায় তা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয় :

'বিধবার প্রিয়বন্ধু, যশোসিন্ধু বর।
ধন্য, ধন্য, ধন্য, তুমি বিদ্যার সাগর॥
অনিবার বিধবার হাহাকার শুনে।
দাহন হইয়াছিলে হুতাস আগুনে॥
বিধবাবিবাহ দেশে, করিতে প্রচার।
শাস্ত্র যুক্তি অনুসারে, করেছ বিচার॥
তাহা লয়ে কত লোক, কত গালি দিলে।
অটল গিরির সম, সহ্য করেছিলে॥
আশাতীত ফল পেতে, মনে ছিল সাধ।
দেশের মূঢ়েরা তাহে, সাধিয়াছে বাদ॥'[৮২]

বিদ্যাসাগরের বিরুদ্ধবাদীরা কিন্তু এভাবে ব্যাপারটাকে দেখতে রাজি হলেন না। রাজকৃষ্ণ কবিরাজ নামে এক ব্যক্তি অভিযোগ করলেন, রাজগোষ্ঠীর প্রিয়পাত্রতা ও রাজদ্বারে খ্যাতিলাভের জন্যই বিদ্যাসাগর বিধবাবিবাহের বৈধতা প্রমাণে সচেষ্ট। রাজকৃষ্ণের বক্তব্য তাঁর নিজের ভাষাতেই শোনা যাক :

'আমাদের নবনাগরেরাও যে মুখে দেশ মাঙ্গলিক ২ বলিয়া এক ভান করিয়া থাকেন তাহারাও কেবল রাজগোষ্ঠীর প্রিয়পাত্রতা এবং রাজদ্বারে খ্যাতিলাভ মাত্রই মুখ্য উদ্দেশ্য আর ২ আনুসঙ্গিক বাসনা যাহা তাহাও থাকুক, আমারদের এই অনুমান তাঁহারদের গুরুজী সাগরের উদাহরণেই দৃঢ়ীকৃত হইতেছে। কেননা তিনি নিতান্ত অশাস্ত্রজ্ঞ ও অপণ্ডিত নহেন তথাপি যে জানিয়া শুনিয়া অবৈধ বিধবাবিবাহের বৈধত্ব স্থাপনে যত্নবান হইয়াছেন তাহার আর কোন অভিপ্রায়ই উপলব্ধি হয় না।'[৮৩]

পার্থিব লাভের জন্যই বিদ্যাসাগর এই কাজে প্রবৃত্ত হয়েছেন, এমন কথাও সেযুগে শোনা গিয়েছিল—'এতদ্দেশজাত স্ত্রীলোকদিগের সনাতন ধর্মনাশের নিমিত্ত কয়েকজনা দাম্ভিক ইংরাজ কালেজীয় কর্মাধ্যক্ষ বিদ্যাসাগরের প্রতি বেতন বৃদ্ধির লোভ প্রদর্শন করাইয়া এরূপ কহিয়া থাকিবেন অনুভব হয় যে 'বিদ্যাসাগর তুমি দুই একটা শাস্ত্রীয় প্রমাণ ধৃত করিয়া চাকচক্য দ্বারা অর্থকৌশলে একখানি পুস্তক এমত অনুবন্ধে প্রকাশ করিবে যে তাহাতে বিধবা গর্ভজাত পুত্রেরা লাক্ষণিক ঔরসপুত্রের ন্যায় পিতৃ-পিতামহাদি ধনের সত্বাধিকারী হইতে পারিবে। ইহাতে অসিদ্ধ করিবার নিমিত্ত সমস্ত হিন্দুজাতীয়েরা যদিও শাস্ত্রবিচার করিয়া অপ্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা পায় তথাপি আমরা আইন দ্বারা বৈধরূপে প্রতিপন্ন করাইব। কোনমতে হিন্দুদিগের কোন কথাকেই প্রধান রাজপুরুষকে শুনিতে দিব না। ইহা সিদ্ধ হইলে পণ্ডিতরূপে তোমার নির্মল যশ সমস্ত দেশময় প্রতিভাত হইবেক।

'এরূপ একবাক্যতায় রাজপুরুষেরা মন্ত্রণা করিয়া বিদ্যাসাগরকে নিমিত্তমাত্র করিয়া কৌশলে হিন্দুধর্মনাশের উপায় সর্জন করতঃ পরিণামে আইনরূপ মহাবল প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিতেছেন।'[৮৪]

বিদ্যাসাগরের বিরুদ্ধে এই ধরনের রটনা যে নিতান্তই অপপ্রচার, তা সেকালের গোঁড়া বিধবাবিবাহ-বিরোধীদের উক্তি থেকেই বোঝা যায়। ১২৯২ সালের ২৮ বৈশাখ সাবিত্রী লাইব্রেরিতে অক্ষয়চন্দ্র সরকার 'হিন্দু বিধবার আবার বিবাহ হওয়া উচিত কিনা?' এ বিষয়ে এক দীর্ঘ প্রবন্ধ পাঠ করে বলেন, 'হিন্দু বিধবার পক্ষে একমাত্র ব্রহ্মচর্যই অবলম্বনীয়।' বিধবার দুঃখে কাতর হয়েই বিদ্যাসাগর যে এ কাজে হাত দিয়েছিলেন তার উল্লেখ করে তিনি বলেন :

'পরদুঃখকাতর বিদ্যাসাগর মহাশয় যথার্থ পরদুঃখ কাতরতায় বাধ্য হইয়াই বিধবাবিবাহ শাস্ত্রসম্মত কার্য্য কিনা, তদ্বিষয়ে প্রবৃত্ত হয়েন। তিনি শাস্ত্রীয় প্রমাণ দ্বারা স্বীয় মত যথেষ্ট প্রমাণিত ও প্রচারিত করিয়াছেন; বিধবাবিবাহ যে কলিকালের জন্য শাস্ত্রসম্মত, তদ্বিষয় তিনি যথাসাধ্য দেখাইয়াছেন।'[৮৫]

কে কি বলছেন, তাতে কান না দিয়ে বিদ্যাসাগর নিজের কাজ করে চললেন। সত্য বলে যাকে বুঝেছিলেন, তা পালন করার জন্য সবকিছুকে উপেক্ষা করার মতো মনোবল তাঁর ছিল। কিন্তু লোকনিন্দা, অপবাদকে তিনি অগ্রাহ্য করতে পারলেও, তাঁর অনুগামীদের অনেকে তা পারলেন না। সামাজিক চাপের মুখে তাঁরা ভেঙে পড়লেন। বিধবাবিবাহ চালু হবার পর বিধবাবিবাহকারী ও তার সমর্থকদের নানারকম সামাজিক নির্যাতনের মুখোমুখি হতে হল। উপায়ান্তর না দেখে কেউ কেউ প্রায়শ্চিত্ত করতে বাধ্য হলেন।[৮৬] বিধবাবিবাহকারী ও এ-ব্যাপারে উৎসাহদাতাদের একঘরে করা হচ্ছে দেখে 'হিন্দু পেট্রিয়ট' শিক্ষিতদের এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে ও একতাবদ্ধ হতে আহ্বান জানাল।[৮৭]

এ আহ্বানে কাজের কাজ কতখানি হয়েছিল বলা মুশকিল। বিদ্যাসাগরের আহ্বানে সাড়া দিয়ে যাঁরা বিধবাবিবাহ করেছিলেন, তাঁদের অসহায় অবস্থার কিছুটা আভাস মেলে 'সংবাদ প্রভাকর'-এ প্রকাশিত একটি কবিতায়—

'জাতি, কুল, ভাসাইয়ে, সাগরের জলে।
যারা গিয়ে ঢুকিতেছে, নূতন এ দলে।
এ কূল, ও কূল, গিয়ে, এই হয়, সার।
অকূল সাগরে পোড়ে, না পায় পাথার।
যে সাগরে কূল নাই, তরি নাই, তরি।
বাপ্ বাপ্, সে সাগরে, দণ্ডবৎ করি।'[৮৮]

সামাজিক এই প্রতিরোধের সামনে পড়ে বিধবাবিবাহের সংখ্যা ক্রমেই হ্রাস পেতে থাকে। সুবিধাবাদীর দল প্রচার করতে আরম্ভ করে যে বিধবাবিবাহের আইন রদ হয়ে গেছে, আর বিধবার বিয়ে হবে না।[৮৯] কারো কারো ধারণা জন্মাল, কলকাতায় বিধবাবিবাহ সম্ভব হলেও, পল্লীগ্রামে হওয়া মুশকিল। তাদের ধারণা যে একেবারেই ঠিক নয়, সেকথা জানিয়ে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' লিখল ঃ

'বিংশতি মাস অতীত হইল, কলিকাতা নগরীতে বিধবাবিবাহের প্রথম সূত্রপাত হয়। তৎপরে ক্রমে ক্রমে পাঁচটী বিধবার বিবাহ হইয়াছিল। এই পাঁচটী বিবাহ হইতে প্রায় এক বৎসরের অধিক কাল লাগে। পরে গত ১২ আষাঢ় রামজীবনপুরে বিধবাবিবাহের শুভ আরম্ভ হইয়া ১৩ শ্রাবণ পর্য্যন্ত সাতটি বিধবার বিবাহ হইয়া গিয়াছে। এই স্বল্পকাল মধ্যে পল্লীগ্রামে সাতটি বিধবার বিবাহ হওয়া অত্যন্ত আশ্চর্য্য ও অত্যন্ত আহ্লাদের বিষয় বলিতে হইবেক।'[৯০]

বছরচারেক পরে জাহানাবাদের কাছে হাজিপুর গ্রামে অনুষ্ঠিত একটি বিধবা-বিবাহের সংবাদ দিতে গিয়ে 'সোমপ্রকাশ' মন্তব্য করে ঃ

'বিধবাবিবাহ নির্বাণ হইয়াছে, উৎপাত গিয়াছে, মনে করিয়া যাঁহারা উল্লসিত হইয়াছিলেন, অদ্যতনীয় সম্বাদ, তাঁহাদিগের বিষাদকর, আর যাঁহারা ভগ্নোৎসাহ হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগের উল্লাসকর হইবে সন্দেহ নাই। পল্লীগ্রামে যখন কয়েকটি

বিবাহ সমারোহে সম্পন্ন হইল, তখন যে ইহার দিনদিন শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে, তদ্বিষয়ে আর আমাদিগের সংশয় রহিতেছে না। বিদ্যাসাগর যদি কিঞ্চিদ্দীর্ঘজীবী হন, তিনি অনেকস্থলেই বিধবাবিবাহকে পিতামাতার ও বধূবরের ইচ্ছা প্রবর্তিত ও প্রাথমিক বিবাহের ন্যায় সমারোহ সম্পাদিত দেখিয়া চরিতার্থ হইবেন সন্দেহ নাই।'[৯১]

'সোমপ্রকাশ'-এর এই ভবিষ্যদ্বাণী যে সফল হয়নি, মাসছয়েক পরে পত্রিকাটিতে প্রকাশিত একটি খবর থেকে তা বোঝা যায়। মেদিনীপুর জেলা হতে প্রাপ্ত ঐ সংবাদে বলা হয়:

'অদ্য দুই বৎসর হইল এখানে যে একটি দেশহিতকর কার্য (বিধবাবিবাহ) হইয়াছিল, তাহার প্রায় ধ্বংস হইবার উপক্রম হইয়াছে। প্রথমত শ্রীযুক্ত বাবু কেদারনাথ দাস ইহার প্রধান উদ্যোগী হইয়াছিলেন, কিন্তু তাহার পর আপনি প্রায়শ্চিত্ত করিয়া শুদ্ধ হইয়া কন্যা ও বর উভয় ঘরের প্রতিও অতিশয় বিদ্বেষভাব প্রকাশ করিতেছেন, তাহাতেই বোধ হয় অতিশীঘ্রই ইহার সমূলোচ্ছেদ হইবে। ইহাকেই বলে কৃতবিদ্যের কর্ম।'[৯২]

শুধু কেদারনাথ কেন, বিধবাবিবাহের পক্ষপাতীদের অনেকেই ধীরে-ধীরে নিজেদের মত পালটে ফেললেন। প্রাচীনপন্থীর দল তো বিদ্যাসাগরের বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত হয়েই ছিলেন, এখন তাঁদের সঙ্গে যোগ দিতে এগিয়ে এলেন নব্য সম্প্রদায়ের কেউ-কেউ। 'ইন্ডিয়ান মিরর'-এর সম্পাদক বিদ্যাসাগরের কার্যকলাপের তীব্র সমালোচনা করলেন। যাঁরা অর্থসাহায্য করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তাঁদের কেউ কোনো অজুহাত দেখিয়ে, কেউ বা কিছুই না বলে হাত গুটিয়ে নিলেন। ফলে বিধবাবিবাহ সংক্রান্ত সমস্ত দায়দায়িত্ব এসে পড়ল বিদ্যাসাগরের কাঁধে। বিদ্যাসাগর তবু দমলেন না, ধার করেও বিধবাবিবাহের খরচ যোগাতে লাগলেন। ১৮৬৭ পর্যন্ত এভাবে প্রায় ষাটটি বিবাহ হল, বিদ্যাসাগরের ঋণের বোঝা ক্রমেই ভারি হয়ে উঠতে লাগল। এ অবস্থা কেমন করে একা সামলাবেন বিদ্যাসাগর। শুভাকাঙ্ক্ষীর দল কিছু করতে তৎপর হয়ে উঠলেন। এগিয়ে এলেন প্যারীচরণ সরকার। বিধবাবিবাহ আন্দোলনকে সাফল্যের পথে নিয়ে যাবার জন্য বিদ্যাসাগর কি করেছেন, তার বিবরণ দিতে গিয়ে তিনি বললেন:

মাসের পর মাস, বছরের পর বছর তিনি আমাদের দেশের বিধবাদের অসহনীয় অবস্থার প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, তাদের দুর্গতিমোচনের সেরা পথের সন্ধান করেছেন। শাস্ত্রীয় অনুশাসন না মেলা পর্যন্ত একে কার্যকর করার মত মানসিক বল দেশবাসীর নেই—একথা বুঝতে পারার সঙ্গে সঙ্গে মাসের পর মাস ধরে প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্র ঘেঁটে আমানুষিক পরিশ্রম করে উদ্ধার করেছেন এর অনুকূলে শাস্ত্রীয় বচন। অজ্ঞ, গোঁড়া এবং সুযোগসন্ধানী পণ্ডিতের দল ঐ বচনের ভিন্ন ব্যাখ্যা করলেন। বিদ্যাসাগর তখন অপ্রতিরোধ্য যুক্তির সাহায্যে সুস্পষ্ট ভাষায় বিরুদ্ধবাদীদের অপব্যাখ্যাকে খণ্ডন করে সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করেন। এসব করার পর তিনি

দেখলেন, রাষ্ট্রীয় সমর্থন ছাড়া আদালতে বা সমাজে বিধবার অধিকার প্রতিষ্ঠা করা যাবে না। বিচলিত না হয়ে তিনি সমস্ত প্রভাবশালী ইউরোপীয় বন্ধুদের সঙ্গে কথা বললেন, শহর এবং মফস্বলের প্রতি প্রান্তে গিয়ে জনে-জনে বোঝালেন, কেন এই ব্যাপারে সরকারি হস্তক্ষেপ বাঞ্ছনীয়। আবারও মাসের পর মাস ধরে সারা দিন রাত প্রতিটি শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের সঙ্গে এ নিয়ে আলোচনা করলেন এবং প্রতিটি সচেতন ব্যক্তিকে বিষয়টি নিয়ে চিন্তা করতে অনুরোধ জানালেন। এ কাজ করতে তিনি ক্লান্তিবোধ করেননি বা কখনও শরীর-মনের বিশ্রামের কথা ভাবেননি। হাজার হাজার বিভ্রান্ত দেশবাসীর বাধাদান ও জনসমাজে সমাদৃত প্রভাবশালী কিছু ব্যক্তির বিরোধিতাকে উপেক্ষা করে তিনি প্রমাণ করলেন, আমাদের সদাশয় সরকার বহুসংখ্যক গোঁড়া মানুষের আপত্তি উপেক্ষা করে স্বল্পসংখ্যক সুবুদ্ধিচালিত মানুষের পরামর্শ গ্রহণে ইচ্ছুক। আইন পাশ হল, শত্রুপক্ষ বলল, আইন হলে হবে কি, বিধবার বিয়ে জীবনে হবে না। আবার তিনি মনপ্রাণ দিয়ে উদারমনাদের বোঝাতে লাগলেন, এ সুযোগ ছাড়া ঠিক হবে না। সবাই ভয় পেল, ইতস্তত করতে লাগল, কিন্তু কুসংস্কারের শৃঙ্খল ভাঙতে কেউ এগিয়ে এল না। হতাশা বিদ্যাসাগরের হৃদয়মনকে গ্রাস করল, কিন্তু ভেঙে তিনি পড়লেন না। মানবিক একটি আন্দোলনকে ত্যাগ না করে আশায় ভর দিয়ে আবার তিনি নতুন উদ্যমে কাজ শুরু করলেন। অবশেষে একটি সহৃদয় প্রাণ তাঁর আহ্বানে সাড়া দিল। একটি বিধবা মেয়ে দুর্বিষহ ব্রহ্মচর্যের হাত থেকে মুক্তি পেল। সমাজ উন্নয়নের এই গৌরবোজ্জ্বল কাজটি উৎসাহের সঙ্গে সম্পন্ন হল।[৯৩] এরপর একের পর এক বিধবার বিয়ে হতে লাগল—আজ এ গাঁয়ে, কাল ও গাঁয়ে, এইভাবে সংখ্যাটা গিয়ে পৌঁছল ষাটে। প্রায় সবকটি বিয়ের সঙ্গেই বিদ্যাসাগর কোনো-না-কোনোভাবে জড়িত। বিবাহের খরচপত্র বহন করার জন্য একসময় কয়েকজনকে নিয়ে একটি ফান্ড গঠিত হয়েছিল, এতে অনেকে মুক্তহস্তে সাহায্য করেছিলেন, সাহায্যের প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিলেন অনেকে। কিন্তু কিছুদিন যেতে না যেতে অনেকের উৎসাহ গেল উড়ে, সাহায্যের পরিমাণও কমতে লাগল। সব বোঝা ধীরে ধীরে চাপতে লাগল বিদ্যাসাগরের ওপর। ষাটটি বিধবাবিবাহে বিরাশি হাজার টাকার মতো খরচ হয়েছিল, এরমধ্যে সাতচল্লিশ হাজার টাকারও কম অন্যদের কাছ থেকে পাওয়া গিয়েছিল—বাকিটা বিদ্যাসাগরকেই জোগাড় করতে হয়েছে। কিন্তু কিভাবে? উত্তরটা পাওয়া যায় সমকালীন একটি পত্রিকাতে—

'He has not only expended every available pice from his income, together with the hard savings of previous years, but has also incurred personal liabilities to the amount of several thousands of Rs, for which we hear he has had to pay nearly 5,000 Rupees in the shape of interest alone !!! The widow marriage funds, then, are, Vidyasagar's income, and the loans he can raise upon his individual guarantee !!!'

সম্পাদক তাই সকলের কাছে আবেদন জানিয়ে বললেন ঃ

'Let us severally and jointly exert all we can to collect subscriptions from all quarters to which we have access, and place adequate funds in the hands of Vidyasagara, who cannot refuse to accept this trust, however troublesome it may appear to be.'[১৪]

'ওয়েলউইশার'-এর এই প্রবন্ধটি পড়ে 'ন্যাশনাল পেপার'-এ নবগোপাল মিত্র নারীজাতির অবস্থার উন্নয়নের জন্য বিধবাবিবাহ আন্দোলনে নেমে বিদ্যাসাগরকে যে বিপুল আর্থিক দায়ভারের সম্মুখীন হতে হয়েছে, তার জন্য দুঃখপ্রকাশ করেন।[১৫] 'সোমপ্রকাশ-এও এক ব্যক্তি বিদ্যাসাগরকে ঋণের দায় থেকে উদ্ধার করার আবেদন জানিয়ে লিখলেন ঃ

'আমাদিগের দেশের ভট্টাচার্যগণ যতই পণ্ডিত হউন না, এক বিষয়ে তাহারা সামান্য বালক অপেক্ষাও অনুপযুক্ততা প্রদর্শন করেন। যেখানে সম্পত্তি ও অর্থ লইয়া কথা, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ সেখানে কিছুই বুঝিতে পারেন না। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের অপেক্ষা কেহই ভারতবর্ষকে অধিক ভালবাসেন না। স্বদেশের ও সমাজের উন্নতির জন্য কেহই অধিক চেষ্টা করেন নাই। কেহই অধিকতর কৃতকার্যও হন নাই। তিনি যদি আর কিছু না করিতেন বিধবাবিবাহ সংক্রান্ত চেষ্টা তাঁহার নাম চিরকাল জীবিত করিয়া রাখিত। স্বদেশের উৎকর্ষ সাধন বিষয়ে তাঁহার অকৃত্রিম যত্ন আছে, এবং স্বদেশের হিত চেষ্টা তাঁহার জীবনের একমাত্র ব্রত হইয়াছে। কিন্তু বিদ্যাসাগর একজন ভট্টাচার্যমাত্র, অর্থসম্বন্ধে তিনি স্বীয় শ্রেণিস্থ লোকদিগের অপেক্ষা অধিকতর চতুরতা প্রকাশ করিতে সমর্থ হন নাই। তাঁহার শিষ্য যজমান নাই, শ্রাদ্ধের পত্র লইয়াও কখন হুড়াহুড়ি করেন নাই। তথাপি সদুপায়ে নিজ পরিশ্রমগুণে তিনি বিস্তর অর্থ উপার্জন করিয়াছেন। কিন্তু সচরাচর ভট্টাচার্যের ন্যায় তিনি দরিদ্রমাত্র রহিয়াছেন। এ দরিদ্রতা কিসে হইল? ভট্টাচার্য কি বাবু হইয়াছিলেন? নাকি বস্ত্র ও সেরি সাম্পেন প্রভৃতিতে কি এত অর্থ ক্ষয় করিয়াছেন? পাঠকবর্গ তাহা ভাবিবেন না। সমাজের উৎকর্ষসাধনই তাঁহার যে একমাত্র ব্রত। তাহাতেই তিনি কেবল যে সর্বস্বান্ত হইয়াছেন, এমত নহে, ঋণে বিব্রত হইয়াছেন।

"বিধবাবিবাহের জন্য এক ফন্ড হয়। অনেকে চাঁদা দিবেন স্বীকার করিয়াছিলেন। কিন্তু বিদ্যাসাগর, ভট্টাচার্য স্বভাবসুলভ শৈথিল্যহেতু কাহাকে পীড়াপীড়ি করেন নাই। অনেকের নিকটে বিস্তর চাঁদা করা হয়, শেষে প্রায় কিছুই আদায় হইল না। ইতিমধ্যে প্রায় ষাটটি বিধবাবিবাহ দিতে ৮৭,০০০ টাকা ব্যয় হইয়া যায়। মৃত রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ প্রভৃতি কয়েকজন স্বদেশহিতৈষী সাহায্য করেন এইমাত্র। ইহাতে প্রায় ৪২,০০০ টাকা উঠিয়াছিল। বিদ্যাসাগর ভাবিয়াছিলেন, অন্য অন্য সকলে এই প্রকার সাহায্য করিবেন। কিন্তু চাঁদা পুস্তক স্বাক্ষর করিয়া টাকা না দেওয়া, অধিকাংশ লোকের যে রোগ আছে, এস্থলেও তাহার কার্য হইয়াছে। বিদ্যাসাগর

৩৫,০০০ টাকা ঋণগ্রস্ত হইয়াছেন। এ নিমিত্ত তাঁহার প্রতিবৎসর ৫,০০০ টাকা করিয়া সুদ দিতে হইতেছে। তাঁহার যাহা ছিল, এবং যাহা উপার্জন করিতেছেন, সে সমুদয় গিয়াছে ও যাইতেছে। সাধারণের উপকার করিতে গিয়া তাঁহার এই দুরবস্থা ঘটিয়াছে। বিধবাবিবাহের জন্য ফন্ড করা উচিত ছিল কি না? সে বিবেচনায় এক্ষণে প্রয়োজন রাখে না। কাঁচ দ্বারা আবৃত বৃক্ষ কখন সতেজ হয় না। তথাপি মগ্নপ্রায় লোককে নির্বুদ্ধিতার জন্য ভর্ৎসনা না করিয়া অগ্রে জল হইতে উত্তোলন করাই উচিত। বিদ্যাসাগরের সৎ ও মহৎ উদ্দেশ্য কোন ব্যক্তি অস্বীকার করিবেন? তাঁহার অকৃত্রিম স্বদেশানুরাগের অপলাপ করা কাহার সাধ্য? এমত ব্যক্তিকে কি হস্তপদ বন্ধন করিয়া মহাজনদিগের হস্তে সমর্পণ করা উচিত? স্বদেশের উপকারের নিমিত্ত কি শেষ কারাবাস তাঁহার পুরস্কার হইবে? আমরা সর্বসাধারণকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি। যাঁহাদিগের নিকটে চাঁদা পাওনা আছে, তাঁহারা যদি ভদ্রলোক হন, ভারতবর্ষের প্রতি যদি তাঁহাদিগের কিছুমাত্র অনুরাগ থাকে, তাহা হইলে অবিলম্বে আপনাদিগের অঙ্গীকৃত অর্থ দান করিতে আরম্ভ করুন। দেশীয়দিগের নিকটে আমাদিগের এই প্রার্থনা তাঁহারা একজন অকপট স্বদেশহিতৈষীর সাহায্যার্থ অগ্রসর হউন। এথেন্সের দেশহিতৈষীমাত্রের ভাগ্যে নির্বাসন পুরস্কার হইত। আমরাও কি ঐ প্রকার অকৃতজ্ঞতা দুর্নাম গ্রহণ করিব? বিদ্যাসাগরের বিষয়বুদ্ধি থাকিলে এমত বিব্রত হইতেন না। কিন্তু স্বদেশের প্রতি অকৃত্রিম অনুরাগের কি শেষ এই ফল হইবে? আমরা বলিতেছি, আমরা যদি বিদ্যাসাগরকে এ ঋণদায় হইতে উদ্ধার না করি, তাহা হইলে আমাদিগের উন্নতি সভ্যতা বিদ্যাশিক্ষা সকলই বৃথা, এ সকল কেবল বক্তৃতা ও কাগজমাত্রে পরিণত হইবে। আমরা পৃথিবীর প্রধান জাতিসকলের মধ্যে কখন পরিগণিত হইতে পারিব না। আমরা সর্বসাধারণের মুখ চাহিয়া রহিলাম।'[৯৬]

এসব লেখালিখি যখন হচ্ছে, তখন বিদ্যাসাগর গ্রামের বাড়িতে। কলকাতায় ফিরে তিনি প্যারীচরণের এই কাজ দেখে ও এ-সম্পর্কে নানাজনের টিকা-টিপ্পনি শুনে অত্যন্ত বিরক্ত ও বিব্রত হন। তাঁর যে অর্থসাহায্যের কোনো প্রয়োজন নেই তা 'হিন্দু পেট্রিয়ট'-এ একটি চিঠি লিখে তিনি পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দেন—

'I have thought it proper to publish this statement solely and wholly in the interest of the cause. I do not care what people may think or say of me individually, but I should be extremely sorry to see anything done which though originating with the best of motives, was calculated to harm the cause I have expoused. If the parties, who have set subscriptions on foot, had confined their efforts to the formation of a Widow Marriage Fund, and had not made allusion to my own liabilities, for meeting which, I need hardly repeat, I had not and have not the remotest idea of

appealing to the public, I would not have felt it necessary to remonstrate against the agitation. But the national object for which I am laboring has been so much mixed up with me personally that I must protest against the move under notice, and request those gentlemen who have initiated it to desist in their efforts.'[১৭]

বিধবাবিবাহের ঋণ পরিশোধের জন্য সাহায্য গ্রহণে বিদ্যাসাগরের অসম্মতি দেখে 'সোমপ্রকাশ' মন্তব্য করে 'মনস্বী ব্যক্তির তেজস্বিতা এইরূপ আলোকসামান্যই হইয়া থাকে।'[১৮] ব্যাপারটা অন্যদিকে যাচ্ছে দেখে 'ওয়েলউইশার'-এর সম্পাদক তাঁর কাজের জন্য দুঃখপ্রকাশ করে বলেন, বিদ্যাসাগরের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোনো নির্দেশে নয়, স্বতঃপ্রবৃত্তভাবেই তাঁরা এই আবেদন করেছিলেন। কিন্তু এর ফলে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে তারজন্য 'we have to offer thousand apologies.... to pundit Iswara Chandra Vidyasagara for causing all this annoyance.'

'ওয়েলউইশার' দুঃখপ্রকাশ করলেও, ব্যাপারটা সম্পর্কে কিছু প্রশ্ন উঠল। 'হিন্দু পেট্রিয়ট'-এ এক পত্রলেখক বিদ্যাসাগরের বিরুদ্ধে ঘুষ দিয়ে বিধবাবিবাহ দেবার অভিযোগ এনে বললেন :

'It appears that the pundit was in the habit of advancing large sums of money to encourage widow marriages. I do not impung his motives, every reformer becomes sanguine to carry his particular views into effect so much so that he leaves no stone unturned to make himself successful, but speaking calmly and considerately on the point I say that he should not resort to a contrivance which evil-disposed men may say was a kind of bribe offered to the parents of bride or bride groom to make widow marriage palatable to them. If my countrymen believe that widow marriage· are desirable objects let them retrieve their character by showing to the world that they are not wanting in moral courage to make their children happy. Why offer premium for the consummation of an undertaking which is so essential to the moral well being of their children ? If otherwise the pundit should say to his countrymen that I have done all I could for you, I have exerted my best to procure you a law for widow marriage and it is now your time to do that which if you neglect, you show a violent disregard for the interests of society so far as the moral

regeneration of your children. Baboo Debendranath Tagore is a religious reformer amongst us. He is anxious to introduce Brahmo Dhurmo in the country. Does he give bouns to his followers to follow his religion ? I believe he scorns such a thing, he lectures them and tells them what is right for them to do. This is an example which our worthy pundit will do well to follow, all reformations force upon the people either by money or by physical force are like bubbles in the waters. Let him discontinue giving money to the Brides or Bridegrooms and if widow marriages take place amongst us, he will then find that people have appreciated the movement and not otherwise.'[৯৯]

এ চিঠি বেরোনোর পরেই বিদ্যাসাগর সম্ভবত উপলব্ধি করেন যে টাকা পয়সা খরচ করে, প্রলোভন দেখিয়ে এইভাবে বিয়ে দেওয়াটা ঠিক হচ্ছে না। বিধবার পাণিপ্রার্থীদের কার্যকলাপে কিছুদিন ধরেই তিনি বিরক্ত ও বিব্রত বোধ করছিলেন। বিধবা কন্যার বিবাহ দিলে বিদ্যাসাগরের কাছ থেকে বেশ কিছু সোনার গয়না আদায় করা যাবে—এই লোভেও অনেকে বিধবামেয়ের পুনর্বিবাহে আগ্রহী হয়ে ওঠে। এইসব লোক যাতে প্রশ্রয় না পায় সেইজন্য শম্ভুচন্দ্রকে একটি চিঠিতে পরিষ্কারভাবে তিনি জানিয়ে দিলেন, 'অতঃপর যে সকল বিধবা কন্যার বিবাহ হইবেক তাহাতে আমি কিছুই খরচ করিব না স্থির করিয়াছি।...আমি কেবল পাত্র স্থির করিয়া দিব পাত্র খরচ করিয়া বিবাহ করিবেন এবং আপন সঙ্গতি অনুরূপ অলঙ্কার দিবেন।'[১০০] অর্থ বা অলঙ্কারের লোভে তাঁকে বঞ্চনা করে বিধবাবিবাহের সুযোগ নিয়ে অনেকে বহুবিবাহ করত। এই বজ্জাতি বন্ধ করার জন্য তিনি শেষপর্যন্ত বিধবাবিবাহকারী পাত্রকে দিয়ে একটি অঙ্গীকারপত্র লিখিয়ে নিতে আরম্ভ করেন।

এই কালেই বিদ্যাসাগর-পুত্র নারায়ণচন্দ্র ভবসুন্দরী নামে একটি বিধবা মেয়েকে বিবাহ করার সিদ্ধান্ত নেন। নারায়ণ এই বিয়ে করলে আত্মীয় কুটুম্ব, বন্ধু-বান্ধবরা তাঁদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখবেন না বলে ভয় দেখান। শম্ভুচন্দ্রের পত্রে সব ব্যাপার জানার পর ১২৭৭ বঙ্গাব্দের ৩১ শ্রাবণ বিদ্যাসাগর শম্ভুচন্দ্রকে এক চিঠিতে লেখেন ঃ

'আমি বিধবাবিবাহের প্রবর্ত্তক, আমরা উদ্যোগ করিয়া অনেকের বিবাহ দিয়াছি এমন স্থলে আমার পুত্র বিধবাবিবাহ না করিয়া কুমারীবিবাহ করিলে আমি লোকের নিকট মুখ দেখাইতে পারিতাম না। ভদ্রসমাজে নিতান্ত হেয় ও অশ্রদ্ধেয় হইতাম। নারায়ণ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এই বিবাহ করিয়া আমার মুখ উজ্জ্বল করিয়াছে এবং লোকের নিকট আমার পুত্র বলিয়া পরিচয় দিতে পারিবেক তাহার পথ করিয়াছে। বিধবাবিবাহ প্রবর্ত্তন আমার জীবনের সর্বপ্রধান সৎকর্ম। এ

জন্মে ইহা অপেক্ষা অধিকতর আর কোনও সৎকর্ম করিতে পারিব তাহার সম্ভাবনা নাই। এ বিষয়ের জন্য সর্বস্বান্ত হইয়াছি এবং আবশ্যক হইলে প্রাণান্ত স্বীকারেও পরাঙ্মুখ নহি। সে বিবেচনায় কুটুম্ববিচ্ছেদ অতি সামান্য কথা। কুটুম্ব মহাশয়েরা আহার ব্যবহার পরিত্যাগ করিবেন এই ভয়ে যদি আমি পুত্রকে তাহার অভিপ্রেত বিধবাবিবাহ হইতে বিরত করিতাম, তাহা হইলে আমা অপেক্ষা নরাধম আর কেহ হইত না। অধিক আর কি বলিব সে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এই বিবাহ করাতে আমি আপনাকে চরিতার্থ জ্ঞান করিতেছি।'

নারায়ণ বিধবাবিবাহ করার পর বিদ্যাসাগরের ভাবমূর্তি আরো উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। যারা বলত, পরের বিধবা মেয়ের বিয়ে দিয়ে আর পরের ছেলের জাত মেরে বিদ্যাসাগর নাম কিনছেন, তাদের মুখ বন্ধ হল।[১০১] কিন্তু তাই বলে বিধবাবিবাহের অনুকূল কোনো পরিবেশ গড়ে উঠল না। ব্যাপারটা ১২৭৭-এর শ্রাবণ মাসের 'বামাবোধিনী'তে প্রকাশিত একটি লেখা থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়—

'বিধবা কুলহিতৈষী পণ্ডিতবর বিদ্যাসাগর মহাশয় বিধবাগণের বিবাহের জন্য কায়মন ও অর্থ দিয়া যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু ফল দ্বারা আমরা যতদূর বুঝিতে পারিয়াছি তাহাতে হিন্দুসমাজের বর্তমান আচার ব্যবহার প্রণালী থাকিতে ইহা সফল হইবার আশা নাই। সাধারণ লোক যুক্তিও বুঝে না, শাস্ত্রও বুঝে না, দেশাচার ও মোটামুটি একটা সংস্কার ধরিয়া কার্য করে। তাহারা বিধবার বিবাহ শুনিলে মহাপাপ বলিয়া বিজাতীয় ঘৃণা প্রদর্শন করে। এ প্রকারে বিবাহিত দম্পতি সাধারণের চক্ষুশূল, বিদ্বেষ ও বিদ্রূপের পাত্র হইয়া কি প্রকারে সমাজে বাস করিতে পারে?'[১০২]

বিদ্যাসাগরের চেষ্টা সত্ত্বেও, বিধবাবিবাহ যে বাঙালি হিন্দুসমাজে স্বীকৃতি পায়নি, তা এইকালের আর একটি সাময়িকপত্রকেও বলতে শুনি। পত্রিকাটির মতে 'বিধবাবিবাহ শাস্ত্রানুমোদিত হইলেও ভারতবর্ষে পরিগৃহীত নহে। শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চেষ্টা ও উৎসাহে বঙ্গদেশে কখনও কখনও ইহার অনুষ্ঠান দেখা গিয়া থাকে, কিন্তু সমাজে শাস্ত্রসিদ্ধ বলিয়া কোনও স্থানেই গ্রাহ্য হয় না। এতৎ ব্যাপার অনুষ্ঠাতৃগণ সমাজচ্যুত হইয়া মর্যাদাভ্রষ্টরূপে বসতি করে।'[১০৩] এই একই কথা বছরতিনেক পরে আমরা শুনলাম ভুবনেশ্বর মিত্রের কাছে। 'হিন্দু বিবাহ সমালোচন' পুস্তকের দ্বিতীয় খণ্ডে তিনি পরিষ্কারভাবে জানালেন, বিধবাবিবাহ সম্পর্কে বিদ্যাসাগরের প্রয়াস সমাজ স্বীকার করেনি। তাঁর ভাষাই উদ্ধৃত করি :

'মান্যবর শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় বর্তমান হিন্দুসমাজে বিধবাবিবাহ পুনঃপ্রবর্তিত করিবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি এ বিষয়ে একটি আইনও রাজদ্বারে বিধিবদ্ধ করিয়া লইয়াছেন। যদিও লোকের মনে এক্ষণে প্রতীতি হইয়াছে, যে বিধবাদিগের বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত, কিন্তু চির কুসংস্কারবশতঃ এবং দেশাচার ভয়ে কেহ তাহার অনুষ্ঠান করিতে অগ্রসর হয় না। কুসংস্কার ও দেশাচার এতদূর প্রবল, যে যদি কেহ বিধবাবিবাহ অনুষ্ঠান করেন, তবে তাহাকে উক্ত

বিবাহিতা বিধবার সহিত সমাজ হইতে বহিষ্কৃত হইতে, অথবা বিবাহিতা বিধবা নারীকে অচিরে পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইতে হইবে।'[১০৪]

এই একইকালে বিধবাবিবাহ আন্দোলনের ব্যর্থতাকে চিহ্নিত করে অক্ষয়চন্দ্র সরকারের 'সাধারণী' লেখে ঃ

'আজি ১৮ / ১৯ বৎসর হইল বিধবাবিবাহের উৎসাহ তরঙ্গরূপে ধাবিত হইল। দেশে প্রদেশে, নগরে গ্রামে, ধনীমণ্ডলে, মধ্যবিত্তমণ্ডলে, দীনদুঃখীমণ্ডলে, পরিবার মণ্ডলে, পরিজন মণ্ডলে বিধবাবিবাহের কথা আন্দোলিত হইতে লাগিল। প্রাচীনেরা আশাঙ্কিত হইতে লাগিলেন, নব্যেরা উৎসাহে তরঙ্গিত হইতে লাগিলেন, যুবতীরা আনন্দ-ভয়-বিহ্বলনেত্রে দেখিতে লাগিলেন। পরিহাসপ্রিয় লোকেরা অমনি ছড়া বাঁধিলেন, শান্তিপুরী কাপড়ে গান বুনিতে লাগিল। কতক পরিহাসচ্ছলে, কতক লোকের বা আন্তরিক মনোভাব ব্যক্ত করিয়া 'সুখে থাক বিদ্যাসাগর চিরজীবী হয়ে' গীত ধ্বনিত ও প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। প্রথমতঃ দুই চারিটি বিধবাবিবাহ সম্পন্ন হইল, কিন্তু কৃতবিদ্যগণ যাঁহারা অন্তরে বিধবাবিবাহ পক্ষাবলম্বিনী তাঁহারা সাহস করিয়া অগ্রসর না হইয়া অপ্রকাশ্যভাবে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের যত্নের পরিণাম লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। সাহস করিয়া কেউই অগ্রসর হইলেন না। মধ্যে মধ্যে এখানে ওখানে দুই একটি বিবাহ কার্য্যে পরিণত হইল ও সেই অবধি শেষ হইয়া গেল। বিধবা বঙ্গাঙ্গনা হতাশ হইলেন, প্রজ্বলিত হুতাশন ধূমাবশিষ্ট হইয়া গেল।'[১০৫]

আসলে বিধবাবিবাহ দীর্ঘদিনের সংস্কারের মূলোচ্ছেদ করতে পারেনি। নিজের জীবনের 'সর্বপ্রধান সৎকর্মের' এই করুণ পরিণতি দেখে জীবন সায়াহ্নে দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে আক্ষেপ করে বিদ্যাসাগর লেখেন, 'আমাদের দেশের লোক এত অসার ও অপদার্থ বলিয়া পূর্বে জানিলে আমি কখনই বিধবাবিবাহ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতাম না।'

কেন এই আন্দোলন সফল হল না, তা নিয়ে সেকালেই প্রশ্ন উঠেছিল। ব্যর্থতার কিছু কারণ 'সাধারণী' সম্পাদকের কাছ থেকে আমরা আগেই জেনেছি। বিদ্যাসাগর মনে করতেন, বিধবাবিবাহ প্রবর্তনের পথে প্রধান বাধা দেশাচার। ব্যর্থতার অন্য একটি কারণ দেখিয়েছেন সমকালীন এক লেখক যোগেন্দ্রনাথ শর্মা। তাঁর মতে নব্যশিক্ষিতদের মধ্যে ম্যালথসের মত প্রচারিত হবার পর তাঁরা দেখলেন, বিধবাবিবাহ প্রচলিত হলে লোকসংখ্যা খুব বেড়ে যাবে। সুতরাং বিধবার বিয়ে দেওয়া চলবে না। নব্যসম্প্রদায় এই ধুয়া ধরার সঙ্গে-সঙ্গে বিধবাবিবাহের স্রোত রুদ্ধ হল। 'সেই অবধি বিধবাগণের ভাগ্যলক্ষ্মী আবার তাহাদিগের প্রতি বিমুখ হইয়াছেন। সুশিক্ষিত দলের এই অনার্য আচরণে মর্মাহিত হইয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় বিধবাবিবাহ প্রচারে ক্রমেই শিথিলযত্ন হইলেন। যাঁহারা এই মহদনুষ্ঠানে তাঁহার পশ্চাদ্বর্তী হইয়াছিলেন, তাঁহারাও দলপতির ভগ্ন হৃদয়তায় ব্যথিত হইয়া নীরবে সমস্ত কষ্ট সহিয়া অনুকূল কালের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।'[১০৬]

সেকালের বিশিষ্ট পত্রিকা 'সোমপ্রকাশ'ও শিক্ষিতদের উদাসীনতাকেই এই আন্দোলনের অসাফল্যের কারণ বলে মনে করত। ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দে 'বিবাহার্থিনী হিন্দু বিধবাগণের সাহায্যার্থ' একটি সভা স্থাপিত হলে 'সোমপ্রকাশ' এই প্রয়াসকে স্বাগত জানিয়ে লেখে ঃ

'বিধবাবিবাহ প্রচলিত না হওয়াতে যে কি ঘোর অনিষ্ট ঘটিতেছে, যাঁহাদের বাটীতে বিধবা আছেন তাঁহারাই প্রায় অহরহঃ সেই অনিষ্ট প্রত্যক্ষ করিতেছেন।…এই সকল অনিষ্ট দর্শন করিয়া কি আজিও বিধবাবিবাহে ঔদাসীন্য প্রদর্শন করা হইবে ?… ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর যখন বিধবাবিবাহ প্রচলিত করিবার চেষ্টা পান, যদি শিক্ষিতেরা তৎকালে জড়বৎ ও উদাসীনবৎ ব্যবহার না করিয়া সজীবতা প্রদর্শনপূর্বক অকপট হৃদয়ে তাঁহার সহায়তা করিতেন, এতদিন বিধবাবিবাহ প্রচলিত হইয়া উঠিত।'[১০৭]

শ্রীশচন্দ্র মজুমদার আবার এ-আন্দোলনের ব্যর্থতার কারণ সম্পর্কে ভিন্নমত পোষণ করতেন। তাঁর মতে বর্তমান অধঃপতিত অবস্থা থেকে বঙ্গসমাজকে উদ্ধার করার জন্য বিপ্লবের প্রয়োজন। এ সত্য উপলব্ধি করতে না পারাই বিদ্যাসাগরের সংস্কার প্রচেষ্টার ব্যর্থতার কারণ। শ্রীশচন্দ্রের বক্তব্যটা এইরকম ঃ

'বিদ্যাসাগর মহাশয় বঙ্গসমাজের সংস্কারক বটে, কিন্তু তাঁহার সংস্কার প্রধানতঃ স্থিতি ও উন্নতিশীলতার মধ্যবর্তী। তিনি মনে করেন যে বঙ্গসমাজকে এখনও সংস্কার করিবার সময় আছে, সুতরাং তিনি বিপ্লবের দিক দিয়াও যান না। এইজন্য যখন চিরদুঃখিনী বঙ্গবিধবার দুঃখে ব্যথিত হইয়া তাহাদের বিবাহ দিতে তাঁহার ইচ্ছা জন্মিল, তখনও বিদ্যাসাগর মহাশয় শাস্ত্রের দোহাই দিতে বাধ্য।…কিন্তু তিনি সমাজের বর্তমান প্রবণতা অনুধাবন না করিয়া সংস্কার আরম্ভ করেন। বঙ্গসমাজ এত পুরাতন এবং এত অধঃপতিত হইয়াছে, যে সংস্কারে আর ইহার কিছু হয় না। যাহার সর্বাঙ্গেই ক্ষত, তাহার প্রলেপ দিব কোথা ? যদি বঙ্গসমাজ কখন উন্নত হয়, তবে বিপ্লব চাই। বিদ্যাসাগর মহাশয় এ রহস্য উদ্ভেদ করিতে প্রয়াস পান নাই। এইজন্যই তাঁহার প্রস্তাবিত সংস্কার বঙ্গসমাজের আমূল আলোড়িত করিল বটে, কিন্তু কাজ বড় হইল না। বরং প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইতেছে।'[১০৮]

দীননাথ গঙ্গোপাধ্যায় নামে সেকালের এক লেখক মনে করতেন, হিন্দুসমাজের বিরোধিতার জন্যই বিধবাবিবাহ আন্দোলন সফল হতে পারেনি। বিধবাবিবাহকে বিদ্যাসাগর শাস্ত্রসম্মত প্রমাণ করার পর একে বৈধ ঘোষণা করে এক আইনও প্রণীত হয়। 'কিন্তু তাহা হইলে কি হইবে ? সমাজের সম্মতি ব্যতীত বিধবাবিবাহ প্রচলিত হইতে পারে না। বিদ্যাসাগর মহাশয় অদম্য উৎসাহের সহিত কার্যক্ষেত্রে অবতরণ করিলেন। যাহাতে বিধবাবিবাহ প্রচলিত হয়, তাহার উপায় করিতে লাগিলেন। বিধবা-বিবাহ করিতে যাহারা সম্মত হইল তাহাদিগকে অর্থ প্রদান করিতে লাগিলেন। কতক-গুলি বিধবাবিবাহ সংঘটিত হইল। এরূপ উপায়ে কতদিনই বা কার্য চলিতে পারে ? একা বিদ্যাসাগর মহাশয়ই বা কত অর্থ ব্যয় করিতে পারেন ? শেষে তিনি ঋণজালে

জড়িত হইয়া পড়িলেন। হিন্দুসমাজের শিথিলতা, শিথিলতা কেন বিপক্ষতা এই মহৎ অনুষ্ঠানটীকে কার্য্যে পরিণত করিতে দিল না। দুঃখিনী বিধবাদের যে দুর্দশা, সেই দুর্দশাই রহিল।'[১০৯]

বিধবাবিবাহ আন্দোলনের ব্যর্থতার জন্য আর একদল মানুষের মনোভাবও দায়ী। এঁরা মনে করতেন 'একের দুইবার বিবাহ' দিলে 'অন্যের একবারও বিবাহ দিবার পাত্র মিলে না।' তাই 'একজনের ভোগাশা পরিতৃপ্ত করিতে গিয়া অপরকে চিরকুমারী রাখা' কতখানি সঙ্গত এ প্রশ্ন তুলতে তাঁরা দ্বিধা করলেন না।[১১০]

বিধবাবিবাহ আন্দোলন ব্যর্থ হবার পেছনে হিন্দু পুনরুজ্জীবন আন্দোলনের প্রভাবও উপেক্ষা করার মতো নয়। উনিশ শতকের সত্তরের দশকে হিন্দু পুনরুজ্জীবন আন্দোলন মাথা চাড়া দিলে বিধবাবিবাহ আন্দোলনে পুরোপুরি ভাঁটার টান দেখা যায়। হিন্দুধর্মের পবিত্রতা রক্ষায় আগ্রহী ব্যক্তিরা বিধবাবিবাহের বিরুদ্ধে নবোদ্যমে প্রচার অভিযান শুরু করেন। বিধবাবিবাহ যে শাস্ত্রসিদ্ধ ব্যাপার নয়, তা দেখিয়ে ১৮৭৪-এ শ্যামাপদ ন্যায়ভূষণ 'বিধবা ধর্মরক্ষা' রচনা করলেন। বিদ্যাসাগর সম্পর্কে প্রচুর সম্ভ্রম প্রকাশ করেও, বিধবাবিবাহ প্রবর্তনের জন্য তিনি যে শাস্ত্রকে বিকৃতভাবে ব্যাখ্যা করেছেন এরকম একটা অভিযোগ তুলে শ্যামাপদ ন্যায়ভূষণ লিখলেন :

'শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় বিদ্যাবিভব, দয়াদাক্ষিণ্য, সৌজন্য প্রভৃতি সর্বগুণেরই গুণাকর, কিন্তু তাঁহার স্বকীয় আচার ব্যবহার বিষয়ে যৎকিঞ্চিৎ জনাপবাদ যাহা শ্রবণ করা যায়, তদ্দ্বারায় বোধহয় তাঁহারও বেদাদি শাস্ত্রে বিশ্বাস নাই, যদি বিশ্বাস না থাকে তবে হিন্দু বিধবাদিগকে অকারণ বৈধব্যযন্ত্রণা ভোগ করিতে দেখিয়া দয়ালু বিদ্যাসাগর মহাশয় অবশ্যই দয়ার্দ্র হৃদয় হইতে পারেন এবং ঐ দুরন্ত বৈধব্য-যন্ত্রণা নিবারণের নিমিত্তে তাঁহার অন্তঃকরণে একান্তই অভিলাষ হইতে পারে, এখন সেই অভিলাষ পূর্ণ করিবার নিমিত্তে ইনি, ঋষি বচনের প্রকৃতার্থ গোপন করিয়া অযথা অর্থপ্রকাশে হিন্দুসমাজকে বিভ্রান্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, কি আপনিই বিভ্রান্ত হইয়া অযথা অর্থকে যথার্থবোধে ঐ ব্যবস্থা প্রকাশ করিয়াছেন ?'[১১১]

শ্যামাপদ ন্যায়ভূষণের বই বেরোনোর কিছুদিনের মধ্যে বিধবাবিবাহের অশাস্ত্রীয়তা দেখিয়ে শিবনাথ বিদ্যাবাচস্পতি ও প্রসন্নকুমার শর্মা বই লিখলেন। প্রসন্নকুমারের বইটির সমালোচনা প্রসঙ্গে 'ঢাকাপ্রকাশ' দেশের বর্তমান অধঃপতিত অবস্থার জন্য বিদ্যাসাগরকে কটাক্ষ করে লেখে, 'বৃহস্পতির নাস্তিক ধর্ম প্রবর্ত্তনার ন্যায় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিধবাবিবাহের অভিপ্রায় কিনা বলিতে পারি না, কিন্তু তাঁহার এই গ্রন্থ দেশের শিক্ষিত সমাজে যেরূপ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছে, তাঁহার গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া উদ্ধত যুবকগণ, যুবতীগণের যেরূপ মাথা খাওয়া ধরিতেছে, তাহাতে দেশের অধঃপতনের আর একটি সোপান প্রস্তুত হইয়াছে।'[১১২] এমনকি বিধবাবিবাহ আন্দোলন শুরুর সময় যাঁরা একে সমর্থন করেছিলেন, পরবর্তীকালে তাঁদের কেউ কেউ এর বিরুদ্ধবাদী হয়ে ওঠেন। দু'একটি পত্রপত্রিকাও এই দলে যোগ দেয়। 'হিন্দু

পেট্রিয়ট'-এর কথা প্রসঙ্গত স্মরণীয়। হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্পাদক থাকাকালীন পত্রিকাটি এই আন্দোলনকে কিভাবে সমর্থন করেছিল, তার কিছু পরিচয় আমরা আগেই দিয়ে এসেছি। কৃষ্ণদাস পালের আমলেও পত্রিকাটি বিধবাবিবাহের বিরুদ্ধে কিছু লেখেনি। কিন্তু এর দায়িত্ব রাজেন্দ্রলাল মিত্রের হাতে আসার পর পত্রিকাটি হয়ে ওঠে বিধবাবিবাহ বিরোধী। ১৮৯১-এ পত্রিকাটি ঘোষণা করে 'We have always been opposed to widow-remarriage.' 'হিন্দু পেট্রিয়ট'-এর এই বক্তব্য সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে 'রইস এ্যান্ড রায়ত' বলে:

'We wonder what the venerable Pandit Vidyasagar, who still lives will say to the statement now made by our contemporary.'[১১৩]

শুধু 'হিন্দু পেট্রিয়ট'ই নয়, যেসব বুদ্ধিজীবী প্রথম যৌবনে বিধবাবিবাহ আন্দোলনকে সমর্থন করেছিলেন, তাঁদেরও দু'চারজন পরবর্তীকালে এর বিরোধী হয়ে ওঠেন। এমন একজন বুদ্ধিজীবী 'শ্রীগণ্ডুষ জলসঞ্চারি সফর' নামান্তরালে ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে বিধবাবিবাহের বিরুদ্ধে একটি বই লেখেন। বইটির ভূমিকায় তিনি জানান, বিধবাবিবাহ আন্দোলন শুরু হলে বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে একত্রিত হয়ে তিনি বিষয়টিকে সাফল্যমণ্ডিত করার চেষ্টা করেন। করতে গিয়ে তিনি দেখলেন, বিধবারা নিজেরাই অনেকে এর বিরোধী। ফলে কিছুটা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ে তিনি এ সম্বন্ধে নানা বই পড়তে শুরু করেন। পড়ার পর তাঁর মনে হল, বিষয়টি শাস্ত্রসম্মত নয়। এটা দেখাতে গিয়ে তিনি বিদ্যাসাগরের বক্তব্যের ও মতের সমালোচনা করতে বাধ্য হলেন। এ কাজ করার আগে তিনি সবিনয়ে জানালেন, 'পণ্ডিতাগ্রগণ্য, দেশহিতৈষী, পরহিতব্রত, নিঃস্বার্থ, অব্যর্থচেষ্ট, সুলেখক, প্রবীণ, ভুবনবিখ্যাত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মতের বিরুদ্ধে আমার মত অপরিচিত ব্যক্তির লেখনী ধারণ করা অসংসাহসিক ব্যাপার। অতএব আমি যে সমস্ত যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছি ও স্থানে স্থানে শাস্ত্রের যেরূপ অর্থ করিয়াছি তাহার দোষ দেখাইলে পুনর্বার পূর্বমতে প্রত্যাবর্তন করিতে প্রস্তুত আছি।' এই আন্দোলনের ব্যর্থতার পরিচয় দিতে গিয়ে তিনি বললেন, 'অদ্য ৩০ বৎসর হইল বিদ্যাসাগর বিধবাবিবাহের ধুয়া তুলিয়া মনুষ্যের চেষ্টায় যাহা হইতে পারে তাহার ত্রুটি করেন নাই। দীর্ঘ ২ বক্তৃতা, অনেক অর্থব্যয় ও অদ্য ২৯ বৎসর হইল উহার আইন পর্যন্ত হইয়াছে। কিন্তু কি ফল হইয়াছে? কেবল কতিপয় কৃষ্ণের জীবের জাতিপাত মাত্র। তাহারও অধিকস্থলে অমঙ্গলই ঘটিয়াছে।'[১১৪]

এইকালেই বিধবাবিবাহ যে অশাস্ত্রীয় ব্যাপার এই মর্মে 'সমাজদীপিকা' পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধটি কথোপকথনের ঢঙে রচিত। বিধবাবিবাহের শাস্ত্রীয়তা নিয়ে দেবদূতের সঙ্গে আলোচনাকালে সনৎকুমার বলেন:

'আচ্ছা, আপনি ত বিবিধ উপায়ে বিধবাবিবাহের অযুক্ততাই প্রমাণ করিতেছেন। যদি ইহা অযুক্ত হয়, তবে আমাদের দেশের অদ্বিতীয় পণ্ডিত, শাস্ত্রজ্ঞানী, বিদ্যাসাগর

মহাশয়, উহার প্রচার জন্য এত ব্যগ্র কেন ? তিনি ভূরি ভূরি প্রমাণপ্রয়োগ ও যুক্তি প্রদর্শন করিয়া উহার শাস্ত্রীয়তা প্রমাণ করিয়াছেন, এবং সবিশেষ অধ্যবসায়ের সহিত উহার জন্য প্রাণান্ত পরিশ্রম করিতেছেন। ইহা কি তাঁহার ভ্রম ?

দেবদূত। (সচকিত) বিদ্যাসাগর মহাশয় কে ?

সনৎকুমার। কেন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

দেবদূত। ওঃ ওঃ, ওঃ, বটে, বটে, ঈশ্বরের কথা বলি শুন। এ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়া যে এত কাণ্ড ঘটিবেক, ঈশ্বর প্রথমে তাহা জানিত না। সে প্রথমে এই ভাবিয়াছিল, বিধবাবিবাহের আন্দোলন করা যাক্, দেখি, কি ফল দর্শায়। কিন্তু যখন, লোকে তাহাকে পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল, তখন সে কি করে, বড়লোক, দশজনে জানে শুনে পশ্চাৎপদ হইতে পারে না, কাজে কাজেই যাক প্রাণ, থাকুক মান করিয়া কোন গতিকে আপন কোট বজায় করিল। এখন ঈশ্বর কানকাটা সন্ন্যাসীর ন্যায় হইয়া আছে।'[১১৫]

হিন্দু পুনরুজ্জীবন আন্দোলনের নায়কদের অনেকেই বিদ্যাসাগরের এই কাজকে প্রীতির চোখে দেখেননি। ভূদেব মুখোপাধ্যায় বিদ্যাসাগরের ভদ্রঘরে বিধবাবিবাহ প্রবর্তনের চেষ্টাকে সমাজের পক্ষে ক্ষতিকর বলে মনে করতেন। তাঁর মতে 'বিধবাবিবাহ প্রবৃত্তিমার্গের অনুকূল···এবং হিন্দু যেভাবে ক্রমশঃ বৈবাহিক ব্যবস্থার সংস্কার করিয়া আসিতেছেন, তাহার বিপরীত ব্যবস্থা বলিয়া ঐ চেষ্টা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পক্ষে 'চাঁদে কলঙ্ক' বলিয়াই আমি মনে করি।'[১১৬]

শুধু ভূদেবই নন, সনাতন হিন্দুধর্মের পবিত্রতা রক্ষায় আগ্রহী পত্রিকাগুলিও তাঁর এই কাজকে 'চাঁদের কলঙ্ক' হিসাবে চিহ্নিত করে। 'অনুসন্ধান' তাঁর মৃত্যু সংবাদ দিতে গিয়ে মন্তব্য করে, তাঁর চেষ্টায় বিধবাবিবাহ আইন পাশ হয়, প্রথম বিধবাবিবাহ তাঁর চেষ্টাতেই সম্পন্ন হয়। 'এই যৌবনোচিত কার্য্যেই বিদ্যাসাগর মহাশয় দুরপনেয় কলঙ্কে কলঙ্কিত হয়েন, এবং হিন্দুসমাজ হইতে তাঁহাকে পরিত্যাগ করা হয়। কিন্তু তাঁহার এমনই জিদ যে, তিনি কিছুতেই সে কার্য্যে প্রতিনিবৃত্ত হয়েন না ; অনেকসময় দেনাপত্র করিয়াও, তিনি বিধবাবিবাহ দিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। ফলতঃ এমন যে সর্বগুণান্বিত সর্বপূজ্য বিদ্যাসাগর—এই একটি কার্য্যেই, চন্দ্রের কলঙ্কের ন্যায় তাঁহাকে কলঙ্ক কালিমায় কলুষিত করিয়াছিল।'[১১৭]

'অনুসন্ধান'-এর বক্তব্যই প্রতিধ্বনিত হয়েছিল 'সুবোধিনী'তে। এই পত্রিকায় বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে জনৈক রাধাজীবন রায় মন্তব্য করেন, তিনি বিধবাবিবাহ বিষয়ক পুস্তকাদি প্রণয়ন করেন এবং বঙ্গদেশে বিধবাবিবাহ প্রচলন জন্য যত্নবান হন। 'ইহাতেই তিনি সাধারণের অপ্রিয়ভাজন হইয়াছিলেন এবং সমস্ত ভারতবাসী তাঁহার বিপক্ষ হইয়াছিল। তিনি অতি তেজস্বী পুরুষ ছিলেন—ইহাতে একদিনের জন্য কিঞ্চিন্মাত্রও ভীত হইলেন না। তাঁহার প্রার্থনায় ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক উক্ত আইন পাস হয়—এই একটি কার্য্যেই চন্দ্রের কলঙ্কের ন্যায় তাঁহাকে কলঙ্ক কালিমায় কলুষিত করিয়াছিল।'[১১৮]

সমসাময়িক যুগে ভিন্নমতাবলম্বী লোকেরও অভাব ছিল না। বাঙালি বিধবার দুঃখ দূর করার জন্য তাঁর প্রচেষ্টা দেখে সমকালীন একটি পত্রিকা তাঁর জীবিতকালেই তাঁকে *liberator of the females* হিসাবে চিহ্নিত করে। 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়'-এর জনৈক প্রতিনিধি নারীর মর্যাদারক্ষায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এই মানুষটির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন।

বিধবাবিবাহ আন্দোলনের এই ব্যর্থতা চোখের সামনে দেখে বিদ্যাসাগর কি শেষজীবনে হাল ছেড়ে দিয়েছিলেন, পরাজয়কে বরণ করে নিয়েছিলেন? আপাতদৃষ্টিতে এটাই মনে হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু সমকালীন পত্রিকাগুলিতে এমন দু'একটা সংবাদ মেলে, যা আমাদের বুঝতে সাহায্য করে, পরাজয় স্বীকার করার মতো মানসিকতায় বিদ্যাসাগরের বিশ্বাস ছিল না। ছিল না বলেই, ১৮৮৪ সালে বিধবা বিবাহের উন্নতিসাধনের জন্য তিনি একটি কার্যালয় স্থাপন করেন। সমকালীন একটি পত্রিকায় পাই:

'পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় বিধবাবিবাহের উন্নতি সাধনার্থ পুনরুদ্যুক্ত হইয়াছেন এবং একটি কার্য্যালয় স্থাপন করিয়াছেন দেখিয়া আমরা যারপরনাই আহ্লাদিত হইলাম।'[১১৯]

কার্যালয় স্থাপন করেও অবশ্য বিধবাবিবাহের মরা গাঙে জোয়ার তিনি আনতে পারেননি। তবু জীবনের শেষদিন পর্যন্ত বিধবাবিবাহের সমস্ত প্রচেষ্টাকে শুধু প্রাণভরে তিনি আশীর্বাদই করেননি, সাহায্যও করেছেন সাধ্যমত। ১৮৯০-এর মার্চ মাসের 'বামাবোধিনী' খবর দেয়, 'শ্রীহট্টে বালবিধবাদিগের বিবাহ সম্পাদনার্থ এক সভা হইয়াছে, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় ইহাতে পাঁচশত টাকা দান করিয়াছেন।' শ্রীহট্টে এ-ধরনের একটি সভা স্থাপিত হওয়ায় হরকিঙ্কর দাস নামে এক নিষ্ঠাবান হিন্দু 'ধর্মপ্রচারক' সম্পাদককে উদ্বেগ প্রকাশ করে লেখেন, 'আপনারা হয়ত অবগত আছেন যে সংপ্রতি শ্রীহট্ট নিবাসী কতিপয় শিক্ষিত যুবক হিন্দু বিধবার বিবাহ প্রচলিত করিবার জন্য একটি সভা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন এবং বিদ্যাসাগর প্রমুখ সংস্কারকগণ সেই সভাকে অর্থ এবং সহানুভূতি দ্বারা সাহায্য করিতেছেন।' হিন্দুসমাজকে বিপর্যস্ত করার জন্য এরকম একটি ষড়যন্ত্র চলছে, অথচ 'ধর্মপ্রচারক' কিনা নীরব, নিশ্চেষ্ট। হরকিঙ্কর তাই অনুনয় জানিয়ে বললেন, 'আপনাদিগকে নীরব দেখিয়া বাস্তবিকই প্রাণ ব্যথিত হইতেছে।...আর নীরব নিশ্চেষ্ট থাকিবেন না।' 'ধর্মপ্রচারক'-সম্পাদক তাঁকে আশ্বস্ত করে বললেন, বিধবাবিবাহের 'অশাস্ত্রীয়তা ও অপকারিতা' সম্পর্কে তাঁরা পুরোমাত্রায় সচেতন।

'ধর্মপ্রচারক'-এর মতো পত্রিকা যে এ-বিষয়ে সচেতন হবে, সে তো জানা কথাই। কিন্তু জীবনের অন্তিম লগ্নে পৌঁছেও বিধবাবিবাহ সংক্রান্ত ব্যাপারে বিদ্যাসাগরের উৎসাহ লক্ষ্য করার মতো। অর্থাৎ পুনর্বিবাহই যে বিধবার দুঃখমোচনের প্রধান পথ—এ বিশ্বাস মৃত্যুকাল পর্যন্ত বিদ্যাসাগরের অটুট ছিল।

৩

বিধবাবিবাহ আইন চালু হবার মাসদেড়েক পরে 'হিন্দু পেট্রিয়ট'-এ একটি চিঠি প্রকাশিত হয়। পত্রলেখক বিধবাবিবাহ আইন প্রণয়নে বিদ্যাসাগরের ভূমিকার প্রশংসা করে বলেন, অসহায় নারীজাতির প্রতি এখনও তাঁর কিছু কর্তব্য বাকি। চিঠিটিতে কুলীন মেয়েদের দুরবস্থার পরিচয় দিয়ে তাঁদের দুঃখ দূর করার কাজে বিদ্যাসাগরকে উদ্যোগী হতে আহ্বান জানানো হয়।[১২০]

পত্রলেখক এই আহ্বান জানানোর আগেই কৌলীন্যপ্রথার অভিশাপ থেকে বাঙালি মেয়েদের মুক্ত করার অভিযানে বিদ্যাসাগর সামিল হয়েছিলেন। বাঙালিসমাজে কৌলীন্যপ্রথা বিরোধী অভিযানের শুরু রামমোহন থেকে। ১৮১৯-এ 'সহমরণ বিষয় প্রবর্তক ও নিবর্তকের দ্বিতীয় সম্বাদ'-এ তিনি কুলীন মেয়েদের অসহায় অবস্থার প্রতি জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ১৮২২-এ প্রকাশিত *Brief Remarks regarding Modern Encroachments on the ancient rights of Females according to the Hindu Law of Inheritance*-এ রামমোহন তীব্রভাষায় এই প্রথার সমালোচনা করে বলেন, অশাস্ত্রীয় এই প্রথা এদেশের মেয়েদের দুর্গতির অন্যতম প্রধান কারণ।

রামমোহনের পর সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে ডিরোজিও-র ছাত্রশিষ্যরা প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেন। ডিরোজিও-শিষ্য ইয়ংবেঙ্গলের দল ছিলেন কৌলীন্যপ্রথার কঠোর সমালোচক। এই গোষ্ঠীর দুই মুখপত্র 'এনকোয়ারার' ও 'জ্ঞানান্বেষণ'-এ এ-প্রথার নিন্দা করে একাধিক লেখা প্রকাশিত হয়। এই সময় থেকেই কৌলীন্যপ্রথার কুফল সম্পর্কে বাঙালি চিন্তানায়করা সচেতন হয়ে উঠতে থাকেন। রামমোহন-অনুরাগী প্রসন্নকুমার ঠাকুর 'রিফর্মার'-এ এক সম্পাদকীয় নিবন্ধে লেখেন: কৌলীন্যপ্রথা সমাজের পক্ষে হানিকর, এর ফলে কুলীন পত্নীদের ও বিবাহবঞ্চিত ব্রাহ্মণদের মধ্যে ব্যভিচার বৃদ্ধি পায়, সমাজের নৈতিকতার হানি হয়, জনসংখ্যা বৃদ্ধির গতিও হ্রাস পায়। যে-কোনো সভ্য সরকারের কাছে এ ধরনের প্রতিটি ক্ষতিই মারাত্মক এবং যেহেতু এই প্রথা শাস্ত্রসম্মত নয়, তাই সরকারের অবশ্যই তা নিবারণ করা উচিত। এ-বিষয়ক আইন প্রণীত হলে অসংখ্য নিরীহ নারী দাসত্ব বন্ধন, হাজার পাপ ও অবমাননার হাত থেকে রেহাই পাবেন। ইংলন্ডে বহুবিবাহ নিষিদ্ধ, তাই ব্রিটিশ প্রজা হিসাবে ভারতীয়রাও এই আইন সম্প্রসারণের প্রার্থনা জানাতে পারে। এ প্রথা যে একইসঙ্গে ব্রিটিশ আইন ও হিন্দুশাস্ত্রবিরোধী তার উল্লেখ করতেও সম্পাদক ভোলেন নি।[১২১] উনিশ শতকের তিরিশের দশকেই বিষয়টি নিয়ে 'সমাচার দর্পণ'-এর সঙ্গে 'সমাচার চন্দ্রিকা'-র বাদানুবাদ শুরু হয়ে যায়। এ-বিষয়ক বিতর্কের রেশ অন্যান্য পত্রিকাতেও লাগে। 'ইন্ডিয়া গেজেট,' 'ফ্রেন্ড অব ইন্ডিয়া,' 'ক্যালকাটা খ্রিশ্চান অবজার্ভার' প্রভৃতির মতো সাহেবি পত্রিকাও এই প্রথার বিরুদ্ধে লেখালিখি শুরু

করে। অক্ষয়কুমার দত্ত সম্পাদিত 'বিদ্যাদর্শন' পত্রিকাতেও বহুবিবাহের বিরুদ্ধে একাধিক লেখা প্রকাশিত হয়। সম্পাদক একাধিকবার যুক্তি ও শাস্ত্রবিরোধী এ-প্রথা নিবারণে সরকারি হস্তক্ষেপ দাবি করেন।

কিন্তু যার বিরুদ্ধে বাঙালি চিন্তানায়করা এতখানি সোচ্চার হয়ে উঠলেন, সেই কৌলীন্যপ্রথা জিনিসটা কি ?

প্রথাটির জন্ম সম্ভবত বল্লালসেনের আমলে। শোনা যায়, সম্মানলাভের জন্য সমস্ত প্রজা সৎপথে চলবে এই লক্ষ্য নিয়ে বল্লালসেন কৌলীন্যমর্যাদা সৃষ্টি করেছিলেন। শ্রোত্রিয়দের মধ্যে যাঁরা নবগুণ বিশিষ্ট ('আচারো বিনয় বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থদর্শনং। নিষ্ঠা শান্তি স্তপো দানং নবধা কুললক্ষণং॥') বল্লাল তাঁদের কুলীন উপাধি দিয়েছিলেন। তিনি নিয়ম করেছিলেন, ৩৬ বছর অন্তর বাছাই করে গুণ ও কাজ দেখে পুনরায় কুলীন ও অকুলীন নির্বাচিত হবে। কাজেই কুলমর্যাদা লাভের জন্য সকলেই ধার্মিক ও গুণবান হতে চেষ্টা করবে।

বল্লালসেনের পুত্র লক্ষ্মণসেনের আমলে ঘোষণা করা হল, কৌলীন্যপ্রথা বংশানুক্রমিক হবে এবং পুত্রকন্যার বিবাহের উৎকর্ষ অপকর্ষ দ্বারা সেই মর্যাদা হ্রাস-বৃদ্ধি হতে পারবে। পুনরায় নির্বাচন করে মর্যাদা প্রদান করা তাঁর আমলে রহিত করা হল। এই নতুন নিয়মে হাজার দোষ দেখা দিল। শ্রোত্রিয়রা বহু ব্যয় করে কুলীনে কন্যা দিয়ে কুলমর্যাদা বৃদ্ধির চেষ্টা করতে লাগল। ফলে কুলীন পাত্রের চাহিদা বেড়ে গেল। সুযোগ বুঝে তারা বহুবিবাহে প্রবৃত্ত হয়ে বিবাহ ব্যবসায়ী হয়ে উঠল। কুলীনের ছেলে অল্পবয়সেই কেমন বিবাহ ব্যবসায়ী হয়ে উঠত, তার সুন্দর দৃষ্টান্ত মেলে উনিশ শতকের একটি পত্রিকায়। ন বছর বয়স হতে না হতেই কুলীনের ছেলের চারদিক থেকে সম্বন্ধ আসতে শুরু করে। এর ফলে কুলীনপুত্রের 'লেখাপড়া সমস্ত জলে ভাসিয়া গেল বৎসর কয়েক মধ্যেই পঞ্চান্নটি বিবাহ করিয়া একে ২ শ্বশুর বাটী হইতে বার্ষিক আদায় করেন। আর মজা করিয়া পায়ের উপর পা দিয়া রাজা-পুত্রের ন্যায় নির্ভাবনায় কালাতিপাত করেন।'[১২২]

ইতিমধ্যে দেবীবর নামে এক ঘটক ঘোষণা করলেন, 'দোষো যত্র কুলং তত্র।' বল্লাল গুণ দেখে কুলীন করেছিলেন, দেবীবর করলেন দোষ দেখে। দোষানুসারে কুলীনদের তিনি ৩৬টি সম্প্রদায়ে ভাগ করলেন। এরই নাম মেলবন্ধন। এই ব্যবস্থায় সমমেলের বাইরে কুলীনদের বিবাহ নিষিদ্ধ হল। জাতিগত, কুলগত ও শ্রোত্রিয়গত এই তিনপ্রকার দোষে মেল হত। দেবীবরের এই 'মেলবন্ধন' প্রচলিত হবার আগে কুলীনদের পরস্পরের মধ্যে বিয়ে হত, যাকে 'সর্বদ্বারী বিবাহ' বলা হয়। কিন্তু পরবর্তীকালে অনেক অল্পঘরের মধ্যে 'মেলবন্ধন' হওয়াতে কুলীনের ঘরে 'ঠেকা মেয়ে'র সংখ্যা গেল বেড়ে, আর ঘরে ঘরে দেখা দিল 'শতেক বিধবা হয় একের মরণে'—এই কাব্যপঙ্‌ক্তির বাস্তব রূপ।

সমাজ ভরে গেল অনাচার আর দুর্নীতিতে। কৌলীন্যের ফলে একদিকে বালিকার

সঙ্গে বৃদ্ধের বিবাহ, অন্যদিকে বিগতযৌবনার সঙ্গে বালকের বিবাহ হতে লাগল। বৃদ্ধের তরুণী ভার্যা লাভ তো অতিপরিচিত ঘটনা, উলটোটাও ঘটত। অনেকসময়ই সাত/আট বছরের ছেলের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া হত চল্লিশ/পঞ্চাশ বছরের মেয়ে। এর পরিণতি অনেকসময় হত মর্মান্তিক। ১৯ জুন, ১৮৮৫-তে 'এডুকেশন গেজেটে' এই ধরনের একটি সংবাদে দেখি, 'বরিশালের এক প্রাপ্তবয়স্কা রমণীর সহিত এক শিশুর বিবাহ হওয়াতে স্ত্রীলোকটি উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিয়াছে।' এমনও শোনা যায়, কোনো-কোনো গৃহকর্তা পাত্রের অভাবে তাঁর সমস্ত অবিবাহিতা ভগ্নী ও কন্যাদের একই কুলীনের হাতে সমর্পণ করতেন। অনেক কুলীনকন্যা বিয়ের রাতেই প্রথম ও শেষবারের মতো স্বামীর মুখ দেখতেন। ভাগ্যবতী যাঁরা, তাঁরা বিবাহবাসরের পর সহমরণে যাবার সময় দ্বিতীয়বার এই সুযোগ পেতেন। শেষনিঃশ্বাস ফেলা পর্যন্ত কুলীনদের বিয়ে করার ব্যাপারটা গল্পকথা নয়। অনেকে আবার বিবাহরাত্রে স্ত্রীর কাছে আলাদা অর্থ উপহার না পেলে একশয্যায় শুতে অস্বীকার করত। বিয়ের পর কুলীনরা বউয়ের বিশেষ খোঁজখবর রাখত না। এসবের ফলে সমাজে ব্যভিচার বৃদ্ধি পাচ্ছিল। অনেক কুলীনকন্যা কুলত্যাগ করতেন, তাঁদের শেষ আশ্রয় হত কলকাতার বিভিন্ন বেশ্যাপল্লী। কুলীনরা অবশ্য এসব ছোটখাটো ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাত না। ব্যভিচার তাদের কাছে কোনো ব্যাপারই নয়। তারা বলত 'আমরা কুলীনের ছেলে, আমাদের লজ্জা কি? আমরা কুলীন গঙ্গার তুল্য পবিত্র, গঙ্গায় যেমন বিষ্ঠা মড়া প্রভৃতি নানাবিধ ঘৃণাজনক দ্রব্য পতিত হইলেও তিনি অপবিত্র হন না। আমরাও তদ্রূপ।'[১২৩] গ্রামাঞ্চলের কথা বাদই দিলাম, কলকাতা ও তার আশেপাশেও শতপত্নীক কুলীন ব্রাহ্মণরা উনিশ শতকের প্রথমার্ধেও দাপটের সঙ্গে ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছিল। চালালেও, তাদের কাজকর্মের প্রতি বিতৃষ্ণার মনোভাব শিক্ষিত শহরবাসীর মনে পুঞ্জীভূত হতে থাকে। আর তাঁদের সেই ক্ষোভ উনিশ শতকের তিরিশের দশক থেকেই বিভিন্ন সংবাদ-সাময়িকপত্রের পৃষ্ঠায় কিভাবে ভাষা পাচ্ছিল, তা আমরা দেখে এসেছি।

শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধেও পত্রপত্রিকাগুলিতে কৌলীন্যপ্রথা সমালোচনার ধারা অব্যাহত থাকে। ১৮৫১-য় 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' একটি সম্পাদকীয় নিবন্ধে বহু দার পরিগ্রহের প্রথাকে 'এদেশের অসৌভাগ্য ও দুরবস্থার একটা প্রধান কারণ' হিসাবে চিহ্নিত করে বলে 'এই প্রথায় অনেক কুলাঙ্গনা ব্যভিচারিণী ও ভ্রূণ হত্যাকারিণী হইয়া থাকে এ প্রথা এদেশের শাস্ত্রানুশিষ্ট নয়।' কাজেই সরকার অনায়াসেই আইন করে এ-প্রথা বন্ধ করে দিতে পারেন।[১২৪] এর কয়েকমাস পরে হুগলি কলেজের এক ছাত্র আইন করে এই কুপ্রথাকে নিষিদ্ধ করার জন্য সরকারকে আহ্বান জানান।[১২৫] সমকালেই 'বেঙ্গল হরকরা'তে এক পত্রলেখক কৌলীন্যপ্রথার বীভৎস দিকটি তুলে ধরেন। পত্রপত্রিকায় এইসব লেখালিখির পাশাপাশি এইকালের বিদ্বৎসভাগুলিও এই প্রথার নিন্দাবাদে মুখর হয়ে ওঠে। হরচন্দ্র দত্ত 'বেথুন সোসাইটি'তে এক প্রবন্ধ পাঠ

করে এর লজ্জাজনক দিকটি তুলে ধরলেন। এর কিছুদিন পরে ১৮৫৫-র গোড়ার দিকে কিশোরীচাঁদ মিত্রের উদ্যোগে 'বন্ধুবর্গ সমবায়' নামক সভার পক্ষ থেকে বহুবিবাহ আইন করে বন্ধ করার জন্য ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সমাজে এক আবেদনপত্র পাঠানো হয়। এটি পেশ করা হলে ব্রাহ্মণদের মধ্যে চাঞ্চল্য দেখা যায়। এই সমাজের প্রভাবশালী কিছু ব্যক্তি এই প্রথায় হস্তক্ষেপ না করার জন্য সরকারের কাছে আবেদন জানানোর উদ্দেশ্যে কুলীনদের এক সভা আহ্বানের ইচ্ছা নিয়ে হিন্দু মেট্রোপলিটন কলেজে দুটি প্রারম্ভিক বৈঠকে মিলিত হন।[১২৬] এরপর 'বহুবিবাহ শাস্ত্রসম্মত কার্য, তাহা রহিত হইলে হিন্দুদিগের ধর্মলোপ হইবেক, অতএব এ-বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের হস্তক্ষেপ করা বিধেয় নহে'—এই মর্মে রক্ষণশীল হিন্দুদের পক্ষ থেকে রাধাকান্ত দেবের নেতৃত্বে ১৬৩৮ জনের স্বাক্ষরযুক্ত একটি পাল্টা আবেদনও পেশ করা হয়। ক্রমবর্ধমান চেতনার ফলে প্রথাটি যখন লুপ্তপ্রায়, তখন আইন করে এ-প্রথা নিষিদ্ধ করার কোনো প্রয়োজন নেই—এই মর্মে 'হিন্দু ইনটেলিজেন্সার'-এর সম্পাদকীয়তে বক্তব্য রাখলেন কাশীপ্রসাদ ঘোষ।[১২৭]

কিশোরীচাঁদের আবেদনটি পেশ করার অল্পদিন পরেই ১৮৫৫-র মার্চ মাসের গোড়ার দিকে প্রসন্নকুমার ঠাকুর কৌলীন্যপ্রথা রদকল্পে ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সমাজের বিবেচনার জন্য একটি আইনের খসড়া পেশ করেন। এই প্রস্তাবটি পেশ করার কয়েকমাস পরে ২৭ ডিসেম্বর, ১৮৫৫-য় বিদ্যাসাগর এই প্রথা নিবারণের জন্য একটি আইন প্রণয়ন করতে ভারত সরকারের কাছে একটি আবেদনপত্র পাঠান। এতে কুলীন ব্রাহ্মণদের সম্বন্ধে বলা হয়:

'There is a class of Brahmins in Bengal, called coolins, with whom the sacred rite of matrimony has been notoriously degraded to a system of shameful traffic. These men, for the sordid gain of some paltry sum visit village after village, accepting the hands of scores of maidens the great majority of whom are destined never to enjoy the blessing of a wedded life. It is easier to conceive than to describe, the enormous evils, which must result from a system so revolting to justice and humanity.'[১২৮]

এরপর বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বহুবিবাহের বিরুদ্ধে একের পর এক আবেদন আসতে শুরু করে। কিশোরীচাঁদ, প্রসন্নকুমার ও বিদ্যাসাগরের আবেদন ছাড়া, ১৮৫৬-র জুলাই মাসের মধ্যে সরকারের কাছে বহুবিবাহের বিরুদ্ধে যেসব আবেদনপত্র পাঠানো হয়েছিল সেগুলি হল:

(১) বর্ধমানের মহারাজার আবেদন;
(২) নদীয়ার রাজার আবেদন;
(৩) কলকাতার অধিবাসীদের আবেদন;

(৪) কলকাতার ট্যাঁকশালের হিন্দু কর্মচারীদের আবেদন ;
(৫) ভবানীপুর ও আলিপুরের অধিবাসীদের আবেদন ;
(৬) হুগলির কাশীশ্বর মিত্র ও অন্যান্যদের আবেদন ;
(৭) হুগলির অন্নদাপ্রসাদ ব্যানার্জি ও অন্যান্যদের আবেদন ;
(৮) হুগলির শিবনারায়ণ রায় ও অন্যান্যদের দু'টি আবেদন ;
(৯) কৃষ্ণনগরের অধিবাসীদের আবেদন ;
(১০) জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও অন্যান্যদের আবেদন ;
(১১) আঁটপুরের অধিবাসীদের আবেদন ;
(১২) বর্ধমানের অধিবাসীদের আবেদন ;
(১৩) বর্ধমানের সারদাপ্রসাদ রায় ও অন্যান্যদের আবেদন ;
(১৪) বর্ধমানের পূর্ণচন্দ্র ব্যানার্জি ও অন্যান্যদের আবেদন ;
(১৫) নদীয়ার রামলোচন ঘোষ ও অন্যান্যদের আবেদন ;
(১৬) শান্তিপুরের ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষাল, উমেশচন্দ্র রায় ও অন্যান্যদের আবেদন ;
(১৭) নদীয়ার সারদাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও অন্যান্যদের আবেদন ;
(১৮) মেদিনীপুরের অধিবাসীদের দু'টি আবেদন ;
(১৯) যশোরের অধিবাসীদের আবেদন ;
(২০) ঢাকার অধিবাসীদের আবেদন ;
(২১) মুর্শিদাবাদের অধিবাসীদের আবেদন ;
(২২) রাজসাহির অধিবাসীদের আবেদন ;
(২৩) বাঁকুড়ার অধিবাসীদের আবেদন ;
(২৪) দিনাজপুরের অধিবাসীদের আবেদন ;
(২৫) ময়মনসিংহের অধিবাসীদের আবেদন ;
(২৬) শান্তিপুর ও নিকটবর্তী অঞ্চলের হিন্দুদের দু'টি আবেদন ;
(২৭) কলকাতার অধিবাসীদের আর একটি আবেদন ;
(২৮) জানবাজারের রাসমণি দাসীর আবেদন ;
(২৯) কাশিমবাজারের রানি স্বর্ণময়ীর আবেদন ;
(৩০) বরানগরের হিন্দু অধিবাসীদের আবেদন।[১২৯]

নাটোরের রাজা প্রসন্ননাথও এ-প্রথার বিরুদ্ধে আবেদন করেন। বহুবিবাহ বিরোধী এই আবেদনপত্রগুলিতে প্রায় হাজার পঁচিশেক লোকের সই ছিল। এ-বিষয়ক এক আইনও শীঘ্রই পাশ হবে—একথা অনেকে ধরেই নিয়েছিলেন। ২৫ নভেম্বর, ১৮৫৬-র 'সম্বাদ ভাস্কর' এক সম্পাদকীয় নিবন্ধে খোলাখুলি লেখে 'বহুবিবাহ নিবারণীয় রাজবিধান হবেই হবে ইহাতে সন্দেহ নাই।' ১৮৫৭-তে ভারতব্যাপী বিদ্রোহের আগুন জ্বলে না উঠলে এই সময়ই বহুবিবাহ নিবারিত হত এবং বিদ্যাসাগরই হতেন তার

নায়ক—১৮৬৫ সালে বহুবিবাহ নিবারণ প্রসঙ্গে বক্তব্য রাখতে গিয়ে 'ফ্রেন্ড অব ইন্ডিয়া' সেকথাই বলে ঃ

'The leader of this large class, whom we may term the 'broad' Hindoos, is the most distinguished Bengali writer and Sanskrit scholar of the present time, Pundit Ishur Chunder Vidyasagar. To him is due the Act which removes all legal obstructions to the re-marriage of widow. And but for the mutiny that Act would certainly have been followed by another, drawn up at his suggestion to check the abuses of Hindoo polygamy.'[১৩০]

১৮৫৭-র বিদ্রোহ শুরু হওয়ায় শেষপর্যন্ত কিছুই আর হল না। বিদ্যাসাগরের ভাষায় 'বহুবিবাহ নিবারণ বিষয়ে আর তাহাদের মনোযোগ দিবার অবকাশ রহিল না।'

সংস্কারকরা তাই বলে হাল ছাড়লেন না। কয়েকবছরের মধ্যে আবার তাঁরা বহুবিবাহ নিবারণে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। ১৮৬৩-র মাঝামাঝি সময়েই বহুবিবাহ নিবারণের প্রশ্নটি নিয়ে বাঙালিসমাজ নতুন করে চিন্তিত হয়ে উঠল। ১৮৬৩-র অক্টোবর মাসে প্রাণনাথ চট্টোপাধ্যায় ও অন্যান্যরা বহুবিবাহ নিবারণের জন্য সরকারকে একটি আইন প্রণয়ন করতে অনুরোধ জানালেন। এর কদিন পরেই দুর্গাচরণ নন্দী ও অন্যান্য কিছু মানুষ এ-সম্পর্কে আর একটি আবেদন পেশ করলেন। এই সময়ই আইনের সাহায্যে এ-প্রথা দমন করা ঠিক হবে কিনা সে নিয়েও মতভেদ দেখা দিল। একালের বিশিষ্ট পত্রিকা 'সোমপ্রকাশ' বহুবিবাহ নিবারণের জন্য প্রেরিত আবেদনগুলি সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে লেখে ঃ

'এদেশের কতকগুলি সুশিক্ষিত লোক বহুবিবাহ প্রথা নিবারণ প্রার্থনায় ব্যবস্থাপক সভায় এই আবেদন করিয়াছেন, তদ্বিষয় লইয়া বহুতর আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে। কেহ কেহ ইহার সপক্ষ, কেহ কেহ বা ইহার বিপক্ষ হইয়াছেন। বহুবিবাহ প্রথা যে অতিশয় কুৎসিত, ইহা হইতে এদেশের যে বহুতর অনিষ্ট ঘটিতেছে, তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র বক্তব্য নাই।…ইহা এদেশ হইতে যতশীঘ্র অন্তর্হিত হয়, ততই মঙ্গলের বিষয়। কিন্তু আবেদনকারিরা যেরূপে ইহার উন্মূলন চেষ্টা পাইতেছেন, তাহা যুক্তিসিদ্ধ কিনা তদ্বিষয়ের বিবেচনা করা আবশ্যক।

'গবর্ণমেণ্টের সাহায্য লইয়া এই বিষয় রহিত করা হয়, ইহা অনেকের অনভিমত। আমরাও এ অংশে তাঁহাদিগের বক্তব্য অনুমোদন করিতেছি। গভর্ণমেণ্টের লৌহময় দণ্ডের সাহায্য লইয়া আজিও যদি আমাদিগকে সমাজ সংস্কার করিতে হয়, আমাদিগের কি লেখাপড়া শিক্ষা হইল। ইহা কি এদেশের অজ্ঞতা ও সৎক্রিয়াসাহসের অজ্ঞতার পরিচয় দিতেছে না। গবর্ণমেণ্টের সাহায্য লইয়া এ-বিষয়ের পরিবর্তন চেষ্টা করা পরামর্শ সিদ্ধ হয় না।'[১৩১]

পত্রপত্রিকায় যখন এইসব লেখালিখি চলছে, তখনই বিদ্যাসাগর নতুন করে

বহুবিবাহ নিবারণ বিষয়ে আগ্রহী হয়ে উঠলেন। অল্পদিনের মধ্যেই বহুবিবাহ বিরোধী আন্দোলনের নেতৃত্বের আসনটিও তাঁর দখলে চলে এল। সমকালেই 'ফ্রেন্ড অব ইন্ডিয়া' তাঁকে বহুবিবাহ বিরোধী উদারপন্থী হিন্দুদের নেতা হিসাবে চিহ্নিত করে। বহুবিবাহের বিরুদ্ধে জনমত ক্রমেই প্রবল হয়ে উঠছে দেখে রক্ষণশীলরা সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলেন। রক্ষণশীল হিন্দু নেতা রাধাকান্তের উদ্যোগে ১. ১. ১৮৬৬-তে সরকারকে এ-বিষয়ে কোনো আইন না-করার আবেদন জানানো হল। সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যাসাগরও সরকারের কাছে পালটা এক আবেদনপত্র পেশ করতে উদ্যোগী হলেন, পাশে পেলেন কৃষ্ণনগরের মহারাজা সতীশচন্দ্রকে। বিদ্যাসাগরের আবেদনটিতে ধনী-দরিদ্র, শিক্ষিত-অশিক্ষিত নির্বিশেষে হাজার হাজার মানুষ সই করলেন। বিদ্যাসাগরের উদ্যোগে প্রস্তুত এই আবেদনপত্রটি সম্পর্কে 'হিন্দু পেট্রিয়ট' মন্তব্য করে ঃ

'After the lapse of a decade a fresh agitation has been organized under the auspices of that ardent advocate of social reform, Pundit Eswar Chunder Vidyasagar, for the restriction of the abuses of koolin polygamy. The appeal which he has initiated has been endorsed by all sections of the Hindoo community of Bengal, the wealthy, the learned, the orthodox as well as the enlightened.'[১৩২]

বিদ্যাসাগরের উদ্যোগে এই ধরনের একটি আবেদনপত্রের প্রস্তুতির কথা শুনে, আইনের সাহায্যে এ-প্রথা নিবারণে অনাগ্রহীর দল বলতে লাগলেন, কৌলীন্যের অত্যাচার গত কয়েক বছরের মধ্যে খুব কমে গেছে, শিক্ষিত মানুষরা এ-প্রথার নিন্দা করছেন এবং জনমতও এ প্রথার বিরুদ্ধে—কাজেই শিক্ষার প্রসার ও সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে-সঙ্গে এ প্রথা আপনা থেকেই লোপ পাবে। 'পেট্রিয়ট'-সম্পাদক পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসারের ফলে এ-বিষয়ক কুফল অনেকটাই হ্রাস পেয়েছে স্বীকার করে নিয়েও প্রশ্ন তোলেন, বিবাহ ব্যবসায়ী কুলীনদের কাছে কি শিক্ষার আলো সেইভাবে পেঁছেছে যার ফলে তারা একটি স্ত্রীতেই সন্তুষ্ট থাকবে? 'পেট্রিয়ট' খবর দিল, বিষয়টি নিয়ে বিদ্যাসাগর বিশেষভাবে অনুসন্ধান করছেন এবং খুব শীঘ্রই তাঁর অনুসন্ধানের ফল তিনি প্রকাশ করবেন। পত্রিকাটি আরো জানাল, বিদ্যাসাগর মনে করেন, কৌলীন্য-প্রথার অত্যাচার এখনও আগের মতই প্রবল (**'He maintains that the evils of koolin polygamy are as rampant now as ever.'**)।[১৩৩]

বিদ্যাসাগরের রঙ্গমঞ্চে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে এ-প্রথায় কোনোরকম হস্তক্ষেপের বিরোধীরা নানা কথা রটাতে শুরু করলেন। কখনও প্রচার করলেন ব্যাপারটা খ্রিস্টানি এক ষড়যন্ত্র ছাড়া আর কিছু নয়, আন্দোলনের লক্ষ্য আসলে হিন্দুদের ধর্ম নষ্ট করা। কখনও আবার বললেন, গোটা ব্যাপারটাই হচ্ছে সাজানো—জনগণের সঙ্গে এর কোনো যোগ নেই। এসব অপপ্রচার বন্ধ করার জন্য প্যারীচরণ সরকার সম্পাদিত 'ওয়েলউইশার' জানাল, এই আন্দোলনের নেতৃত্বে রয়েছেন এমন একজন

মানুষ, যাঁর নামটুকুই এ ধরনের সমস্ত সংশয়ের মূলোচ্ছেদ করার পক্ষে যথেষ্ট। পত্রিকাটি লিখল :

'The very name of the individual, who heads the present movement ought to have at once silenced every suspicion of anything ungenerous lurking at the bottom, or remaining otherwise to contact with it. It is no longer a secret that Pundit Eswara Chandra Vidyasagara better known, perhaps, as "the female's friend" than for his extraordinary powers and other noble qualities, undertook to bring up the question in its present form to the notice of government, who does not know that if it had not been purely a work of love, it could not have gained admission into the sacred precincts of his heart. There may be some prejudiced adorers of custom, or narrow minded idolators of self importance, who may not appreciate the principles of Vidyasagar's conduct, often too high for their comprehension, or who may not quite relish the fame he has so justly acquired by his learning and benevolence, or who may feel in their interest to throw impediments in the way of one who, they really apprehend, will fight out this second battle for our females with the same success that attended him a few years ago, when he stood forward as the champion of Hindu widows.'[১৩৪]

একদিকে যখন চলছে লেখালিখি, অন্যদিকে বিদ্যাসাগর তখন বহুবিবাহের বিরুদ্ধে স্বাক্ষর সংগ্রহ করে চলেছেন। তাঁর উদ্যোগে মাত্র তিন সপ্তাহের মধ্যে সরকারের কাছে পেশ করার জন্য প্রস্তুত আবেদনপত্রটিতে প্রায় ২১,০০০ জনের সই সংগ্রহ করা হল। আবেদনটি সরকারের কাছে পেশ করার জন্য ১৮৬৬-র ১৯ মার্চ একটি প্রতিনিধিদল ছোটলাট বিডনের সঙ্গে দেখা করলেন। এই দলে অন্যান্যদের সঙ্গে বিদ্যাসাগরও ছিলেন। প্রতিনিধিদের বক্তব্য শোনার পর বিডন বহুবিবাহ নিবারণের জন্য সরকারের পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দেন। এই সাক্ষাৎকারের পরই বিদ্যাসাগরের প্রচেষ্টায় সরকার বহুবিবাহ রদে ব্যবস্থা নিতে যাচ্ছেন এই মর্মে 'ফ্রেন্ড অব ইন্ডিয়া' এক সম্পাদকীয় লিখে বসল। পত্রিকাটি বলল :

'Pundit Ishwar Chunder Vidyasagur to whom, mainly, India is indebted for the widow marriage Act, has succeeded in securing such an expression of orthodox and learned Hindoo opinion in favour of some restraint on polygamy, that Mr. Beadon has plead-ged himself to introduce a Bill into the next session of imperial

legislature. The list of names appended to the memorial contains no less than 21,000 signatures, each intelligent and bonafide. Among them are the highest in rank, learning, wealth and sanctity in Bengal and opposed to the movement is only one family which has ceased to represent any but itself since Rajah Radhakant Dev retired from public life. Even the cloudy retreats of the Sanskrit 'toles' in Nuddea have sent forth a sound against the most monstrous perversion of Hindoo law which annually exposes hundreds of widows and wives to prostitution in Bengal.'[১৩৫]

'ফ্রেন্ড অব ইন্ডিয়া' এসব কথা লেখার কিছুদিনের মধ্যে প্রাদেশিক সরকারের পক্ষ থেকে বহুবিবাহ সম্পর্কে একটি বিল আনার জন্য ভারত সরকারের অনুমতি চাওয়া হল।

অনুমতি কিন্তু পাওয়া গেল না। ভারত সরকারের মনোভাব জানার পর প্রাদেশিক সরকার বহুবিবাহ সম্পর্কে প্রকৃত অবস্থা জানার জন্য একটি তদন্ত কমিটি গঠন করলেন। কমিটির অন্যতম সদস্য নির্বাচিত হলেন বিদ্যাসাগর। কমিটিতে অন্য দেশীয় সদস্যদের মধ্যে রইলেন জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, সত্যশরণ ঘোষাল, দিগম্বর মিত্র ও রমানাথ ঠাকুর। অনুসন্ধান শেষে কমিটি বললেন, গত কয়েকবছরে বিষয়টি সম্পর্কে হিন্দুদের মনোভাবের যথেষ্ট পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেছে, একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করাকে সমাজ এখন ভালোচোখে দেখে না। শিক্ষা ও জ্ঞানের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে এই প্রথা আপনা থেকেই লোপ পাবে—আইনের সাহায্য প্রয়োজন হবে না।

হতাশ হলেন বিদ্যাসাগর। আইনের সাহায্যে এই প্রথা নিবারণের পক্ষে জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের মতো যাঁরা একদা সম্মতি দিয়েছিলেন, তাঁদের এই পরিবর্তিত মনোভাব তাঁকে বিস্মিত করল। তাই বলে হাল তিনি ছাড়লেন না। কমিটির সদস্যদের সঙ্গে মতভেদের কথা স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন। আইনের সাহায্য ছাড়া বহুবিবাহ যে বন্ধ করা যাবে না—এই বিশ্বাসে তখনও তিনি অটল।

কমিটির রিপোর্ট পাবার পর সরকার সিদ্ধান্ত নিলেন, বর্তমানে এ-বিষয়ে কোনো আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজন নেই। এই সংবাদ কানে আসার সঙ্গে-সঙ্গে বিদ্যাসাগরকে কিঞ্চিৎ উপদেশ দেবার লোভ সামলাতে না পেরে সমকালীন একটি পত্রিকা 'ন্যাশনাল পেপার' লিখল:

'We hope after this final dictum of the secretary of state, the leader of the polygamy abolition movement, will cease to exercise any amount of energy in this direction, which may be best devoted to improving the vernacular Literature of the country, which as yet does not boast of any original work from his able pen.'[১৩৬] সমাজ

সংস্কার নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে ব্যাপারটা ব্রাহ্মসমাজের ওপর ছেড়ে দেবার পরামর্শ দিতেও পত্রিকাটি ভুলল না।

'ন্যাশনাল পেপার-'এর সম্পাদক নবগোপাল মিত্র বিদ্যাসাগরকে চিনতে পারেন নি। অর্ধসমাপ্ত অবস্থায় কোনো কাজ ছেড়ে দেবার মানসিকতা এইসময়ে বিদ্যাসাগরের ছিল না। ছিল না বলেই বছরচারেক পরে বহুবিবাহ বিরোধী আন্দোলনে আবারও সর্বশক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে বিন্দুমাত্র ইতস্তত করলেন না তিনি। কিন্তু এই ঝাঁপিয়ে পড়ার পেছনে রীতিমতো চিত্তাকর্ষক এক নেপথ্য কাহিনী আছে।

হাওড়ার শালকেতে লক্ষ্মীনারায়ণ মুখোপাধ্যায় নামে এক কুলীন ব্রাহ্মণের বাস। সরকারের অর্ডিনান্স বিভাগে কেরানির কাজ করতেন তিনি, বেতন মাসিক ৬০ টাকা। কুলীনের সন্তান হিসাবে এক এক করে গুটিছয়েক বিয়েও করেন। কুলীন ব্রাহ্মণদের রীতি অনুযায়ী বিয়ের পরে বউ বাঁচল কি মরল সে খবর তিনি রাখতেন না। তাদের ভরণ-পোষণের ব্যাপারেও তিনি ছিলেন উদাসীন। ব্যাপারটা অন্য সবাই মেনে নিলেও, লক্ষ্মীনারায়ণের ছোট বউ কৃষ্ণমণি মানলেন না। খোরপোষের দাবিতে হাওড়া মুন্সেফ কোর্টে লক্ষ্মীনারায়ণের নামে নালিশ করলেন তিনি। মামলায় জয়ী হয়ে খোরপোষ বাবদ মাসিক ১৫ টাকার ডিক্রিও পেলেন। কিন্তু আদালতের আদেশ অনুযায়ী কাজ না হওয়ায়, আদালতের ডিক্রিকে কার্যকর করার জন্য কৃষ্ণমণির পক্ষ থেকে হাইকোর্টে আবেদন জানানো হল। আবেদনটি পাবার পরই বিচারপতি নর্মান লক্ষ্মীনারায়ণকে আদালতে হাজির করার নির্দেশ দিলেন পুলিশকে। ১৮৭০-এর ১ জুলাই তাঁকে গ্রেপ্তার করে নর্মানের এজলাসে হাজির করা হল।[১৩৭] আদালতে আত্মপক্ষ সমর্থনে লক্ষ্মীনারায়ণ বলেন, 'হিন্দু শাস্ত্রানুসারে কুলীনকে স্ত্রীর ভরণ-পোষণ করিতে হয় না। আমার ছয় ছয় স্ত্রী, আমি কি প্রকারে প্রতিপালন করিব?' জজসাহেব বলিলেন, 'তুমি যদি খাওয়াতেই না পারিবে তবে বিবাহ করিলে কেন, এক্ষণে জেলে যাও। প্রত্যহ চার আনা করিয়া খোরাকি পাইবে।'[১৩৮]

লক্ষ্মীনারায়ণের ঘটনাটি সমকালে প্রচণ্ড আলোড়ন সৃষ্টি করে। কেউ কেউ এই কাজের জন্য কৃষ্ণমণিকে অভিনন্দন জানায়। 'ইন্ডিয়ান মিরর'-এ এক পত্রপ্রেরক লিখলেন, যেসব কুলীন মেয়ে স্বামীর কাছে খোরপোষের দাবি জানাতে চান, তাঁদের সাহায্যের জন্য একটি সভা হলে বহুবিবাহ আপনা থেকে বন্ধ হয়ে যাবে। 'বেঙ্গলি' লিখল, এই ন্যায়সঙ্গত সিদ্ধান্তের জন্য হাজার হাজার মানুষের আশীর্বাদ নর্মানের ওপর বর্ষিত হচ্ছে এবং এই আদেশের ফলে কৌলীন্যের মতো লজ্জাজনক কুপ্রথার হাত থেকে জনগণ রেহাই পাবে। ভিন্নমতাবলম্বী লোকও যে ছিলেন না তা নয়। তাঁরা কৃষ্ণমণির কাজকে পছন্দ করলেন না—হাজার হোক স্বামী তো! এমনকি 'বঙ্গমহিলা'র মতো মহিলা-সম্পাদিত পত্রিকাও স্বামীকে অপদস্থ করার জন্য কৃষ্ণমণির সমালোচনা করে।

কৃষ্ণমণির দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হয়ে ঢাকায় বিধুমুখী নামে একটি কুলীনকন্যা বহুবিবাহকারক এক পাত্রকে বিয়ে করতে অস্বীকার করেন। কুমুদিনী নামে সপ্তগ্রামের এক কুলীনকুমারী আক্ষেপ করে লেখেন, 'শতজন্ম অরণ্যচারিণী হরিণী হয়ে থাকি, তাহাও ভাল, তথাচ যেন বঙ্গদেশে কুলীনের ঘরে মেয়ে হয়ে জন্মাতে না হয়।' এই সময়ই ফরিদপুর ছোট আদালতের জজ কালীকিঙ্কর রায় বহুবিবাহ নিবারণের জন্য ফরিদপুরে একটি সভা স্থাপন করেন। ঢাকার জানকীনাথ রায় ঘোষণা করলেন, 'স্বামীর নিকট হইতে অন্নবস্ত্র পান না এমন কোন কুলীন পত্নী যদি তজ্জন্য স্বামীর নামে নালিশ করেন, তিনি ঐ স্ত্রীলোককে দুইশত টাকা দিবেন।'[১৩৯]

এই পরিস্থিতিতে 'সনাতন ধর্মরক্ষণী সভা' একটি বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে। সনাতন ধর্ম রক্ষাকল্পে ১২৭৫-এর ১১ ফাল্গুন সভাটির জন্ম। সম্পাদক ছিলেন চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়। রক্ষণশীলদের মিলনক্ষেত্র হলেও সামাজিক কোনো কোনো সমস্যা সম্পর্কে এই সভার কিছু কিছু সদস্যের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল উদার। বহুবিবাহ ও কন্যাপণের বিরোধিতা করা ছাড়াও সভার এইসব সদস্য শিক্ষার জন্য কেউ কালাপানি পেরোলে তাকে জাতিচ্যুত না করার ও কলের জল ব্যবহারের পক্ষপাতী ছিলেন। বিচারপতি নর্মানের আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে মুক্তমনা এইসব সভ্যের আগ্রহে 'সনাতন ধর্মরক্ষণী সভা' কৌলীন্যপ্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। অনিষ্টকর এই প্রথা দূর করার জন্য 'রাজবিধির সহায়তা গ্রহণ করা একান্ত আবশ্যক'—এই মত সভার অধিকাংশ সদস্য মেনে নেন। পাথুরিয়াঘাটার খেলাতচন্দ্র ঘোষের বাড়িতে অনুষ্ঠিত এক সভায় দীর্ঘ আলোচনার পর ঠিক হল, বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে এ-বিষয়ে পণ্ডিতদের মত গ্রহণ করা কর্তব্য। পণ্ডিতদের মতামত জানার পর সভা এ-বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।

চোখের সামনে এতসব ঘটনা ঘটতে দেখে বিদ্যাসাগর চুপ করে বসে থাকতে পারলেন না। ১৮৬৬-তে বহুবিবাহ নিবারণের জন্য রাজদ্বারে আবেদন পেশ করার সময় বিরোধীদের আপত্তি খণ্ডন করে বিদ্যাসাগর একটি বই ছাপতে শুরু করেন। কিন্তু বহুবিবাহ সম্পর্কে কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হবার পর আন্দোলন বন্ধ হয়ে যাওয়ায় ও শারীরিক অসুস্থতার জন্য বইটি দীর্ঘদিন অর্ধমুদ্রিত অবস্থায় পড়ে থাকে। বহুবিবাহের বিরুদ্ধে 'সনাতন ধর্মরক্ষণী সভা'র উৎসাহ দেখে বিদ্যাসাগর তাঁর বইটি মুদ্রণের কাজ সমাপ্ত করে প্রচার করেন। 'বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব'-এর বিজ্ঞাপনে তিনি পরিষ্কারভাবে বললেন :

'সম্প্রতি শুনিতেছি, কলিকাতাস্থ সনাতন ধর্মরক্ষিণী সভা বহুবিবাহ নিবারণ বিষয়ে বিলক্ষণ উদ্যোগী হইয়াছেন; তাহাদের নিতান্ত ইচ্ছা, এই অতি জঘন্য, অতিনৃশংস প্রথা রহিত হইয়া যায়। এই প্রথা নিবারিত হইলে, শাস্ত্রের অবমাননা ও ধর্মের ব্যতিক্রম ঘটিবেক কিনা, এই আশঙ্কার অপনয়নার্থে, সভার অধ্যক্ষ মহাশয়েরা

ধর্মশাস্ত্রব্যবসায়ী প্রধান প্রধান পণ্ডিতের মত গ্রহণ করিতেছেন, এবং রাজদ্বারে আবেদন করিবার অপরাপর উদ্যোগ দেখিতেছেন। তাঁহারা সদভিপ্রায় প্রণোদিত হইয়া, যে অতি মহৎ দেশহিতকর ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, হয়ত সে বিষয়ে তাঁহাদের কিছু আনুকূল্য হইতে পারিবেক, এই ভাবিয়া, আমি পুস্তক মুদ্রিত ও প্রচারিত করিলাম।'

১৮৬৬-তে বিদ্যাসাগর বহুবিবাহের বিরুদ্ধে আবেদন করার পর, বিরুদ্ধবাদীর দল যেসব কথা বলেছিল, বিদ্যাসাগরের বইটি বেরোনোর পর এবারও তারা সেইসব কথা বলতে শুরু করায়, ক্ষুব্ধ কেশবচন্দ্র সেন 'সুলভ সমাচার'-এ লিখলেন :

'কয়েক বৎসর পূর্বে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উদ্যোগে বহুবিবাহ নিবারণ করিবার নিমিত্ত, অনেক ভদ্রলোকে গবর্ণমেণ্টের নিকট একখানি দরখাস্ত পাঠাইয়াছিলেন। দরখাস্তখানি পেঁছিতে না পেঁছিতে চারিদিক থেকে কি হইল কি হইল বলিয়া চেঁচাইতে আরম্ভ করিল। দুই চারিখানা বড়বড় খবরের কাগজ চিৎকার করিতে আরম্ভ করিল। সম্পাদক ভায়ারা তাঁহাদের এই বাঁধা গৎ ছাড়িতে লাগিলেন যে দেশের কুসংস্কার আমরা নিজেই সংশোধন করিব, দেশের কুপ্রথা আমরা নিজেই উঠাইয়া দিব, গবর্ণমেণ্ট সামাজিক বিষয়ে হাত দিবেন কেন? তবে আর দেশের গৌরব রহিল কোথায়। আইনের সাহায্য লইয়া দেশের কুরীতি সংশোধন করিবার চেষ্টা কাপুরুষের ধর্ম।

'সম্প্রতি আবার সনাতন ধর্মরক্ষণী সভা গবর্ণমেণ্টের সাহায্য লইয়া, বহুবিবাহ নিবারণের মানস করিতেছেন এই সুযোগে পণ্ডিতবর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় অনেক শাস্ত্রের প্রমাণ দিয়া, বহুবিবাহ যে শাস্ত্রবিরুদ্ধ, সেই বিষয়ে একখানি পুস্তক লিখিয়াছেন। এই সময়ে আবার কতকগুলিন খবরের কাগজের সম্পাদক মহাপুরুষেরা সেই পুরাতন কান্না কাঁদিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

'সুশিক্ষিত দলই আমাদের দেশের উন্নতির কণ্টকস্বরূপ, ইহারাই দেশের সর্বনাশ করিলেন। ইহাঁদের ভাল করিবার কোন যোগ্যতা নাই, কিন্তু মন্দ করিবার বিলক্ষণ ক্ষমতা আছে। লেখাপড়া শিখিয়া ইহাদের দুষ্ট বুদ্ধিই বাড়িয়াছে। ইহাঁদিগকে দুই চারিটি কথা জিজ্ঞাসা করিয়া আমরা এই প্রস্তাবের শেষ করিতেছি। আচ্ছা তাঁহারা সরলভাবে বলুন দেখি, গবর্ণমেণ্ট আইন জারী করিয়া যদি মহরম নিবারণ না করিতেন, গঙ্গায় ছেলে ফেলে দেওয়া যদি আইনের দ্বারা নিবারণ না হইত, বাণফোড়া চড়ক গবর্ণমেণ্ট যদি নিজে না বন্ধ করিতেন, বাঙ্গলা টিকা দেওয়া যদি আইনের দ্বারা নিবারণ না হইত, বিধবাবিবাহ গবর্ণমেণ্টের দ্বারা যদি বিধিবদ্ধ না হইত ; তবে কি তাঁহারা কোন কালে বিদ্যাবুদ্ধির দ্বারা এই সমস্ত কদর্য দেশাচার উঠাইয়া দিতে পারিতেন? যদি তাঁহারা সত্য কথা কহিতে চান, তবে 'না, না' বলিতেই হইবে। তাঁহারা যদি আপন বিশ্বাসের মত কার্য করিতেন, তবে কি আজ আমাদের সমাজ সংশোধন করিবার নিমিত্ত গবর্ণমেণ্টের দ্বারে আইন ভিক্ষা করিতে হইত? তাঁহারা মানুষের মত নহেন বলিয়াই আমাদিগের গবর্ণমেণ্টের নিকট এত লঘুতা স্বীকার করিতে হইতেছে।'[১৪০]

শিক্ষিত ব্যক্তিদের একটা অংশ বিদ্যাসাগরের সংস্কারপ্রয়াসের বিরোধী ছিলেন সন্দেহ নেই, কিন্তু এই সম্প্রদায়ভুক্ত অনেকেই তাঁর মহত্ত্ব স্বীকারে কুণ্ঠাবোধ করতেন না। 'ক্যালকাটা রিভিউ'-এর অজ্ঞাতনামা সমালোচক এমনই একজন। বিদ্যাসাগরের বহুবিবাহ বিষয়ক বইটি সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি বহুবিবাহ-বিরোধী আন্দোলনের এই অবিসংবাদী নায়কের প্রশংসা করে বলেন, রক্ষণশীল হিন্দুরা আইনের সাহায্যে এ-প্রথা নিবারণের বিরুদ্ধে যে সাতটি আপত্তির কথা তোলেন, বইটিতে তার সবকটি খণ্ডন করা হয়েছে। সমালোচক বলেন, বিদ্যাসাগরের সমস্ত বক্তব্যের সঙ্গে তিনি একমত নন, কিন্তু **'it is impossible not to admire the consummate skill with which he has treated the whole subject and we have no doubt that the book will exert a beneficial influence.'**[১৪১]

'ক্যালকাটা রিভিউ' এসব কথা লেখার অল্পদিনের মধ্যে বহুবিবাহ নিবারণের পদ্ধতি সম্পর্কে 'সনাতন ধর্মরক্ষণী সভা'র সদস্যদের মতভেদ তীব্র আকার ধারণ করে। ১৮ বৈশাখ, ১২৭৮-এ খেলাতচন্দ্র ঘোষের বাড়িতে অনুষ্ঠিত সভার এক বৈঠকে এ-বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা হয়। অধিকাংশ সদস্য এ-প্রথা উচ্ছেদের জন্য রাজবিধির পক্ষপাতী হলেও, কয়েকজন আপত্তি জানিয়ে বললেন, 'সহসা রাজবিধির প্রার্থনা করা উত্তম কার্য বোধ হইতেছে না। এ বিষয় গবর্ণমেণ্টের হস্তে অর্পণ করিলে বিস্তর অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা আছে, অতএব ইহাতে আমরা সম্মত হইতে সন্দিহান হইতেছি।'[১৪২] সভাপতি কালীকৃষ্ণ তাঁদের বোঝাবার অনেক চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন। 'সনাতন ধর্মরক্ষণী সভা'র মুখপত্র 'সনাতন ধর্মোপদেশনী' এ-বিষয়ে সভ্যদের মধ্যে মতভেদের জন্য ক্ষোভ প্রকাশ করে বলে, 'এই বিষয় উপলক্ষে কতকগুলি ব্যক্তি রোষ অভিমান, ঈর্ষা প্রভৃতি নিকৃষ্ট বৃত্তির পরবশ হইয়া বিবিধ বিঘ্ন সমুপস্থিত করিবার চেষ্টায় আছেন, কিন্তু আমরা সাহসপূর্বক বলিতে পারি যে, তাহাদের অভীষ্ট কদাচ সুসিদ্ধ হইবে না।'[১৪৩]

পত্রিকাটির ভবিষ্যদ্বাণী সফল হয়নি। কিছুদিন পরে সভার সদস্যরা সিদ্ধান্ত নেন, বহুবিবাহ নিবারণের জন্য রাজদ্বারে প্রার্থনা না জানিয়ে তাঁরা কুলীনদের কাছে বহুবিবাহ না করার একরারনামা লিখে নেবেন। বিদ্যাসাগরের বহুবিবাহ পুস্তকের পরিচয় দিতে গিয়ে 'হিন্দু পেট্রিয়ট' ক্ষোভের সঙ্গে একথা জানিয়ে লিখল :

'Pundit Issur Chunder Vidyasagar has written a powerful pamphlet in Bengali on the Anti-polygamy movement, giving its history and meeting the objections taken on the subject. We commend the style in which the pamphlet is written as model for political controversy in Bengali. The object of this venerable reformer in publishing the pamphlet is to strengthen the hands of the Dhurma Sabha, but he will be disappointed to learn that the sabha has a

manner, as we are informed, dropped the agitation by substituting for the proposed petition to Govt. a pledge to be signed by kulins to the effect that they shall not marry more than one wife.'[১৪৪]

'হিন্দু পেট্রিয়ট'-এ এই খবর দেখে 'সুলভ সমাচার' 'সনাতন ধর্মরক্ষণী সভা'র সদস্যদের কাছে আবেদন জানিয়ে লিখল ঃ

'বোধহয় পাঠকগণ অবগত আছেন যে, বহুবিবাহ রহিত করিবার মানসে, সনাতন ধর্মরক্ষণী সভা গবর্ণমেণ্টের নিকট একটি আইন প্রার্থনা করিবার উদ্যোগ করিতেছিলেন। গতবারে হিন্দু পেট্রিয়ট সংবাদপত্রে লেখা হইয়াছে যে, সভা ঐ রাস্তা ছাড়িয়া কুলীনদিগের নিকট একরারনামা লিখিয়া লইবার চেষ্টা করিতেছেন। কথাটি যদি সত্য হয়, তবে সভা বিষম ভ্রমে পড়িয়াছেন। তাহার আর সন্দেহ নাই। বিবাহ ব্যবসায়ীদিগের একরারনামা সময় উপস্থিত হইলে, ঘুড়ির মত এক ঝাপটে টুকুরা টুকুরা হইয়া যাইবে। সভার যদি দেশের মঙ্গলসাধন করিবার ইচ্ছা থাকে, তবে দৃঢ়ব্রত হইয়া রাজদ্বারে আবেদন করুন।'[১৪৫]

'ধর্মরক্ষণী সভা'র সভ্যরা অবশ্য 'সুলভ সমাচার'-এর অনুরোধে কর্ণপাত করলেন না। ১২৭৮-এর আশ্বিন মাসে অনুষ্ঠিত এক বৈঠকে সভার বিশিষ্ট সদস্য কৃষ্ণমোহন মল্লিক, খেলাতচন্দ্র ঘোষ, যদুলাল মল্লিক প্রভৃতিরা বহুবিবাহ নিবারণের জন্য রাজবিধান চাওয়ার বিরুদ্ধে মতপ্রকাশ করেন। কয়েকজন সদস্যের আপত্তি সত্ত্বেও সভা সিদ্ধান্ত নিল, আপাতত 'গবর্ণমেণ্টের নিকট আইন প্রার্থনা না করিয়া সমাজবল ও সহায়তায় কতদূর কৃতকার্য্য হইতে পারা যায় তাহা পরীক্ষা করা হউক।'[১৪৬] সভার এই সিদ্ধান্তে হতাশ হলেন বিদ্যাসাগর, কিন্তু তাই বলে তখনই রণে ভঙ্গ দিলেন না। দেবার উপায়ও ছিল না। কারণ তাঁর বইটি নিয়ে তখনই শুরু হয়ে গেছে রীতিমতো হইচই। বিদ্যাসাগরের বইটির সমালোচনা করতে গিয়ে ৩০ শ্রাবণ, ১২৭৮-এ 'সোমপ্রকাশ' বলে ঃ বইটিতে বিদ্যাসাগর কুলীনদের অত্যাচার ও কুলীন মেয়েদের দুঃখের কথা যেভাবে বর্ণনা করেছেন, তা পড়তে গিয়ে আমাদের চোখ বারবার জলে ভরে উঠেছে। বিদ্যাসাগরের লিপিনৈপুণ্যের প্রশংসা করার সঙ্গে সঙ্গে সম্পাদক একথাও বলেন, 'আমরা বিস্মিত হইলাম…বিদ্যাসাগরও বহুবিবাহকে শাস্ত্রনিষিদ্ধ বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার জন্য বৃথা বহুল প্রয়াস পাইয়াছেন। ইহাতে ইষ্ট লাভ কি? বহুবিবাহ শাস্ত্রনিষিদ্ধ এই কথা শুনিলেই কি এদেশের লোক ভীত হইয়া তাহা হইতে বিরত হইবেন? ইহারা মুখে বলেন শাস্ত্র অনুসারে চলেন কিন্তু ব্যবহার দেখিয়া বোধহয় শাস্ত্র মানেন না।' সামাজিক বিষয়ে সরকারের হস্তক্ষেপ বিধেয় কিনা তা নিয়েও প্রশ্ন তুললেন সম্পাদক। শেষে একটি সমাধান-সূত্র দিয়ে বললেন, শাস্ত্রোক্ত কারণ ছাড়া কেউ একাধিক বিয়ে করলে, তাকে প্রতিটি বিয়ের জন্য ৫০০ টাকা করে ট্যাক্স দিতে হবে—এই মর্মে সরকার এক আদেশ জারি করলেই সব সমস্যার সমাধান হবে। 'সোমপ্রকাশ'-সম্পাদকের সঙ্গে একমত

হতে পারলেন না বিদ্যাসাগর। ৮ ভাদ্র, ১২৭৮-এ 'সোমপ্রকাশ'-সম্পাদককে একটি চিঠিতে নিজের মতভেদের কথা জানিয়ে বিদ্যাসাগর লিখলেন, 'গুরুতর কর নির্ধারণ দ্বারা বহুবিবাহ প্রথা রহিত করা অপেক্ষা রাজবিধিদ্বারা বহুবিবাহ নিবারণ প্রার্থীদের অভিমত ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ করিয়া এই কুৎসিত প্রথা রহিত করা সর্বাংশে শ্রেয়ঃকল্প।'

প্রত্যুত্তরে দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ নিজের মতের সমর্থনে কিছু যুক্তি দেখাবার চেষ্টা করলেন। এই সময়ই সংস্কৃত কলেজের প্রসিদ্ধ অধ্যাপক তারানাথ তর্কবাচস্পতিও এই বিতর্কে জড়িয়ে পড়লেন। একসময়ে আইনের সাহায্যে এ-প্রথা নিবারণের পক্ষপাতী হলেও এ সময় তাঁর মত পরিবর্তিত হয়। বহুবিবাহ পুস্তকের প্রথম ক্রোড়পত্রে বিদ্যাসাগর বহুবিবাহ সম্পর্কে তারানাথ তর্কবাচস্পতির মত পরিবর্তনকে তীব্র ভাষায় কটাক্ষ করেন। আত্মপক্ষ সমর্থনে তারানাথ যে চিঠিটি লেখেন, সেটি ১২৭৮-এর ১৩ ভাদ্র 'সোমপ্রকাশ'-এ প্রকাশিত হয়। এতে বহুবিবাহকে শাস্ত্রসম্মত ঘোষণা করে তিনি বললেন, এ-বিষয়ে বিদ্যাসাগরের সঙ্গে মতের অনৈক্যের জন্য তিনি দুঃখিত। কিন্তু বিদ্যাসাগর 'বহুবিবাহের অশাস্ত্রীয়তা প্রতিপাদনার্থে যে রূপে শাস্ত্রের অভিনব অর্থ ও যুক্তির উদভাবন করিয়াছেন, অবশ্য বুদ্ধির প্রশংসা করিতে হয়; কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে ঐ অর্থ ও যুক্তি শাস্ত্রানুমোদিত বা সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। এ-স্থলে ইহাও বক্তব্য যে, বহুবিবাহ শাস্ত্রসম্মত হইলেও ভঙ্গকুলীন ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে যে প্রণালীতে উহা সম্পন্ন হইয়া আসিতেছিল এবং কতক পরিমাণে এ পর্যন্ত প্রচলিত আছে তাহা অত্যন্ত ঘৃণাকর, লজ্জাকর ও নৃশংস। ইহা বিলক্ষণ আমার অন্তরে জাগরূক আছে এবং উহার নিবারণ হয় ইহাতে আমার আন্তরিক ইচ্ছা ছিল এবং আছে। অধিক কি এইজন্য ৫/৬ বৎসর গত হইল 'তৎকালে উপায়ান্তর নাই বিবেচনা করিয়া সামাজিক বিষয় হইলেও' নিরতিশয় আগ্রহ ও উৎসাহ সহকারে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া ঐ বিষয়ের নিবারণার্থ বিশেষ উদ্যোগী ছিলাম; কিন্তু এক্ষণে দেখিতেছি, বিদ্যাচর্চার প্রভাবে বা যে কারণে হউক ঐ কুৎসিত বহুবিবাহ প্রণালী অনেক পরিমাণে ন্যূন হইয়াছে। আমার বোধহয় অল্পকাল মধ্যে উহা এককালে অন্তর্হিত হইবে। অতএব তজ্জন্য আর আইনের আবশ্যকতা নাই, সকল সময়ে সকল আইন আবশ্যক হয় না।'

বিষয়টি নিয়ে উভয়পক্ষে যখন চাপান-উতোর চলছে, সেইসময় 'বামাবোধিনী পত্রিকা' বইটির পরিচয় দিতে গিয়ে বলল:

'বহুবিবাহ নিবারণের আপত্তিকারীগণের আপত্তি খণ্ডন করিয়া সম্প্রতি সুবিখ্যাত বিদ্যাসাগর মহাশয় একখানি পুস্তক প্রকাশিত করিয়াছেন। যাঁহারা বহুবিবাহকে শাস্ত্রসিদ্ধ বলেন, শাস্ত্রীয় প্রমাণ দ্বারা তাঁহাদিগের আপত্তি যে ভ্রমমূলক তাহা সুস্পষ্টরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। বিদ্যাসাগর বামাকুলের পরম হিতৈষী বন্ধু। বঙ্গীয় অবলাগণের দুরবস্থাদর্শনে তাঁহার দয়ার্দ্র চিত্ত স্বভাবত ব্যথিত হয়। দুঃখিনী বঙ্গবালাগণের দুঃখ দূরকরণে তিনি বহু কালাবধি শ্রম ও যত্ন করিয়া আসিতেছেন।

আহ্লাদের বিষয় এই, এতদিন তাঁহার যে যত্ন ও শ্রম অতি অল্পসংখ্যক লোক আদর করিয়াছেন, এখন অনেক কৃতবিদ্য লোকের নিকট তাহা আদরণীয় হইতেছে। কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে দুঃখের বিষয়ও বলিতে হইবে যে তাঁহার পূর্বসহচর কয়েকটি পণ্ডিত তাঁহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছেন।'[১৪৭]

'পূর্বসহচর কয়েকটি পণ্ডিত' বলতে 'বামাবোধিনী' সম্ভবত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ ও তারানাথ তর্কবাচস্পতির কথাই ইঙ্গিত করেছিল। দুজনের সঙ্গেই একসময় বিদ্যাসাগরের সম্পর্ক ছিল অতি ঘনিষ্ঠ। কিন্তু উনিশ শতকের সত্তরের দশকে বহুবিবাহ প্রথার শাস্ত্রীয়তা নিয়ে নতুন করে বিতর্ক শুরু হলে, বিদ্যাসাগরের সঙ্গে তাঁদের মতভেদ প্রকট হয়ে ওঠে। বিদ্যাসাগর এই প্রথাকে অশাস্ত্রীয় মনে করলেও, দ্বারকানাথ ও তারানাথ দুজনেই মনে করতেন, প্রথাটির অনেক দোষ আছে সন্দেহ নেই, কিন্তু এটি নিঃসন্দেহে হিন্দুশাস্ত্রসম্মত। তাঁদের ধারণা যে ঠিক নয়—তা দেখানোর জন্য ১২৭৮-এর আশ্বিন মাসে বিদ্যাসাগর বহুবিবাহ পুস্তকের দ্বিতীয় একটি ক্রোড়পত্র প্রকাশ করলেন। এই ক্রোড়পত্রটির পরিচয় দিতে গিয়ে 'হিন্দু পেট্রিয়ট' লেখে:

'The Learned Vidyasaghur has published a second supplement to his now famous polygamy pamphlet as a reply to certain strictures of Pundit Taranauth Turkovachaspati and of the Editor of the Shome Prokash. Nothing could be more telling than the calm and dispassionate reasoning with which the great reformer assails the logic of his enemies, and overturns it. The strength of Vidyasaghur in this contest is three fold, it lies in the shastras, which are entirely in his favor, in reason which cannot but support him, and in his own matchless style, which few can approach. We only regret that we do not find our way quite clear to the law which he has drafted on the subject.'[১৪৮]

বহুবিবাহ বিষয়ে বিদ্যাসাগর, দ্বারকানাথ ও তারানাথের বাদানুবাদ দেখে সেকালের এক বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ভূদেব মুখোপাধ্যায় নীরব থাকতে পারলেন না। বহুবিবাহের বিরোধী হলেও, ভূদেব কিন্তু আইনের সাহায্যে এ-প্রথা নিবারণের পক্ষপাতী ছিলেন না। তাই এই তিন পণ্ডিতের বাদানুবাদের পরিচয় দিতে গিয়ে বিদ্যাসাগর সম্পর্কে একটু কটাক্ষ না করে পারলেন না। তাঁর লেখার কিছুটা উদ্ধার করলেই ব্যাপারটা স্পষ্ট হয়ে উঠবে:

'বহুবিবাহের বিচার ক্রমে গরম হইয়া উঠিতেছে। বিদ্যাসাগর, সোমপ্রকাশ সম্পাদক ও শ্রীযুক্ত তারানাথ তর্কবাচস্পতি এই তিনজনে সশস্ত্র রঙ্গভূমিতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। কিছুদিন হইল, সোমপ্রকাশ সম্পাদক বহুবিবাহ নিবারণের উপায়স্বরূপ বহুবিবাহের উপরে ৫০০ টাকা কর নিয়োগের প্রস্তাব করেন। বিদ্যাসাগর ভাবিলেন, সম্পাদক

গম্ভীরভাবে এই প্রস্তাব করিয়াছেন, ভাবিয়া তাহার প্রতিবাদার্থে সোমপ্রকাশে পত্র লিখিলেন। সোমপ্রকাশ সম্পাদক পণ্ডিত মানুষ, বিশেষতঃ কালেজের অধ্যাপক, বলিতে পারেন না, আমি সে প্রস্তাব রহস্যভাবে করিয়াছিলাম। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রতিবাদপত্র পাইয়া তাঁহাকে কাজে কাজেই তৎখণ্ডনে প্রবৃত্ত হইতে হইল। খণ্ডন করিতে গিয়া সম্পাদক যে সমস্ত যুক্তি দেখাইয়াছেন, তাহা বিদ্যাসাগরের সদৃশ ব্যক্তির হস্তে তিল তিল পরিমাণে খণ্ডিত হইতে পারিবে। বিদ্যাসাগর মহাশয় কিছু দিন হইল, বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা, এই প্রস্তাবে যে পুস্তক প্রণয়নপূর্বক প্রচার করেন, তাহার এক ক্রোড়পত্র প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত তারানাথ তর্কবাচস্পতি মহাশয় পূর্বে একবার বহুবিবাহের প্রতিকূলে রাজদ্বারে আবেদন করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। সম্প্রতি তাঁহাকে ধর্মরঞ্জনী সভার বহুবিবাহ নিবারণ বিষয়ক চেষ্টার প্রতিকূল দেখিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় এই ক্রোড়পত্রে তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের পূর্ব কথা প্রকাশ করিয়াছেন। তর্কবাচস্পতি মহাশয় সোমপ্রকাশে বিদ্যাসাগর মহাশয়কে গূঢ়কৃত সস্নেহ অনুযোগ করিয়া রাজবিধিদ্বারা বহু পরিণয় নিবারণের প্রতি স্বীয় প্রতিকূলভাবের কারণ প্রচার করিয়াছেন। সর্বসাধারণে এবম্বিধ পণ্ডিতত্রয়ের মধ্যে এরূপ বাগ্‌বিতণ্ডা দর্শনে যৎপরোনাস্তি উপদেশ লাভ করিবেন, সন্দেহ নাই। তবে এই শঙ্কা হইতেছে, বাদানুবাদ পাছে এই পর্যন্ত হইয়াই পরিসমাপ্ত হইয়া যায়।

'ফলতঃ আমরা এ বাদানুবাদে সোমপ্রকাশ ও তর্কবাচস্পতি মহাশয়কে দোষী করিতে পারি না। সোমপ্রকাশ বহুবিবাহকাঙ্ক্ষী ব্যক্তির উপরে করনিয়োগের যে প্রস্তাব করিয়াছিলেন, তাহাতে বুদ্ধিমান ব্যক্তিমাত্রেরই বোধ হইয়াছিল, প্রস্তাবটী গম্ভীরভাবে করা হয় নাই। অন্ততঃ আমরা বুঝিয়াছিলাম, সম্পাদক রাজবলদ্বারা বহুবিবাহ-নিবারণাকাঙ্ক্ষী সম্প্রদায়কে ফাঁকি দিবার জন্য এই প্রস্তাব করিয়াছেন।··· সোমপ্রকাশের বহুবিবাহাকাঙ্ক্ষীর উপরে করনিয়োগের প্রস্তাব···অতিথির ব্যবস্থিত তালফল গ্রাস করিবার বিধির ন্যায়। নতুবা এরূপ প্রস্তাব সোমপ্রকাশ সম্পাদক কেন, বহুবিবাহ নিবারণার্থ রাজবলাকাঙ্ক্ষী সম্প্রদায় হইতেও সম্ভাবিত নহে। অতএব বিদ্যাসাগর মহাশয় সদৃশ সারগ্রাহী ব্যক্তি তাদৃশ প্রস্তাব ধরিয়া সোমপ্রকাশ সম্পাদককে অপ্রতিভ করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন, ইহা অতি আক্ষেপের বিষয়। সোমপ্রকাশ সম্পাদকও যে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভয়ে প্রকৃত কথা ব্যক্ত করিতে অসমর্থ হইয়া অসার যুক্তিদ্বারা আত্মসমর্থন চেষ্টা পাইয়াছেন, ইহাও অতি আক্ষেপের বিষয়। তর্কবাচস্পতি মহাশয় কয়েক বৎসর পূর্বে বহুপরিণয় নিবারণার্থ রাজবলের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিয়াছিলেন বলিয়া কি তাঁহাকে তাহা চিরকালই করিতে হইবে। মনুষ্যের বুদ্ধি ক্রমোন্নতিশীল, আমার মানসপটে যে যুক্তিকলা উদিত হইয়া আজি একবিধ সিদ্ধান্তের নির্দেশ করিতেছে, কালক্রমে তদপেক্ষা বহু প্রসারি যুক্তিকলাপ উদিত হইয়া অন্যবিধ সিদ্ধান্তের নির্দেশ করিতে পারে। তর্কবাচস্পতি মহাশয় পাঁচ বৎসর পূর্বে যে কথা বলিতেন, আজিও যদি তাঁহাকে সেই কথা বলিতে হইবে, তবে এ পাঁচ বৎসর জীবিত

থাকিয়া তাঁহার নিজের লাভ কি হইল ? তাঁহার বুদ্ধির কি ক্রমশ বিস্তার ও উন্নতির সঙ্গে কি মতের পরিবর্ত্ত হয় না ! ফলতঃ আমরা শ্রীযুক্ত তারানাথ তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের বিশেষ প্রশংসাস্থলে এইরূপ শুনিয়াছি যে, বিদ্যা ও বয়সের তাদৃশ পরিপাক প্রাপ্ত হইয়াও তিনি তরুণ বয়স্ক ব্যক্তির ন্যায় জ্ঞানোপার্জন বিষয়ে সমর্থ ও আগ্রহশীল। ঈদৃশ ব্যক্তির সিদ্ধান্ত বিশেষের সংশোধন হইবে, তাহা বিচিত্র নহে।'[১৪৯]

এই সময়ই বিদ্যাসাগরের বহুবিবাহ বিষয়ক পুস্তকের আলোচনা প্রসঙ্গে আইনের সাহায্যে এ-প্রথা নিবারণ করা কতখানি সঙ্গত তা নিয়ে প্রশ্ন তুললেন 'ন্যাশনাল পেপার'-এর সম্পাদক, হিন্দু মেলার অন্যতম নেপথ্যনায়ক, আদি ব্রাহ্মসমাজের নিষ্ঠাবান কর্মী নবগোপাল মিত্র। বহুবিবাহের বিরোধী হলেও, আইনের সাহায্যে এ-প্রথা নিবারণের তিনি পক্ষপাতী ছিলেন না। এ-প্রথা যে অশাস্ত্রীয় এবং এ-প্রথা নিবারিত হলে যে নারীজাতির একাংশ জীবনভোর যন্ত্রণা ভোগ করার হাত থেকে রেহাই পাবে—এ বিষয়ে বিদ্যাসাগরের সঙ্গে তিনি ছিলেন একমত। মতভেদটা হল, এ প্রথায় সরকারি হস্তক্ষেপ বাঞ্ছনীয় কিনা সেই প্রশ্ন নিয়ে। নবগোপালের মতে ১৮৬৭-তে সরকার নিয়োজিত কমিটির সিদ্ধান্ত জানার পর সরকার কি আবার এই বিষয়টি নিয়ে মাথা ঘামাবেন ? বিদ্যাসাগর তাঁর বইয়ে যে যে প্রসঙ্গ তুলেছেন, তার সবগুলিই কমিটি আলোচনা করেছিলেন। কমিটির সদস্যরা সবাই ছিলেন বহুবিবাহের বিরোধী। রাজা সত্যশরণ ঘোষাল, রমানাথ ঠাকুর, জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও দিগম্বর মিত্র—কমিটির এইসব সদস্যরা কৌলীন্যপ্রথার সমর্থক একথা নিশ্চয়ই কেউ বলবেন না। বরং বলা যায় কমিটির গঠনটা ছিল খানিকটা একপেশে—কারণ এতে কুলীনদের কোনো প্রতিনিধি স্থান পায়নি। তবু কমিটি এ-প্রথায় সরকারি হস্তক্ষেপের বিরোধিতা করে বলেন, শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে এ-প্রথা আপনা হতেই লুপ্ত হয়ে যাবে। নবগোপাল প্রশ্ন রাখলেন ঃ

'The features of the question have not undergone any variation since 1867 when the committee closed its investigations and submitted its report. Pundit Bidyasagar has not been able to bring forward any material fact which was not noticed by the committee, nor any argument to justify Govt. interference which the report did not refute. If there has been any change, that change goes to prove the opinion of the committee to be correct, and how little necessity there is for the action of Govt. which the learned Pundit invokes.'[১৫০]

নবগোপাল আরো বললেন ঃ বহুবিবাহকারীর সংখ্যা ক্রমেই হ্রাস পাচ্ছে। বিদ্যাসাগর তাঁর গ্রন্থে বহুবিবাহকারী ব্যক্তিদের যে পরিসংখ্যান দিয়েছেন, নানাকারণে সেটিও ত্রুটিপূর্ণ। প্রথমত তালিকাটি তুলনামূলক নয়—ফলে এটি দেখে বোঝার

কোনো উপায় নেই কৌলীন্যপ্রথার প্রকোপ বাড়ছে না কমছে। বহুবিবাহকারীদের মধ্যে কতজন শিক্ষিত আর কতজন অশিক্ষিত বিদ্যাসাগর যদি তা উল্লেখ করে দিতেন, তাহলে এটির নির্ভরযোগ্যতা বৃদ্ধি পেত। আমরা জানি না, তালিকাটি ঘটকদের পুরনো রেকর্ড দেখে করা হয়েছে কিনা এবং এখানে যাদের নাম আছে তারা জীবিত না মৃত। কয়েকবছরের তুলনামূলক বহুবিবাহের পরিসংখ্যান যদি বিদ্যাসাগর আমাদের সামনে রাখতেন, তাহলে বোঝা যেত প্রথাটি কত দ্রুত লোপ পাচ্ছে। বেশ্টিঙ্কের আমলের আগে যেসব কুলীন ব্রাহ্মণ জীবিকানির্বাহের জন্য বিবাহ করা ছাড়া অন্য কিছুর কথা ভাবত না, তাদের এখন অন্য জীবিকার কথা চিন্তা করতে হচ্ছে। কিন্তু হলে হবে কি, বিদ্যাসাগর অধৈর্য হয়ে পড়েছেন। তিনি চান এই মুহূর্তে একে বন্ধ করতে। কিন্তু যে প্রথা কয়েক শতাব্দী ধরে চলে আসছে, রাতারাতি তার উচ্ছেদ করা কি সম্ভব?[১৫১]

বহুবিবাহ বিষয়ক পুস্তকে বিদ্যাসাগর প্রদত্ত তালিকাটি সম্পর্কে শুধু নবগোপাল মিত্রই প্রশ্ন তুললেন না, 'হালিসহর পত্রিকা'য় 'কস্যচিত সত্যবাদিনঃ' সরাসরি এই তালিকার নির্ভরযোগ্যতা সম্পর্কে প্রশ্ন তুলে বললেন ঃ

'এ পর্যন্ত কুলীনদিগের মধ্যে বিবাহের সংখ্যা ন্যূন না হইয়া সমভাবে আছে ইহার প্রমাণ নিমিত্ত বিদ্যাসাগর মহাশয় স্বীয় রচিত গ্রন্থে কতকগুলিন কুলীনের নাম ও বহুবিবাহের সংখ্যা উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু ইহার সত্যতা বিষয়ে আমাদের বিলক্ষণ সন্দেহ হইতেছে কারণ—বেলগড়ে, মালিপোতা, বিল্বগ্রাম, বলাগড়, হালিসহর, বালি, কলিকাতা, বাগবাজার, কাশীপুর, লক্ষ্মীপাশা, খেলে, তায়পাশা, বেগে বিক্রমপুর, বদর জুগিনি প্রভৃতি যেসকল কুলীনদিগের আবাসস্থল তথায় স্বভাব ও ভঙ্গ কুলীনদিগের মধ্যে বিবাহের সংখ্যা অনেক হ্রাস পাইয়াছে, এমনকি স্বকৃতভঙ্গ কুলীনেরাও একাধিক ভার্য্যা গ্রহণ করেন না। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ন্যায় আমরাও এক বিবাহকারী শত ২, এবং সহস্র ২, লক্ষ ২ কুলীনদিগের নাম দিতে পারি…ভাল? বিদ্যাসাগর মহাশয় চুঁচুড়ার ৪০ টা বিবাহকারী শ্যামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে কোথায় পাইয়াছেন? তাঁহার রচিত পুস্তকে এরূপ অনেক ভুল আছে।'[১৫২]

শুধু বিদ্যাসাগর প্রদত্ত তালিকার ভুল দেখিয়েই লেখক ক্ষান্ত হলেন না, বিদ্যাসাগরকে সরাসরি অভিযুক্ত করে তিনি বললেন, 'বিদ্যাসাগর মহাশয় বহুবিবাহ নিষেধ জন্য যে পুস্তক প্রকটন করিয়াছেন, তাহা তাঁহার পদোপযোগী হয় নাই। ঐ পুস্তকে আদ্যোপান্তে তিনি কেবল কুলীনদিগের প্রতি তাঁহার দ্বেষাভাষ ও অসূয়াভাব প্রকাশ করিয়াছেন।' যুক্তি না শাস্ত্র কি অবলম্বন করে বিদ্যাসাগর বহুবিবাহ রদ করতে চান, সে সম্পর্কে প্রশ্ন তুলে তিনি বললেন ঃ

'অধুনা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট অস্মদগণের এই জিজ্ঞাস্য যে তিনি যুক্তি বা শাস্ত্র ইহার মধ্যে কি অবলম্বন করিয়া বহুবিবাহ রহিতের চেষ্টা করিতেছেন? যদি

যুক্তি তাঁহার অবলম্বন হয়, তবে পুস্তকাদি প্রণয়ন করিয়া এত আয়াস স্বীকার করা প্রয়োজনাভাব। কেননা বহুবিবাহ যে সাংসারিক অসুখের মূল ইহা সর্ববাদীসম্মত। যদি শাস্ত্র হয়, তাহা হইলে তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবেক না। যেহেতু হিন্দুশাস্ত্রে নানাকারণে একাপেক্ষা অধিক বিবাহের বিধি আছে। নিষেধ কোন স্থলেই নাই, বিশেষতঃ তিনি নিজে যে সকল বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন, তদ্দ্বারা বহুবিবাহের পোষকতা হইতেছে। এজন্য কেহ কেহ কহিয়া থাকেন যে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের শাস্ত্রের শাসন প্রদর্শনের প্রধান কল্প কেবল কতিপয় স্থূল ও জড়বুদ্ধি ব্যক্তিগণকে মুগ্ধ করিয়া মতস্থ করা।'

কেন বিদ্যাসাগর এ-প্রথা সংস্কারের পক্ষপাতী, সে বিষয়ে 'কস্যচিত সত্যবাদিনঃ'-র সিদ্ধান্ত ঃ

'দেশের প্রকৃত মঙ্গল সাধনের জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয় যে, রীতি সংস্করণ বিষয়ে সমুৎসুক হইয়াছেন ইহা কখনই অস্মদগণের হৃদয়ঙ্গম হয় না, কেবল খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভাশয়ে ও কুলীনদিগকে খর্ব করিবার মানসে এতদ্ব্যাপারে নিযুক্ত হইয়াছেন। কুলীনদিগের মানসম্ভ্রম এবং তাঁহাদের অনায়াসে পরিণয়াদি সম্পন্ন হয় ইহাতে কুলশূন্য ব্যক্তিরা ঈর্ষাপরবশ হইয়া সাগরীয় মতে অনুমোদন করিতেছে।'[১৫৩]

শুধু খ্যাতি ও প্রতিপত্তিলাভের আশায় বিদ্যাসাগর এ কাজে এগিয়ে এসেছেন তা মানতে রাজি হলেন না অজ্ঞাতনামা এক কুলীনকন্যা। তিনি লিখলেন ঃ

'হালিসহর পত্রিকাতে কোন সুবিজ্ঞ কুলীন মহাত্মা লিখিয়াছেন যে যাহাদের সর্বনাশ হইতেছে, যাহাদের মানসম্ভ্রম বংশ মর্যাদার মূলে নিদারুণ কুঠারাঘাত করিতে বিদ্যাসাগর মহাশয় উদ্যত হইয়াছেন, যাহাদিগকে চিরকালের জন্য দুঃখসাগরে নিমগ্ন করিতে যাইতেছেন তাহাদিগকে একবারও এই বিষয় জিজ্ঞাসা করা কি উচিত নহে? কিন্তু আমাদের বিবেচনায় হতভাগিনী কুলীন কন্যাগণের প্রতি বিদ্যাসাগর মহাশয় দয়া প্রকাশ করিয়া বহুবিবাহ নিষেধ জন্য যে পুস্তক প্রকটন করিয়াছেন, তাহা তাঁহার পদোপযোগীই হইয়াছে। ঐ পুস্তকের আদ্যোপান্ত পাঠ করিলে বোধ হয়, তিনি কেবল অবলা কুলীন কন্যাগণের হিতসাধন উদ্দেশে ঐ পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন। অধুনা হালিসহর পত্রিকাতে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দোষ উল্লেখ করিয়া কেবল দ্বেষভাব প্রকাশ করা হইয়াছে। দেশের প্রকৃত মঙ্গল সাধনের জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয় যে কুরীতি সংস্করণ বিষয়ে সমুৎসুক হইয়াছেন, ইহা কোন ব্যক্তি হৃদয়ঙ্গম না করিবে? কেবল খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভাশয়ে ও কুলীনদিগকে খর্ব করিবার মানসে এতদ্ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেন নাই। কেবল স্ত্রীজাতির মঙ্গলসাধনে ও দেশের কুরীতি দূর করিবার মানসে তাঁহার সরলান্তঃকরণে জগদীশ্বর এতাধিক দয়া প্রদান করিয়াছেন।'[১৫৪]

কুলীন মেয়েদের দুঃখ দূর করার জন্যই যে বিদ্যাসাগর এ কাজে হাত দিয়েছিলেন, সে বিষয়ে 'সত্যবাদিনঃ'-র মতো দু' একজন ছাড়া সেকালের প্রায় সব মানুষই

ছিলেন একমত। কিন্তু বহুবিবাহ প্রথা শাস্ত্রসম্মত অথবা নয়—এ নিয়ে সেকালে গুরুতর মতভেদ ছিল। বিদ্যাসাগরের আন্তরিক চেষ্টা সত্ত্বেও এটিকে অশাস্ত্রীয় বলতে অনেকেই দ্বিধান্বিত ছিলেন। এমনকি এই প্রথাকে অশাস্ত্রীয় প্রমাণ করার জন্য বিদ্যাসাগরের প্রচেষ্টা অনেককেই সন্তুষ্ট করতে পারেনি। ভাটপাড়ার অভয়চরণ দেবশর্মা এমনই একজন। বিদ্যাসাগরের বহুবিবাহ পুস্তকটি পাঠ করে তাঁর মনে নানা সন্দেহ জাগে। এই প্রথাকে অশাস্ত্রীয় প্রমাণ করার জন্য বিদ্যাসাগর যেসব শাস্ত্রের উদাহরণ দেন, সেগুলি সম্পর্কে সংশয় প্রকাশ করে তিনি বললেন, বিদ্যাসাগরের কোনো কোনো ব্যাখ্যা 'নিতান্ত অসঙ্গত।' তাঁর শাস্ত্রব্যাখ্যা যে বিতর্কাতীত ও সর্বত্র গ্রহণযোগ্য নয়, তা তিনি জোর দিয়ে বললেন।[১৫৫]

শুধু অভয়চরণ নয়, বহুবিবাহ যে শাস্ত্রসম্মত ব্যাপার এবং তাতে সরকারি হস্তক্ষেপ যে বাঞ্ছনীয় নয়—তা দেখাতে আরও অনেক ব্যক্তি কলম ধরলেন। তারানাথ তর্কবাচস্পতি লিখলেন 'বহুবিবাহবাদ'। বিদ্যাসাগরের মতের প্রতিবাদে লিখিত হল রাজকুমার ন্যায়রত্নের 'প্রেরিত তেঁতুল', ক্ষেত্রপাল স্মৃতিরত্নের 'বহুবিবাহ-বিষয়ক বিচার', সত্যব্রত সামশ্রমীর 'বহুবিবাহ বিচার সমালোচনা' ও গঙ্গাধর রায় কবিরত্নের 'বহুবিবাহ রাহিত্যারাহিত্য নির্ণয়'। এই পাঁচজনের মধ্যে তারানাথ লিখলেন সংস্কৃতে, বাকিরা বাংলায়। এঁরা যেসব আপত্তি তুললেন, সেগুলি 'বিশিষ্ট নৈপুণ্যসহকারে খণ্ডন' করে ১৮৭৩-এ বিদ্যাসাগর লিখলেন 'বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক বিচার—দ্বিতীয় পুস্তক'। সমকালীন এক লেখকের মতে 'বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বহুদর্শিতার নিকট তাহাদের যুক্তিগুলি বালুকা কণার ন্যায় উড়িয়া গিয়াছে।'[১৫৬] কিন্তু প্রতিবাদকারীদের যুক্তিগুলি উড়িয়ে দিতে গিয়ে তিনি কোনো কোনো লেখক সম্পর্কে একটু বেশি কঠোর মন্তব্য করে বসলেন। বিশেষ করে তারানাথ তর্কবাচস্পতি সম্পর্কে তাঁর মন্তব্যগুলি একটু বেশি ধারালো হয়ে উঠল।

হবার কারণও ছিল। ১৮৬৬-তে বিদ্যাসাগর যখন বহুবিবাহের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবার জন্য সরকারের কাছে পেশ করতে একটি আবেদন প্রস্তুত করছিলেন, তখন তারানাথ স্বতঃপ্রবৃত্তভাবে তাতে স্বাক্ষর করেছিলেন। এই সময়ই বিদ্যাসাগর তাঁর 'বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক বিচার' পুস্তকের প্রথম ভাগের পাণ্ডু-লিপি তাঁকে পড়ে শোনালে তিনি মুক্তকণ্ঠে সাধুবাদ জানান। কিন্তু কয়েক বছর পরে 'সনাতন ধর্মরক্ষণী সভা' যখন বহুবিবাহ নিবারণে সচেষ্ট হয়ে এ-বিষয়ে পণ্ডিতদের মত সংগ্রহ শুরু করে ও রাজদ্বারে আবেদন করতে উদ্যোগী হয়, তারানাথ তখন তার প্রতিবাদ করেন। বিদ্যাসাগরের বহুবিবাহ—প্রথম পুস্তকের দ্বিতীয় ক্রোড়পত্র প্রকাশিত হলে সভার অধ্যক্ষরা তারানাথের পূর্ব আচরণের কথা জানতে পেরে স্ববিরোধী আচরণের জন্য তাঁকে উপহাস করতে আরম্ভ করেন। এইসব কারণে ১২৭৮-এর ১৩ শ্রাবণ তিনি 'ধর্মরক্ষণী সভা'র সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করেন। তাঁর পদত্যাগ-পত্রটি গ্রহণ করা হবে কিনা তা নিয়ে আলোচনার সময় সভার বিশিষ্ট সদস্য শ্যামাচরণ

সরকার তারানাথের তীব্র সমালোচনা করেন ও তাঁর মতের যে কোনো স্থিরতা নেই তা দেখানোর জন্য 'বিদ্যাসাগরের বহুবিবাহ পুস্তকের ক্রোড়পত্রে উল্লিখিত বাচস্পতি প্রসঙ্গটি সভায় পাঠ করেন।'[১৫৭] বিদ্যাসাগরের জন্যই তাঁর এই অবস্থা বুঝতে পেরে তারানাথ তাঁর ওপর ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠেন। বিদ্যাসাগরের বহুবিবাহ সম্পর্কিত বক্তব্য খণ্ডন করে তাঁকে অপদস্থ করার জন্য তিনি লেখেন 'বহুবিবাহবাদ'। বিদ্যাসাগরও তাঁর বহুবিবাহ পুস্তকের প্রত্যুত্তরে লেখা বইগুলির মধ্যে তারানাথের বইটি সবচেয়ে গুরুত্ব দিয়ে আলোচনা করলেন। বহুবিবাহ দ্বিতীয় পুস্তকের প্রথম সংস্করণের পৃষ্ঠাসংখ্যা ২৫৬, এর মধ্যে তারানাথের বইটির আলোচনাতেই বিদ্যাসাগর ১৬০ পৃষ্ঠা ব্যয় করলেন। করতে গিয়ে তিনি বললেন, তারানাথের সমস্ত সিদ্ধান্তই অপসিদ্ধান্ত 'তাঁর বুদ্ধি আছে, কিন্তু বুদ্ধির স্থিরতা নাই, নানা শাস্ত্রে দৃষ্টি আছে, কিন্তু কোনও শাস্ত্রে প্রবেশ নাই; বিতণ্ডা করিবার বিলক্ষণ শক্তি আছে, কিন্তু মীমাংসা করিবার তাদৃশী ক্ষমতা নাই।' পরস্পরবিরোধী কথা বলতে তিনি কুণ্ঠিত নন। তাঁর বুদ্ধিবৃত্তিও অত্যন্ত কলুষিত। এমনকি 'পরস্ব হরণ করিয়া নিজস্ব বলিয়া পরিচয় দেওয়া তাঁহার অভ্যাস আছে।'

তর্কবাচস্পতি সেকালের এক বিখ্যাত পণ্ডিত। প্রগতিশীল বিভিন্ন সামাজিক আন্দোলনের সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন। বেথুন স্কুল খোলা হলে নিজের মেয়ে জ্ঞানদা দেবীকে তিনি সেখানে ভর্তি করে দেন। বাল্যবিবাহের তিনি ছিলেন ঘোর বিরোধী। বিধবাবিবাহকে তিনি সমর্থন করতেন। বিদ্যাসাগরের ছেলে বিধবাবিবাহ করলে নতুন বউকে কে বরণ করে ঘরে তুলবেন তা নিয়ে ভীষণ সমস্যা দেখা যায়। বিদ্যাসাগরের স্ত্রীও একাজ করতে রাজি হন না। শেষপর্যন্ত তারানাথের স্ত্রী-ই ভবসুন্দরীকে বরণ করে ঘরে আনেন। সেযুগে তাঁর পাণ্ডিত্যের খ্যাতি ছিল বহুবিস্তৃত। দীনবন্ধু মিত্র 'সুরধনী কাব্যে' তাঁকে শ্রদ্ধা নিবেদন করে বলেন, 'সুতীক্ষ্ণ-শে-মুষী তারানাথ মহাশয় / শব্দশাস্ত্রে সুপণ্ডিত বিচারে দুর্জয়।' বিদ্যাসাগরের ছোট ভাই শম্ভুচন্দ্র তাঁকে 'এনসাইক্লোপীডিয়া অফ সংস্কৃত লার্নিং' বলে অভিহিত করতে দ্বিধা করেননি।[১৫৮] কাউএল তাঁকে ভারতবর্ষের মধ্যে অদ্বিতীয় পণ্ডিত বলে মনে করতেন। এমনকি বিদ্যাসাগর পর্যন্ত তাঁর মৃত্যুসংবাদ পেয়ে ক্ষোভের সঙ্গে বলেছিলেন, 'ভারত আজ পণ্ডিতশূন্য।' এমন যে তারানাথ, তাঁকে এইভাবে আক্রমণ করাটা অনেকেই সেকালে সুনজরে দেখেনি। X Y Z নামান্তরালে এক পত্রলেখক 'ফ্রেন্ড অব ইন্ডিয়া'য় প্রেরিত এক পত্রে ক্ষোভপ্রকাশ করে বললেন: বইটিতে তারানাথ তর্কবাচস্পতি সম্পর্কে বিদ্যাসাগর যে ধরনের কর্কশ অমার্জিত ভাষা ব্যবহার করেছেন, তার ফলে বিবেচক মানুষদের কাছে বইটির মূল্য অনেকটাই কমে গেছে। বিদ্যাসাগরের বইটি বিচার করলে মনে হয়, যেসব বিদ্রূপাত্মক বিশেষণ তিনি তাঁর প্রতিবাদীদের ওপর অজস্রধারায় বর্ষণ করেছেন, সেগুলি তাঁর নিজের সম্পর্কেই বিশেষভাবে প্রযোজ্য।[১৫৯]

'ফ্রেন্ড অব ইন্ডিয়া'র পত্রলেখকের মতো এত তীব্রভাবে না হলেও, ব্যাপারটি সম্পর্কে 'সোমপ্রকাশ' সম্পাদক দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণও প্রশ্ন তুললেন। ৩ বৈশাখ, ১২৮০-তে বহুবিবাহ বিষয়ক দ্বিতীয় পুস্তকের সংক্ষিপ্ত আলোচনায় তিনি বললেন, বইটিতে বিদ্যাসাগরের 'প্রগাঢ় বিদ্যা, অসামান্য বুদ্ধি, বিপক্ষ মত খণ্ডনের অদ্ভুত ক্ষমতা, মীমাংসা করিবার অসাধারণ শক্তি, বিপুল পরিশ্রম ও অবিচলিত' অধ্যবসায়ের পরিচয় লাভ করে একদিকে 'যেমন বিপুল আনন্দ হইল, তেমনি এক অংশে অতিশয় অসন্তোষ জন্মিল। তিনি যদি প্রতিবাদিগণের প্রতি গালিবর্ষণ বিষয়ে কিঞ্চিৎ হস্ত সঙ্কোচ করিতেন, তাহার পুস্তকখানি সর্বাঙ্গসুন্দর ও সহৃদয় ব্যক্তিমাত্রের হৃদয়হারী হইত।' বইটির ভাষার প্রশংসা করলেও, এটির 'স্থানে স্থানে' যে 'পুনরুক্তি দোষ' ঘটেছে তাও উল্লেখ করতে তিনি ভুললেন না।

বহুবিবাহের শাস্ত্রীয়তা নিয়ে বিদ্যাসাগর ও তারানাথ—এই দুই পণ্ডিতের বিরোধকে অবলম্বন করে প্যারীমোহন কবিরত্ন একটি গান লিখলেন:

'তারানাথ আর সাগরে,
কি মজা এবারে
হক নীলু রামপ্রসাদে লড়াই হত যে প্রকারে।
তর্ক, নিয়ে বহুবিবাহ বিষয়,
উভয়ে বিরোধ চলচে অতিশয়
বহুপরিণয় করা উচিত নয়,
শাস্ত্রসিদ্ধ কথা সাগরের বিচারে ॥ ১ ॥
যে বহুবিবাহ, অধর্মপদ্ধতি
ধর্মশাস্ত্রে বলে, বলেন বাচস্পতি
অধ্যাপক পক্ষে অতিশয় অখ্যাতি,
অনীতি উন্নতির উৎসাহ সংসারে।
আগে তারানাথ ছিলেন সপক্ষ
আবেদনপত্রে নামে হয় লক্ষ্য,
এখন বিপক্ষ বিবাহের পক্ষ
সপক্ষে রাখিতে কুলীন কুলাঙ্গারে ॥ ২ ॥
মনুবাক্য অর্থ রেখে অপ্রকাশ,
মনোগত ভাব করেছেন প্রকাশ
ব্যর্থ অর্থ লোক প্রতারণার আশ,
বলে দোষারোপ নির্ণেয় নিধিরে।
জ্ঞানাম্বুধি তাই প্রত্যুত্তর তার,
লিখেছেন এবার অতি চমৎকার,
সে ব্যাখ্যা বিচার, খণ্ডে সাধ্য কার,

বিধাতার কলম বেরিয়েছে বাজারে ॥ ৩ ॥
নদনদী যত আছে এ সংসারে
ক্ষুদ্ররূপী সব ক্ষুদ্র বেগ ধরে,
অবিদিত কিছু নাই নরনিকরে,
সাগরের বেগ কে ধরিতে পারে
যে তর্ক তুফান উঠেছে সাগরে
যুক্তিযুক্ত কিনা দেখ মনে করে,
কি কাণ্ড না ঘটে কুলীনের ঘরে
সাধে কি প্রশংসা করি গুণাকরে ॥ ৪ ॥'[১৬০]

কবিরত্নের গানটির ছত্রে ছত্রে বিদ্যাসাগরের প্রতি অনুরাগ ফুটে উঠেছে। কিন্তু এই সময়ই বহুবিবাহ সংক্রান্ত বাদ-প্রতিবাদকে কেন্দ্র করে বিদ্যাসাগরের এক অত্যন্ত শক্তিশালী প্রতিপক্ষের আবির্ভাব হল—ইনি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। 'বঙ্গদর্শন'-এর সম্পাদক এবং রসস্রষ্টা সাহিত্যিক হিসাবে শিক্ষিত বাঙালিসমাজে তখনই তিনি সুপরিচিত। ১২৮০-র আষাঢ় সংখ্যা 'বঙ্গদর্শন'-এ তিনি বহুবিবাহ পুস্তকের আলোচনা করতে গিয়ে কিছু প্রশ্ন তুললেন। তিনি বললেন, বিদ্যাসাগর বহুবিবাহ পুস্তকে হুগলি জেলার বহুবিবাহকারী ব্রাহ্মণদের যে তালিকা দিয়েছেন, সেটি 'প্রমাদশূন্য নহে। কেহ কেহ বলেন মৃত ব্যক্তির নাম সন্নিবেশের দ্বারা তালিকাটি স্ফীত হইয়াছে। আমরা স্বয়ং যে দুই একটির কথা সবিশেষ জানি, তাহা তালিকার সঙ্গে মিলে নাই।' বঙ্কিমচন্দ্রের আগেও কেউ কেউ বিদ্যাসাগর প্রদত্ত তালিকাটি সম্পর্কে প্রশ্ন তুলেছিলেন।

বঙ্কিমের দ্বিতীয় বক্তব্য বহুবিবাহকারীর সংখ্যা দিন দিন কমছে এবং 'এই কুপ্রথার যাহা কিছু অবশিষ্ট আছে, তাহা আপনা হইতেই কমিবে।' এ বক্তব্যও নতুন কিছু নয়। বহুবিবাহের প্রকোপ যে ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে, তা ১৮৬৭-তে এই প্রথা সম্পর্কে তদন্তকারী কমিটি তাঁদের রিপোর্টে বলেছিলেন। দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, নবগোপাল মিত্রও যে এ মতে বিশ্বাস করতেন, তা আমরা দেখে এসেছি। ১২৭৬ বঙ্গাব্দের ভাদ্র মাসে 'অবোধবন্ধু পত্রিকা' এদেশের বিবাহপদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে কৌলীন্যপ্রথার বিষময় রূপ তুলে ধরে। সেইসঙ্গে পত্রিকাটি একথাও বলে 'ইদানিং এই জঘন্য ব্যবহার ক্রমশ লোপ পাইতেছে।' সমকালেই অজ্ঞাতনামা এক ব্যক্তি, 'এডুকেশন গেজেট'-এ লেখেন: '৭ বৎসরের মধ্যে বহুবিবাহ যে অনেক কমিয়া আসিয়াছে তাহা অনায়াসেই সপ্রমাণ করা যাইতে পারে। বিদ্যাসাগর মহাশয় আবার একটি তালিকা করুন, দেখিতে পাইবেন, ত্রিশ বৎসরের ন্যূনবয়স্ক কুলীন সন্তানগণ নিতান্ত অশিক্ষিত না হইলে এখন আর প্রায়ই একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করেন না।'[১৬১] কিছুদিন পরে 'জ্ঞানাঙ্কুর'-এ প্রকাশিত একটি লেখাতে কৌলীন্য প্রথার ভয়াবহ এক চিত্র তুলে ধরা হয়—'এক পুরুষ এককালে অধিক সংখ্যক

দারপরিগ্রহ করিলে, তাহাতে যে কতপ্রকার কত অশুভ ফলের উৎপত্তি হইতে পারে তাহা গণনা করিয়া শেষ করা যায় না। এরূপ বিবাহকারীরা বিবাহকে একপ্রকার ব্যবসায় জ্ঞান করিয়া, অনেকস্থলে তদ্দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিয়া থাকেন।' এর ফলে কি কি অনর্থ ঘটে তারও বর্ণনা পত্রিকাটি দেয়। কিন্তু সেই সঙ্গে একথাও স্বীকার করে 'ইহা কতকটা আনন্দের বিষয় যে, আজিকালি কৃতবিদ্য বাঙ্গালিদের মধ্যে এরূপ বিবাহ আর বড় দেখা যায় না; ইহা ক্রমে বিদ্যা ও জ্ঞানোন্নতির সহ হ্রাস পাইয়া আসিতেছে।'[১৬২] এ কালের এক বিশিষ্ট বাঙালি রমেশচন্দ্র দত্তও বিশ্বাস করতেন, বাংলাদেশে এই প্রথাটি এখন অবলুপ্তপ্রায়।[১৬৩]

হিন্দুদের বহুবিবাহ নিবারণের জন্য রাজব্যবস্থার যে দাবি বিদ্যাসাগর করেন, বঙ্কিমচন্দ্র তার সঙ্গেও একমত হতে পারলেন না। তাঁর মতে এদেশের অর্ধেক হিন্দু, অর্ধেক মুসলমান। 'যদি বহুবিবাহ নিবারণ জন্য আইন হওয়া উচিত হয় তবে হিন্দু মুসলমান উভয় সম্বন্ধেই সে আইন হওয়া উচিত। হিন্দুর পক্ষে বহুবিবাহ মন্দ, মুসলমানের পক্ষে ভাল এমত নহে।'

বক্তব্য বিষয় ছাড়াও, যেভাবে বিদ্যাসাগর তাঁর বক্তব্যকে প্রচার করেছেন, তারও সমালোচনা করলেন বঙ্কিমচন্দ্র। তীব্র ভাষায় ক্ষোভ প্রকাশ করে তিনি বললেন, 'বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট আমরা বিচারকালে ভদ্রের ব্যবহার্য ভাষারই প্রত্যাশা করি। ইতিপূর্বে বিদ্যাসাগর মহাশয় কখনও দূষণীয় ভাষা ব্যবহার করেন নাই—এ সম্বন্ধে তাঁহার রচনা পূর্বাবধি কলঙ্কশূন্যা। কিন্তু এই পুস্তকে দেখিলাম যে তিনি আত্মবিস্মৃত হইয়াছেন। সভারূঢ় বিচারমত্ত তৈলোজ্জ্বলললাট বিশিষ্ট নৈয়ায়িকদিগের ন্যায় তিনি প্রতিবাদীগণকে গালি দিয়াছেন।'[১৬৪] 'গালি দিলেই যে বিচারে জয়ী হওয়া যায় না'—এটাও বিদ্যাসাগরকে স্মরণ করিয়ে দিতে ভুললেন না বঙ্কিমচন্দ্র। বহুবিবাহ দ্বিতীয় পুস্তক রচনাকালে প্রতিবাদীদের প্রতি তিনি একটু বেশি কঠোর মন্তব্য করেছেন—এই অভিযোগ বঙ্কিমচন্দ্রের আগে 'সোমপ্রকাশ' ও 'ফ্রেন্ড অব ইন্ডিয়া' করেছিল, তা দেখে এসেছি। ঈষৎ পরবর্তীকালে 'অমৃতবাজার পত্রিকা'ও বহুবিবাহ বিষয়ক দ্বিতীয় পুস্তক সম্পর্কে অভিযোগ করে বলে, 'প্রতিবাদীদের সঙ্গে বিচারে' বিদ্যাসাগর 'শান্তভাব দেখাননি।'

কিন্তু এগুলি ছাড়াও মারাত্মক একটি অভিযোগ করলেন বঙ্কিমচন্দ্র। বললেন, অশ্লীল উপাখ্যান উদ্ধৃত করে বিদ্যাসাগর নিজের বইকে কলঙ্কিত করেছেন। এ অভিযোগে বঙ্কিমচন্দ্রের আগে বিদ্যাসাগরকে কেউ অভিযুক্ত করেননি। আসল ব্যাপারটা হল—গঙ্গাধর রায়ের 'বহুবিবাহ রাহিত্যারাহিত্য নির্ণয়'-এর আলোচনার সময় বিদ্যাসাগর একাধিক আদিরসাত্মক উপাখ্যানের অবতারণা করেন। এর একটি মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের 'প্রবোধচন্দ্রিকা' থেকে গৃহীত। 'প্রবোধচন্দ্রিকা' থেকে গৃহীত উপাখ্যানটি এইরকম—এক নেত্ররোগী রামকুমার নামে এক বৈদ্যপুত্রের কাছে গিয়ে বলল 'হে বৈদ্যপুত্র আমি অক্ষিপীড়াতে অতিশয় পীড়িত আছি দেখ আমাকে এমন

কোন ঔষধ দেও যাহাতে আমার নয়নব্যাধি শীঘ্র উপশম পায়।' তার কথা শুনে চিকিৎসক একটি বড় বই খুলে দেখেন, তাতে লেখা 'নেত্ররোগে সমুৎপন্নে কর্ণো ছিত্ত্বা 'কটিং' দহেৎ।' তখন তিনি রোগীকে বলেন, 'তুমি শীঘ্র বাটী গিয়া তীক্ষ্ণধার শাণিত এক ক্ষুর আনিয়া স্বকীয় দুই কর্ণ কাটিয়া সন্তপ্ত লৌহেতে দুই পাছাতে দাগ দেও তবে তোমার চক্ষুঃপীড়া আশু শান্ত হইবে।' রোগী কিছু বিবেচনা না করে তা করার পর আরো পীড়িত হয়ে ঐ বৈদ্যের কাছে আবার গিয়ে বলল, 'হে বৈদ্যপুত্র নেত্রের জ্বালা যেমন তেমনি পোঁদের জ্বালায় মরি।' রোগীর সঙ্গে রামকুমারের এই কথোপ-কথনের সময় উত্তম এক চিকিৎসক সেখানে এসে সব শুনে রামকুমারকে ভৎ'সনা করে বললেন, 'ওরে ব্যলীক সর্বনাশ করেছিস, এ রোগীটাকে খুন করলি—এ বচন অশ্ব চিকিৎসার, মনুষ্যের নয়।'

এই উপাখ্যানটি উদ্ধৃত করার পর বিদ্যাসাগর মন্তব্য করেছেন 'শ্রীযুত রামকুমার কবিরাজের ব্যবস্থা আর শ্রীযুত গঙ্গাধর কবিরাজের ব্যবস্থা এ উভয়ের অনেক অংশে সৌসাদৃশ্য আছে কিনা তাহা সকলে অনুধাবন করিয়া দেখিবেন।'[১৬৫] মৃত্যুঞ্জয়ের উপাখ্যানটি যে সুরুচিসম্মত নয়, বিদ্যাসাগরও তা জানতেন। জানতেন বলেই মৃত্যুঞ্জয় ব্যবহৃত ভদ্রসমাজে অনুচ্চার্য একটি শব্দের পরিবর্তে তিনি 'কটিং' শব্দটি ব্যবহার করেন। তবে ভদ্রসমাজে অপ্রচলিত আর একটি শব্দ ('পোঁদের') তিনি অপরিবর্তিত রাখেন। এজন্য বঙ্কিমচন্দ্র তাঁকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করেন। বঙ্কিমের আক্রমণের তীব্র প্রতিক্রিয়া হয়েছিল সেকালে, এজন্য তাঁকে অনেক গালিগালাজও সহ্য করতে হয়েছিল। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, বঙ্কিমের এই সমালোচনার পর বহুবিবাহ দ্বিতীয় পুস্তকের পরবর্তী সংস্করণে বিদ্যাসাগর 'পোঁদ' শব্দটির বদলে 'পাছা' শব্দটি ব্যবহার করেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের সমালোচনাটি 'বঙ্গদর্শন'-এ প্রকাশিত হবার কয়েকদিনের মধ্যে 'হিন্দু পেট্রিয়ট'-এ এটিকে ধিক্কার জানিয়ে লেখা হয়ঃ

'We only regret that the accomplished editor of the Banga Dursana should have [Supp]lied its pages with an exceedingly prejudiced, flippant and we may say insolent review of Pundit Iswara Chunder Vidyasaghur's second pamphlet on the Hindoo Polygamy Question. The remarks are not only hypercritical but puerile. Pundit Iswara Chunder Vidyasaghur's reputation as a scholar, writer and reformer is too well established to be shaken by such impotent attacks as that of the Dursana.'[১৬৬]

পেট্রিয়ট-সম্পাদক বঙ্কিমচন্দ্রের অনেক অভিযোগের সংক্ষেপে জবাব দেবার চেষ্টা করলেও, কোনো কোনো অভিযোগকে সুকৌশলে পাশ কাটিয়ে গেলেন। যেমন, বিদ্যাসাগর বিচারকালে ভদ্রের অব্যবহার্য ভাষা প্রয়োগ করেছেন—বঙ্কিমের এই

অভিযোগ সম্পর্কে পেট্রিয়টের বক্তব্য 'the Reviewer teaches him canons of good taste and genteel criticism. We need hardly say that the venerable Vidyasagar has grown too old to need tuition in such matters from his critic.' 'হিন্দু পেট্রিয়ট' আরো জানায়, বহুবিবাহ গ্রন্থে কুলীন মেয়েদের দুরবস্থার যে ছবি বিদ্যাসাগর এঁকেছেন তা পাষাণ হৃদয়কেও দ্রবীভূত করে, কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের মনে তা কৌতুকের সৃষ্টি করেছে। 'হিন্দু পেট্রিয়ট' বলল, বিদ্যাসাগরকে এই সমালোচনায় আক্রমণ করা হয়েছে বলে আমরা দুঃখিত নই, 'বঙ্গদর্শনে' এ ধরনের লেখা প্রকাশিত হওয়াটাই দুঃখজনক। কারণ 'বঙ্গদর্শন' যাদের কথা ভাবে সেই শিক্ষিত ও চিন্তাশীল পাঠকরা এই ধরনের লেখাকে কখনও শ্রদ্ধা ও সহানুভূতির চোখে দেখবে না।[১৬৭]

শুধু 'হিন্দু পেট্রিয়ট'ই নয়, 'বেঙ্গলি'তেও এক পত্রলেখক বিদ্যাসাগরের প্রতি 'বঙ্গদর্শন'-এর মনোভাবের সমালোচনা করলেন। পাছে কেউ তাঁকে পক্ষপাতদুষ্ট মনে করে এজন্য পত্রলেখক জানিয়ে দিলেন যে বিদ্যাসাগরের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত কোনো পরিচয় নেই। তবু দেশবাসীর যাঁর কাছে কৃতজ্ঞতার অবধি নেই, সেই মহান মানুষটির প্রতি সুবিচার করতেই তাঁর এই প্রয়াস। লুপ্তপ্রায় বহুবিবাহ প্রথার বিরুদ্ধে ধৃতাস্ত্র বিদ্যাসাগরকে ডন কুইকজোটের সঙ্গে তুলনা করার প্রতিবাদ জানালেন তিনি। ক্ষোভের সঙ্গে তিনি লিখলেন ঃ

'Vidyasagar's common sense has been questioned, must his honesty and variety go unimpunged ? He has been shown to be a fool, can he not be proved a knave as well ? Fully bent upon establishing his villainary the Reviewer fixes upon the statistics collected by him as the readiest means whereby to work the ruin of his reputation.'[১৬৮]

বিদ্যাসাগরের পক্ষ সমর্থন করতে গিয়ে পত্রলেখক বললেন, এই পরিসংখ্যান পাঁচ বছর আগেকার—একথা বিদ্যাসাগর বহুবিবাহ—প্রথম পুস্তকের দ্বিতীয় পরিশিষ্টে বলেছেন। এর মধ্যে তালিকাভুক্ত দু'চারজন ব্যক্তির মৃত্যু হতেই পারে। বিদ্যাসাগর তো পরিষ্কার বলে দিয়েছেন, তাঁর সংগৃহীত তালিকার সঙ্গে বাস্তবে দু' একটি বৈষম্য দেখা গেলেও এটিকে তিনি যথাসম্ভব প্রমাদমুক্ত করার চেষ্টা করেছেন। এর পরেও, এ-ব্যাপারে তাঁকে অভিযুক্ত করায় পত্রলেখক ক্ষোভের সঙ্গে প্রশ্ন তুললেন ঃ

'Is it not unjust and ungenerous, in the face of these declarations to taunt him for a casual error which might unavoidably have crept in or to impeach his honesty by affirming that the list of polygamists has been swelled by making the dead do duty for the living.'[১৬৯]

বিদ্যাসাগর প্রদত্ত বহুবিবাহকারীদের তালিকার সমর্থনে পত্রলেখকের বক্তব্যকে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। আবার বিদ্যাসাগরের তালিকার সঙ্গে সমকালেই প্রস্তুত অন্য তালিকার বৈষম্য চোখে পড়ে। একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। ১৮৬৬-তে বিদ্যাসাগরের উদ্যোগে সরকারের কাছে বহুবিবাহের বিরুদ্ধে আবেদন পেশ করার কয়েকদিন পরে জনাই গ্রামের এক অধিবাসীর একটি চিঠি 'হিন্দু পেট্রিয়ট'-এ প্রকাশিত হয়। এতে জনাই-এর বাজারদর, শ্রমিকদের অবস্থা, পুলিশি অত্যাচার, শিক্ষার অবস্থা ইত্যাদি নিয়ে আলোচনার পর এখানে কৌলীন্যপ্রথার প্রাদুর্ভাব সম্পর্কে বলতে গিয়ে পত্রপ্রেরক লেখেন:

'A friend took a census the other day of the koolin Brahmin population of the village. A classification was made by which it came out that there are 229 male adults out of which 53 have married more than one wife. It will be thus observed that the custom of polygamy among the koolin Brahmins is very prevalent.'[১৭০]

বহুবিবাহ প্রথম পুস্তকে জনাই গ্রামের বহুবিবাহকারীদের একটি তালিকা বিদ্যাসাগর দিয়েছেন। এতে ৬৪ জন বহুবিবাহকারীর নাম আছে। দেখা যাচ্ছে, একই বছরে প্রস্তুত জনাই গ্রামের বহুবিবাহকারীদের অন্য একটি তালিকার সঙ্গে বিদ্যাসাগরের তালিকা মিলছে না।

এইকালেই 'বঙ্গমিহির' নামক একটি পত্রিকা বিদ্যাসাগরের বহুবিবাহ ১ম ও ২য় পুস্তকের সমালোচনা করতে গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের আপত্তিগুলির জবাব দেবার চেষ্টা করে। সমালোচকের মতে বিদ্যাসাগর দেশহিতৈষী মানুষ, সবসময়ই তিনি সমাজের মঙ্গলকামনা ও মঙ্গলসাধন করে থাকেন। বহুবিবাহকে হিন্দুশাস্ত্রবিরোধী প্রমাণ করে যে দুটি বই তিনি লিখেছেন, তা যারা এই প্রথাকে শাস্ত্রসম্মত মনে করে তাদের ভুল ভেঙে দেবে। বিদ্যাসাগর তাঁর বহুবিবাহ পুস্তকে কুলীন ব্রাহ্মণদের নাম ধাম ও বিবাহ সংখ্যার যে ফর্দ দিয়েছেন, তাতে 'ভুল থাকা অসম্ভব নয়।' তবে সমালোচকের মতে 'সে ভুলের জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয়কে দোষী করা যায় না। কারণ তিনি ঘটক প্রভৃতির দ্বারা এই সকল বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছেন, ঘটকেরা ভুল করিয়া থাকিলে তাঁহারও ভুল হইয়াছে। তিনি জানিয়া শুনিয়া কখনও মিথ্যা ফর্দ বাহির করিবার লোক নহেন।'

আইনের সাহায্যে বহুবিবাহ নিবারণের ক্ষেত্র প্রস্তুত করার জন্যই বিদ্যাসাগর এই প্রথাকে অশাস্ত্রীয় প্রমাণ করেছেন। সমালোচকের মতে 'বিদ্যাসাগর কপটী নহেন। যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত বহুবিবাহ অশাস্ত্রীয় প্রমাণিত হইলে তাহা রহিত করণার্থ গবর্ণমেণ্ট আইন করিতে পারেন। এইজন্য গবর্ণমেণ্টের সাহায্যার্থে বিদ্যাসাগর মহাশয় বহুবিবাহের শাস্ত্রবিরুদ্ধতা প্রদর্শন করিয়াছেন।' বহুবিবাহ দ্বিতীয় পুস্তকে বিদ্যাসাগরের ভাষা ব্যবহারে সংযমের অভাব সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র যা বলেছিলেন, সে

সম্পর্কে বিদ্যাসাগরের পক্ষ সমর্থন করে সমালোচকের বক্তব্য : 'আপত্তিকারকদের আপত্তি খণ্ডনকালে বিদ্যাসাগর মহাশয় মধ্যে মধ্যে দুই চারিটি শ্লেষোক্তি করিয়াছেন বলিয়া কোন কোন সমালোচক তাঁহার দোষ ধরিয়াছেন। তাঁহারা বিদ্যাসাগর মহাশয়কে অভদ্র স্থির করিতে গিয়া আপনাদের ভদ্রতার পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহাদিগের জানা আবশ্যক যে, তর্ককালে ওরূপ দুই একটি শ্লেষোক্তি প্রায়ই ব্যক্ত হইয়া থাকে; আর ওরূপ শ্লেষোক্তির সহিত কথা বলিলে বিপক্ষপক্ষের মনোযোগ অধিকতর আকর্ষিত হয়। অতএব আমরা সেজন্য বিদ্যাসাগর মহাশয়কে বড় একটা দোষী করি না।'[১৭১]

বিদ্যাসাগর তাঁর বইতে মুসলমানসমাজে প্রচলিত বহুবিবাহ সম্পর্কে কিছু না বলায় বঙ্কিমচন্দ্র প্রশ্ন তুলেছিলেন, বহুবিবাহ বিষয়ে আইন হলে তা কেন শুধু হিন্দুর প্রতিই প্রযোজ্য হবে? বিদ্যাসাগরকে সমর্থন করে সমালোচক বললেন :

'এদেশে মুসলমানদিগের সংখ্যা বিস্তর। বিদ্যাসাগর মহাশয় তাহাদিগের মধ্যে প্রচলিত বহুবিবাহ সম্বন্ধে কিছু এ পুস্তকে বলেন নাই। বলিবার আবশ্যক নাই, তাই বলেন নাই, কারণ এ পুস্তকে হিন্দুদিগের যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত বহুবিবাহের অশাস্ত্রীয়তা প্রমাণ করা তাঁহার উদ্দেশ্য। মুসলমানদিগের বহুবিবাহ নিবারণ চেষ্টা তাঁহাদিগেরই করা কর্তব্য।'[১৭২] বিদ্যাসাগর যে একান্তভাবে একজন হিন্দু সমাজ-সংস্কারক—এ সত্য 'বঙ্গমিহির'-এর খ্রিস্টান সম্পাদকের চোখ এড়ায়নি।

বহুবিবাহ আন্দোলনে বিদ্যাসাগরের সাফল্য কামনা করে সমালোচক বললেন 'বিদ্যাসাগর মহাশয় কৃতকার্য হন, এই আমাদিগের কামনা। বিধবাবিবাহ বিধি প্রচলিত করিয়া তিনি সমাজের যেরূপ মঙ্গল করিয়াছেন, বহুবিবাহ প্রথা রহিত করাইতে পারিলে তদ্রূপ এক মহৎ উপকার করিবেন সন্দেহ নাই।' প্রসঙ্গত স্মরণীয়, 'বঙ্গমিহির'-এর এই সমালোচক বিদ্যাসাগর-ভক্ত হলেও, বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে অশালীন কোনো মন্তব্য করেননি।

তা করতে এগিয়ে এলেন আর এক বিদ্যাসাগর-ভক্ত। 'বঙ্গদর্শন ও বহুবিবাহ' নামে ১৫ পৃষ্ঠার একটি পুস্তিকা প্রকাশ করে তিনি শুধু বিদ্যাসাগরকে সমর্থনই করলেন না, বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা লিখতে জানেন না, তাঁর ব্যাকরণবোধ নেই—এইসব বলতেও ইতস্তত করলেন না। বঙ্কিমচন্দ্রকে সরাসরি অভিযুক্ত করে তিনি লিখলেন :

'ইনি অসূয়াপরবশ ও বিদ্বেষবুদ্ধির অধীন হইয়া যথেচ্ছ লিখিয়াছেন। যে যে বিষয়ে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মতের সহিত তাঁহার মত বিভিন্ন, স্থিরচিত্তে সরলান্তঃকরণে ও পক্ষপাতবিবর্জিত হইয়া, সেই সেই বিষয়ে অভিপ্রায় ব্যক্ত করা তাঁহার মত অভিমত না হউক, কেবল কোন যৎসামান্য দুর্লক্ষ্য সূত্র অবলম্বন করিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অপবাদ প্রচার করাই তাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য।'

তবে তা করে যে কোনো ফল হবে না, তা তিনি স্পষ্টই বলে দিলেন, 'বিদ্যাসাগর মহাশয় ভারতবর্ষে যে কীর্তিস্তম্ভ রাখিয়া চলিলেন শতসহস্র বঙ্গদর্শন লেখক কোনও

কালে তাহা বিনষ্ট করিতে পারিবেন না। অনর্থক চীৎকার কখনই ফলোপধায়ক হইবেক না।'[১৭৩]

বহুবিবাহ নিবারণের জন্য কোনো আইন হলে তা হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের প্রতি প্রযোজ্য হওয়া উচিত—বঙ্কিমচন্দ্রের এই বক্তব্য সম্পর্কে পুস্তিকা-লেখক বললেন, 'মুসলমানদিগের বিষয় পরে হইবে তজ্জন্য এত উৎকণ্ঠা কেন?' আরো বললেন, 'প্রকৃত প্রস্তাবের সমালোচনা করা বঙ্কিমচন্দ্রের উদ্দেশ্য নয়, কিসে বিদ্যাসাগর মহাশয় জনসমাজে হেয় হইয়া যান ইহাই তাহার উদ্দেশ্য।' কিন্তু তাঁর সেই উদ্দেশ্য যে সফল হবে না সে বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করে লেখক বললেন, 'রাগদ্বেষের বশীভুত হইয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কুৎসা প্রচার করিবার জন্য তিনি যতই চেষ্টা করুন না কেন তাঁহার জগদ্বিখ্যাত যশঃ কখনই বিলয় প্রাপ্ত হইবে না—তিনি তাঁহাদিগের বৃথা চীৎকার তৃণজ্ঞান করেন।' এসব কথা বলার ফাঁকে ফাঁকে পুস্তিকালেখক বঙ্কিমচন্দ্রের উদ্দেশ্য প্রচুর বাক্যবাণ নিক্ষেপ করেন। এমনকি তাঁর ভাষাজ্ঞান সম্পর্কেও কটাক্ষ করেন।

ব্যাপারটা সেকালে অনেকের ভাল লাগেনি। 'ভারত সংস্কারক' এই পুস্তিকাটির সমালোচনা প্রসঙ্গে তাই লিখল:

'বঙ্গদর্শন লেখক জগদ্বিখ্যাত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রতি রূঢ় হস্ত প্রয়োগ করিয়াছেন এবং তৎপ্রতি আপনার কুৎসিত ভাবের পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে অনেক সহৃদয় ব্যক্তি বিরক্ত হইয়াছেন। আমাদিগের পুস্তিকালেখক ইঁহাদিগের মুখপাত্রস্বরূপ হইয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পক্ষ সমর্থনার্থ যে চেষ্টা পাইয়াছেন, তজ্জন্য তিনি অবশ্য ধন্যবাদের পাত্র। তাঁহার লেখা প্রাঞ্জল ও বিশুদ্ধ হইয়াছে, কিন্তু তিনি স্থানে স্থানে বঙ্গদর্শনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দোষকে বৃহদায়তন করিয়া এবং তাহার সদ্‌গুণ প্রতিষ্ঠিত যশের অনর্থক বিলোপ চেষ্টা পাইয়া বালকত্বের পরিচয় দিয়াছেন এজন্য আমরা দুঃখিত হইলাম। বঙ্গদর্শন সহস্র দোষ সত্বেও বাংলা সাহিত্যের অদ্বিতীয় পত্রিকা। ইনি বহুবিবাহ সম্বন্ধে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রতিপক্ষে যাহা লিখিয়াছেন তাহার ভাব (spirit) আমাদিগের মতে ঘৃণার্হ, কিন্তু তাহার অনেক সিদ্ধান্ত যুক্তিসিদ্ধ ও অখণ্ডনীয়।'[১৭৪]

'ভারত সংস্কারক' বঙ্কিমের অনেক সিদ্ধান্ত 'যুক্তিসিদ্ধ ও অখণ্ডনীয়' মনে করলেও, 'ক্যালকাটা রিভিউ'-এর অজ্ঞাতনামা সমালোচক তা মানতে রাজি হলেন না। 'বঙ্গদর্শন ও বহুবিবাহ' পুস্তিকাটির সমালোচনা করতে গিয়ে তিনি বললেন, 'বঙ্গদর্শন' বিদ্যাসাগরের বহুবিবাহ পুস্তকের সমালোচনা করতে গিয়ে সাংবাদিকসুলভ সৌজন্যের রীতি বিসর্জন দিয়েছে; শুধু বিদ্যাসাগরের বক্তব্যের ভুল ত্রুটি দেখিয়েই সমালোচক ক্ষান্ত থাকেননি, কৌশলে বিদ্যাসাগরের ভণ্ডামির কথাও বলেছেন। সমালোচকের মতে বহুবিবাহের প্রকোপ কলকাতা ও তার আশপাশে কমে গেলেও, পূর্ব বাংলায় বিশেষ করে বিক্রমপুর সোনারগাঁ অঞ্চলে এখনও তা বহাল তবিয়তে বর্তমান। বহুবিবাহকে

শাস্ত্রনিষিদ্ধ প্রমাণ করার জন্য বিদ্যাসাগরের ব্যস্ততাকে বঙ্কিম কটাক্ষ করলেও, সমালোচক বিদ্যাসাগরকে সমর্থন করেছেন। বিদ্যাসাগর-অনুরাগী এমন একজন সমালোচক যে আইনের সাহায্যে এ-প্রথা নিবারণের প্রচেষ্টাকে সমর্থন করবেন—তা বলাই বাহুল্য। সমালোচক তাঁর বক্তব্য শেষ করেছেন এই বলে, 'In conclusion for the sake of our country's welfare, we wish Vidyasagara all success.'[১৭৫]

বহুবিবাহের কুফল সম্পর্কে বাঙালিসমাজ এইসময় সচেতন হয়ে উঠলেও, কিভাবে তা নিবারিত হবে তা নিয়ে মতভেদের অন্ত ছিল না। এই মতভেদ ও এ-প্রথা নিবারণে বিদ্যাসাগরের বিশেষ ভূমিকার ইঙ্গিত করে এই কালে এক ব্যক্তি একটি দীর্ঘ কবিতা রচনা করেন। কবিতাটির অংশবিশেষ এইরকম :

'ঈশ্বরের কৃপাগুণে 'বিদ্যারসাগর'
ভাগ্যহীন অবলার স্বহিতে তৎপর,...
তাঁহার যেমন চেষ্টা বিধবার প্রতি
কুলীন কামিনী প্রতি হয়েছে তেমতি,
এতে সুধু তিনি নন,
কৃতবিদ্য জ্ঞানীগণ,
সকলের এই ইচ্ছা হয়েছে এখন,
কৌলীন্য-বহুবিবাহ প্রথা নিবারণ।...
আর কিছু বাকি নাই মত আছে স্থির,
এবার হলেই হয় ব্যবস্থা বাহির।
সকলের এক বোল,
কেবল রয়েছে গোল,
রাজবিধি লয়ে কিম্বা সমাজের বলে,
কি দিয়ে উঠাবে প্রথা ভাবিছে সকলে।...
এ রীতি সুরীতি নহে বলে সর্বজন,
শাস্ত্র আর যুক্তিতেও হয় সমর্থন,
সুপ্রথা নহেক যাহা
কদাচ রবে না তাহা
কালেতে অবশ্য হবে সুরীতিস্থাপন,
তাই বলি কিছুদিন কর সম্বরণ।'[১৭৬]

আসলে কিভাবে এ-প্রথা বন্ধ করা যাবে তা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই বাঙালিসমাজ ছিল দ্বিধাবিভক্ত। বিদ্যাসাগর ও তাঁর অনুগামীরা চাইছিলেন আইনের সাহায্যে এ-প্রথা বন্ধ করতে। কিন্তু শিক্ষিত বাঙালিদের বিরাট একটা অংশ মনে করতেন,

শিক্ষার প্রসার ও চেতনার বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে এ-প্রথা আপনা থেকেই লুপ্ত হয়ে যাবে—আইনের কোনো প্রয়োজন হবে না। 'কুলকালিমা' গ্রন্থের অজ্ঞাতনামা লেখকের মতে 'অশাস্ত্রীয় ও অযৌক্তিক' এই প্রথা 'বঙ্গদেশীয় অবলাগণের উন্নতির প্রধান কন্টক' হলেও, 'সুপ্রসিদ্ধ দেশহিতৈষী শ্রীযুক্ত বিদ্যাসাগর মহাশয় যেভাবে ঐ কুৎসিত প্রথার নিবারণ চেষ্টা করিতেছেন, তাহা আমাদের সম্পূর্ণ অনুমোদনীয় নহে।'[১৭৭] এমনকি একসময় যাঁরা আইনের সাহায্যে এ-প্রথা বন্ধের পক্ষপাতী ছিলেন, পরে তাঁদেরও কেউ কেউ এর বিরোধিতা করেন। জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও তারানাথ তর্কবাচস্পতির মত পরিবর্তনের কথা আমরা আগেই দেখে এসেছি। ১৮৭৫-এ বিদ্যাসাগরের অতি পরিচিত কয়েকজন এ-প্রথায় সরকারি হস্তক্ষেপের বিরোধিতা করেন। ব্যাপারটা একটু খুলে বলি।

পূর্ববঙ্গের রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় ১৮৬৮ সাল থেকে কৌলীন্যপ্রথার কুফল সম্পর্কে সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য নানা প্রয়াস চালাচ্ছিলেন। 'বল্লালী সংশোধিনী' ও 'কৌলীন্য সংশোধনী' নামে তাঁর দুটি বই ও কৌলীন্যপ্রথার বিরুদ্ধে রচিত কটি গান সেকালে রীতিমতো আলোড়ন সৃষ্টি করে। তাঁর প্রয়াস বিদ্যাসাগর ও বেশ কিছু সংবাদপত্র সম্পাদকের প্রশংসা অর্জন করে। 'এডুকেশন গেজেট'-এ প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে এজন্য বিদ্যাসাগরের সঙ্গে তাঁকেও ধন্যবাদ জানিয়ে লেখা হয়, 'এতদগত যত্নের জন্য আমরা বহুমানভাজন শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়কে এবং বিক্রমপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে হৃদয়ের সহিত ধন্যবাদ দেই। এবং সমাজহিতৈষী ব্যক্তিমাত্রকেই ইঁহাদের আরব্ধ কার্য্যে যোগদান করিতে বিনীতভাবে অনুরোধ করি।'[১৭৮] কলকাতায় এসে রাসবিহারী বিদ্যাসাগরের সঙ্গে দেখা করলে তিনি তাঁর প্রয়াসকে অভিনন্দন জানান এবং কিভাবে একে সাফল্যের পথে নিয়ে যাওয়া যায়, সে বিষয়ে কিছু পরামর্শ দেন। ১৮৭১-এ 'সনাতন ধর্মরক্ষণী সভা'য় উপস্থিত হয়ে কিভাবে এ-প্রথা নিবারণ করা যায় সে বিষয়ে রাসবিহারী তাঁর মতামত জানান। ১৮৭৪-এর আগস্ট মাসে গবর্নর জেনারেল ঢাকায় গেলে এ-প্রথায় সরকারি হস্তক্ষেপ প্রার্থনা করে তিনি তাঁর কাছে একটি আবেদনপত্র পেশ করেন। এ ব্যাপারে তাঁর প্রধান উৎসাহদাতা ছিলেন বিদ্যাসাগর। আত্মজীবনীতে রাসবিহারী জানিয়েছেন: 'এই আবেদনপত্রের পাণ্ডুলিপি পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রেরিত। ইহাতে বহুসংখ্যক কুলীন ও বহুবিবাহকারী কুলীন এবং শ্রোত্রিয় বংশজ ও প্রধান প্রধান বৈদ্য, কায়স্থ মহোদয়গণের নাম স্বাক্ষর করাইয়া ঢাকার সুবিখ্যাত ডিপুটি কালেকটর ও ডিপুটি ম্যাজিস্ট্রেট শ্রীযুক্ত বাবু ব্রজসুন্দর মিত্র মহাশয়ের সম্পূর্ণ সাহায্যে আবেদনপত্র অর্পণ করিয়াছিলাম।' ঐ আবেদনপত্রের সঙ্গে নিজের লেখা পুস্তিকাদুটি ছাড়াও বিদ্যাসাগরের লেখা বহুবিবাহ সংক্রান্ত পুস্তকদুটি দিতে রাসবিহারী ভোলেননি। রাসবিহারী আবেদন করার অল্পদিন পরে বাখরগঞ্জের

মাধবনারায়ণ রায়চৌধুরী ও অন্যান্যেরাও এ-প্রথার বিলোপ চেয়ে আর একটি আবেদন সরকারের কাছে পেশ করেন।

এই দুটি আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আইনের সাহায্যে এ-প্রথা বন্ধ করা সম্পর্কে সরকার কৃষ্ণদাস পাল, রাজেন্দ্রলাল মিত্র ও যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর—এই তিনজন বিশিষ্ট বাঙালির মত জানতে চান। তিনজনেই একবাক্যে এ-প্রথায় সরকারি হস্তক্ষেপের বিরোধিতা করেন। কৃষ্ণদাস পাল বলেন, ব্যক্তিগতভাবে কৌলীন্যপ্রথা জনিত কুফলের অবসান দেখলে তিনি খুশি হবেন, কিন্তু 'it would not be advisable for Govt. to assume an aggressive position in order to suppress the practice by compulsory legislation.'[১৭৯] রাজেন্দ্রলাল বললেন, অধিকাংশ শিক্ষিত ও চিন্তাশীল হিন্দু আইনের সাহায্যে বহুবিবাহ নিবারণ সমর্থন করেন—এ ধারণা একেবারেই ঠিক নয়। সেইকারণেই 'I am, therefore, of opinion that a case has not been made out for Govt. interference with the marriage laws of the Hindus, it is not expedient that it should take any action in the matter.'[১৮০] যতীন্দ্রমোহন বললেন, 'I am of opinion that it should not be expedient to enact any law for the suppression of kulin polygamy.'[১৮১]

মনে রাখব, আইনের সাহায্যে বহুবিবাহ নিবারণে অনাগ্রহী এইসব ব্যক্তিদের মধ্যে কৃষ্ণদাস পাল ছিলেন বিদ্যাসাগরের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। ১৮৬৬-তে বিদ্যাসাগরের উদ্যোগে বহুবিবাহের বিরুদ্ধে সরকারের কাছে যে আবেদন পেশ করা হয় তাতে কৃষ্ণদাস ও রাজেন্দ্রলাল উভয়েই সই করেছিলেন। বাংলার লেফটেনান্ট গভর্নরের কাছে আবেদনটি পেশ করার জন্য সম্ভ্রান্ত বাঙালিদের যে দলটি গিয়েছিলেন, তাতেও কৃষ্ণদাস ও রাজেন্দ্রলাল ছিলেন। অথচ কয়েকবছর পর তাঁরাই আবার এ-প্রথায় সরকারি হস্তক্ষেপের বিরোধিতা করলেন। তারানাথ তর্কবাচস্পতি পূর্বসিদ্ধান্ত থেকে সরে আসায় বিদ্যাসাগর তাঁর তীব্র সমালোচনা করেন। কিন্তু রাজেন্দ্রলাল ও কৃষ্ণদাসের স্ববিরোধী আচরণ সম্পর্কে কোনো কথা তিনি উচ্চারণ করলেন না। আসলে শিক্ষিত বাঙালিদের স্ববিরোধী আচরণ দেখে দেখে বিদ্যাসাগর তখন ক্লান্ত, বিষণ্ণ। বহুবিবাহের বিরুদ্ধে লড়াই করে সফল যে তিনি হতে পারবেন না—তা এই সময়ই তিনি বুঝতে পেরেছিলেন। আর পেরেছিলেন বলেই, সব দেখেশুনেও নীরব থাকাই তিনি শ্রেয় মনে করলেন।

বারবার চেষ্টা করেও, আইনের সাহায্যে বহুবিবাহ নিবারণে বিদ্যাসাগর সফল হতে পারলেন না কেন—এ প্রশ্নের উত্তরের সন্ধান সেকালেই কেউ কেউ করেছিলেন। এ প্রথা যে শাস্ত্রবিরুদ্ধ তা বিদ্যাসাগর নিঃসংশয়ে প্রমাণ করতে পেরেছিলেন কিনা সে বিষয়ে সেকালের লোকেদের মধ্যে সংশয় ছিল। বহুবিবাহের শাস্ত্রীয়তা নিয়ে বাদানুবাদের সময় উভয়পক্ষ একই বচনকে ভিন্ন ভিন্ন অর্থে গ্রহণ করতেন। বিষয়টির

দিকে সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে ভূদেব মুখোপাধ্যায় লেখেন, 'বহুবিবাহ শাস্ত্রসম্মত কিনা, এই মোকদ্দমায় বিদ্যাসাগর মহাশয়ই বাদী।···বাদীর বিবেচনায় মনু স্বজাতিতে বহুবিবাহ নিষেধ করিয়াছেন, প্রতিবাদীগণের বিবেচনায় মনু হীনজাতিতে প্রথম বিবাহ নিষেধ করিয়াছেন। বচনের ভাষা যেরূপ, তাহাতে উভয় তাৎপর্য্যই সঙ্গত হইতে পারে।'[১৮২] ভূদেবের মতো শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিও যখন পণ্ডিতদের এই তর্কযুদ্ধে কিছুটা দিশাহারা, তখন সাধারণ মানুষের অবস্থাটা সহজেই অনুমেয়। কার বক্তব্য যে ঠিক, আর কার নয়, সেটা সাধারণ মানুষের পক্ষে বুঝে ওঠা সম্ভবই ছিল না। তাই বিদ্যাসাগরের সঙ্গে অন্যান্যদের শাস্ত্রীয় বিতর্কের ফলাফল সম্পর্কে সাধারণের মনে কোনো স্পষ্ট ধারণা গড়ে ওঠেনি। এমনকি বহুবিবাহ বিষয়ে বিদ্যাসাগর ও তাঁর প্রতিবাদীদের প্রতিটি গ্রন্থ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পড়ার পরও সেকালের এক লেখক বিনা দ্বিধায় বলেন, 'মহিষে মহিষে লড়াই হইলে, কোনপক্ষের জয়লাভ হইল,তাহা মেষের বলা উচিত নহে।'[১৮৩] এমনকি বিদ্যাসাগরের ভাই শম্ভুচন্দ্র পর্যন্ত বলতে বাধ্য হয়েছিলেন, 'একদা বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রকাশ করেন যে বহুবিবাহ অশাস্ত্রীয়, কিন্তু বাচস্পতি মহাশয় ইহা অন্যায্য স্বীকার করিয়াও অশাস্ত্রীয় বলিয়া স্বীকার করেন না। এইজন্য উভয়ে স্বীয় স্বীয় পক্ষ সমর্থনার্থ শাস্ত্রীয় বচন উদ্ধৃত করিয়া কতিপয় পুস্তক প্রকাশ করেন। এক্ষণে ইহাঁদের জয় পরাজয়ের কথা ব্যক্ত করা মাদৃশ লোকের সাধ্যাতীত।'

কৌলীন্যপ্রথা অমানবিক, কোনো যুক্তি দিয়েই একে সমর্থন করা যায় না। কাজেই এ-প্রথা শাস্ত্রীয় না অশাস্ত্রীয়, এ বিচার একেবারেই অর্থহীন—একথা সেকালের শিক্ষিতসমাজের একটা বড় অংশ মনে করতেন। এ-প্রথাকে অশাস্ত্রীয় প্রমাণ করার জন্য বিদ্যাসাগরের অতি মাত্রায় আগ্রহ তাঁদের ভালো লাগেনি। শ্রীশচন্দ্র মজুমদার স্পষ্টই বললেন, 'সেদিন যখন কৌলীন্যপ্রথার বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইবার সময়ও তিনি শাস্ত্রের দোহাই দিতে সঙ্কোচ করেন নাই, তখন বাস্তবিক লোক হাসিয়াছিল। বঙ্গদর্শন এ ভ্রম দেখাইতে গিয়া লোকের বিষদৃষ্টিতে পড়িলেন, কিন্তু তিনি সত্যকথা বলিয়াছিলেন।'[১৮৪]

বহুবিবাহ নিবারণে বিদ্যাসাগরের প্রচেষ্টা বিধবাবিবাহের মতো অতখানি আলোড়ন সৃষ্টি করতে পারেনি, তাই ব্যর্থ হলেও লোকে বেশি হতাশ হয়নি—এমন কথাও কেউ কেউ মনে করতেন। 'বিদ্যাসাগর মহাশয় যখন বহুবিবাহ নিবারণজন্য যত্ন করিলেন, লোকে তখন আর তত উৎসাহিত হন নাই। কেহই আশা, ভরসা, ভয় ও আগ্রহ প্রকাশ করে নাই। কেহই অগ্রসর হইলেন না, সুতরাং অসম্পন্নতাহেতু কেহই হতাশ বা নিরুৎসাহ হইলেন না। তরঙ্গ যে উঠিল অমনি বিলীন হইয়া গেল।'[১৮৫]

তরঙ্গ হয়তো বিলীন হয়ে গেল, কিন্তু বহুবিবাহের কুফল থেকে বাঙালিসমাজ পুরোপুরি মুক্ত হতে পারল না। ১৮৮০-তে 'সোমপ্রকাশ' পত্রিকায় বিহারিলাল চট্টোপাধ্যায় লিখলেন ঃ

'এখনও অনেক স্থানে বহুবিবাহ প্রচলিত আছে। আমি দেখিয়াছি, বর্ধমান

জেলার ভাটাকুল গ্রামের এক ব্যক্তি ৩৮টি বিবাহ করিয়াছেন। ইহাঁর বয়স এখন আনুমানিক ৩৩/৩৪ বৎসর। ঐ জেলায় শ্রীধরপুরের একজনও নাকি পঞ্চাধিক বিবাহ করিয়াছেন। তাঁহার এখনও বিবাহের ইচ্ছা আছে। এইরূপ অনেকস্থানে আজিও বিবাহ ব্যবসায়ী ব্যক্তি অনেক আছেন।'[১৮৬] 'সোমপ্রকাশ'-এর এই উক্তি কতখানি সত্য তা বোঝা যায় ১৮৯১-এর ৯মে 'সঞ্জীবনী'তে প্রকাশিত একটি সংবাদ থেকে। পত্রিকাটি এক কুলীনের মৃত্যু সংবাদ জানাতে গিয়ে মন্তব্য করে, ঐ ব্যক্তি ঠিক কতগুলি বিয়ে করেছিল কেউ তা জানত না। মৃত্যুর পর জানা গেল তার বিবাহিত স্ত্রীর সংখ্যা ১১৩![১৮৭]

বিবাহ ব্যবসায়ীদের এই দাপট চলাকালীনই ১৮৯১-এ বিদ্যাসাগর মারা গেলেন। তাঁর মৃত্যুর পরের বছর বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিবিধ প্রবন্ধ' (দ্বিতীয় খণ্ড) প্রকাশিত হয়। এতে প্রায় আঠারো বছর আগে লেখা বিতর্কিত 'বহুবিবাহ' প্রবন্ধটি অন্তর্ভুক্ত হয়। প্রবন্ধটির সূচনায় ছোট একটি ভূমিকা যোগ করে তিনি জানান, 'কর্তব্যানুরোধে' বিদ্যাসাগরের বহুবিবাহ বিষয়ক দ্বিতীয় পুস্তকের কিছু তীব্র সমালোচনা তিনি করেছিলেন। এই আন্দোলন যে ভ্রান্তিজনিত এটা দেখানোই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। প্রবন্ধটি প্রকাশিত হলে বিদ্যাসাগর 'কিছু বিরক্ত' হন। দ্বিতীয়বার তাঁর বিরক্তি উৎপাদন না করার জন্য তাঁর জীবিতকালে এটি তিনি পুনর্মুদ্রিত করেননি। কিন্তু 'এক্ষণে তিনি অনুরক্তি বিরক্তির অতীত। তথাপি দেশস্থ সকল লোকেই তাঁহাকে শ্রদ্ধা করে, এবং আমিও তাঁহাকে আন্তরিক শ্রদ্ধা করি, এজন্য ইহা এক্ষণে পুনর্মুদ্রিত করার ঔচিত্যবিষয়ে অনেক বিচার করিয়াছি। বিচার করিয়া, যে অংশে সেই তীব্র সমালোচনা ছিল, তাহা উঠাইয়া দিয়াছি। কোন না কোন দিন কথাটা উঠিবে, দোষ তাঁহার, না আমার। সুবিচার জন্য প্রবন্ধটির প্রথমাংশ পুনর্মুদ্রিত করিলাম।'

বিদ্যাসাগর বা বঙ্কিমচন্দ্রের দোষগুণের বিচারে প্রবেশ না করেও, একটি কথা কিন্তু আমাদের মনে রাখতেই হবে—স্বাধীন ভারতবর্ষে হিন্দুদের বহুবিবাহের অবসান ঘটাতে হয়েছে আইনের সাহায্য নিয়ে। যে আইন প্রণয়নের দাবি বিদ্যাসাগর ১৮৫৫ থেকে বারবার করে আসছিলেন। সংস্কারক হিসাবে অন্তত এই একটি ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগরের দূরদৃষ্টির প্রশংসা করতেই হয়।

তথ্যসূত্র

১. 'সাধারণী' ১০.৬.১৮৭৭

২. *The Friend of India* 13.12.1866

৩. 'বামাবোধিনী', কার্তিক, ১২৭৪

৪. ঐ, পৌষ, ১২৭৪

৫. 'বিদ্যাসাগর', বিহারিলাল সরকার (কলকাতা, ১৩৮৮), পৃ. ২৬০

৬. 'এডুকেশন গেজেট', ১৬.৬.১৮৭১

৭. ঐ, ৫.৯.১৮৭৩

৮. 'বিদ্যাসাগর', চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (কলকাতা, ১৩৯৪), পৃ. ৪৫৭

৯. 'আত্মকথা', গুরুচরণ মহলানবীশ, 'আত্মকথা' (২য় খণ্ড), নরেশচন্দ্র জানা সম্পাদিত (কলকাতা, ১৯৮২), পৃ. ৩২

১০. ঐ

১১. 'বিদ্যাসাগর', বিহারিলাল সরকার, পৃ. ৩৩৫

১২. 'বিচারপতি দ্বারকানাথ মিত্রের জীবনী', কালীপ্রসন্ন দত্ত (কলকাতা, ১৮৯২), পৃ. ১১০

১৩. 'সম্মতিবিষয়ক আইনের পাণ্ডুলিপি' (কলকাতা, ১৮৯১), পৃ. ২

১৪. *Indian Nationalism and Hindu Social Reform*, C. H. Heimsath, (Princepton, 1964), p. 161.

১৫ *Judicial Deptt*, Pros. No. 10, June, 1890

১৬. *Judicial Deptt*, File No J C/17 of 1892

১৭. ঐ

১৮. 'ধর্মপ্রচারক', পৌষ, ১৮১২ শক

১৯. ঐ, মাঘ, ১৮১২ শক

২০. 'গর্ভাধান ব্যবস্থার মন্তব্য', শশধর তর্কচূড়ামণি, 'জন্মভূমি', মাঘ, ১২৯৭

২১. 'ধর্মপ্রচারক', মাঘ, ১৮১২ শক

২২. 'কেয়াবাৎ মেয়ে', শ্রীপান্থ (কলকাতা, ১৯৮৮), পৃ. ৭৭

২৩ *The Mahomedan opposition to the Bill*, *Reis and Rayyet*, 31.1.1891

২৪. *Memoirs of My Life and Times* (Vol. II), Bipin Ch. Pal (Calcutta, 1951), p. 117.

২৫. 'দাদার কথা', সুরেশচন্দ্র ঘোষ (কলকাতা, ১৯৩৩), পৃ. ৫৪

২৬. *Reis and Rayyet*, 21. 3. 1891

২৭. 'বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ (৩য় খণ্ড), শঙ্করীপ্রসাদ বসু, পৃ. ২৬৮

২৮. 'বিদ্যাসাগর', বিহারিলাল সরকার, পৃ. ৩৬৭-৯
২৯. 'সম্মতিবিষয়ক আইনের পাণ্ডুলিপি' (কলকাতা, ১৮৯১), পৃ. ৩
৩০. 'চিত্রদর্শন', ফাল্গুন-চৈত্র, ১২৯৭, পৃ. ৬৬
৩১. 'ভূদেব চরিত (১ম ভাগ), পৃ. ১৭৪
৩২. ঐ, পৃ. ১৭৪-৫
৩৩. 'সাহিত্য', শ্রাবণ, ১৩০০
৩৪. *The Hindoo Patriot*, 17.7.1856
৩৫. 'সংবাদ প্রভাকর', ৯. ২. ১৮৫৫
৩৬. ঐ, ১০. ২. ১৮৫৫
৩৭. ঐ, ৭. ৩. ১৮৫৫
৩৮. *The Morning Chronicle*, 12. 2. 1855
৩৯. *The Citizen*, 7. 2. 1855
৪০. *The Hindoo Intelligencer*, 12. 2. 1855
৪১. ঐ
৪২. *The Hindoo Patriot*, 15. 2. 1855
৪৩. *The Morning Chronicle*, 29. 2. 1855
৪৪. 'It elicited replies from a host of opponents, the majority of whom belonged to the priestly and professionally learned classes.' *The Hindoo Patriot*, 17. 7. 1856
৪৫. *The Hindoo Intelligencer*, 2. 4. 1855
৪৬. *The Calcutta Review*, Vol. 25, 1855, p. 360
৪৭. *The Hindoo Intelligencer*, 2. 4. 1855
৪৮. 'বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত নহে', প্রসন্নকুমার মুখোপাধ্যায়, (কলকাতা, ১৮৫৫), পৃ. ১৫
৪৯. 'বিধবাবিবাহ নিষেধঃ', পীতাম্বর সেন কবিরত্ন, পৃ. ২২-৩
৫০. 'বিধবাবিবাহ বিধায়ক কুল-পঞ্জিকার কোন বর প্রদত্ত ভ্রমোদ্ধারক প্রত্যুত্তর', (১২৬১), পৃ. ১৭
৫১. 'বিদ্যাসাগর রচনা সংগ্রহ' (২য় খণ্ড, সমাজ), গোপাল হালদার সম্পাদিত, (কলকাতা, ১৯৭২), পৃ. ৩৬
৫২. 'সংবাদ প্রভাকর', ৭. ৩. ১৮৫৫
৫৩. 'বিধবাবিবাহ', 'সমাচার সুধাবর্ষণ', ১২. ১১. ১৮৫৫
৫৪. 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা', অগ্রহায়ণ, ১৭৭৭ শক
৫৫. 'নিত্যধর্মানুরঞ্জিকা', ১৫ অগ্রহায়ণ, ১৭৭৭ শক
৫৬. *The Hindoo Intelligencer*, 19. 11. 1855

৫৭. 'রঙ্গলাল বাবুর গান', 'বীরভূমি' (৩য় ভাগ), ১৩০৯, পৃ. ৩৫৩
৫৮. *The Hindoo Intelligencer*, 9. 4. 1855
৫৯. *Meeting of the Hindoo Widow, The Morning Chronicle*, 28. 5. 1855
৬০. *The Morning Chronicle*, 8. 9. 1855
৬১. 'সংবাদ প্রভাকর', ২৪. ৫. ১৮৫৫
৬২. *Hindoo Widow Remarriage, The Citizen*, 24. 3. 1855
৬৩. 'বঙ্গবিদ্যাপ্রকাশিকা পত্রিকা', কার্তিক, ১২৬২
৬৪. 'সম্বাদ ভাস্কর', ২৫. ২. ১৮৫৬
৬৫. 'নিত্যধর্মানুরঞ্জিকা', ১৫ পৌষ, ১৭৭৭ শক
৬৬. *The Citizen*, 12. 2. 1856
৬৭. *The Hindoo Intelligencer*, 11. 2. 1856 reprinted in *The Morning Chronicle*, 12. 2. 1856
৬৮. *Legislative Deptt*, papers relating to Act XV of 1856
৬৯. *The Hindoo Intelligencer*, 3. 12. 1855
৭০. *Legislative Deptt*, papers relating to Act XV of 1856
৭১. 'নিত্যধর্মানুরঞ্জিকা', ৩১ জ্যৈষ্ঠ, ১৭৭৮ শক
৭২. *The Morning Chronicle*, 30. 7. 1856
৭৩. 'সম্বাদ ভাস্কর', ২৮. ৮. ১৮৫৬
৭৪. 'বঙ্গবিদ্যাপ্রকাশিকা পত্রিকা', আষাঢ়, ১২৬৩
৭৫. *Widow Marriage, The Morning Chronicle*, 9. 12. 1856
৭৬. 'সম্বাদ ভাস্কর'. ১৬. ১২. ১৮৫৬
৭৭. *Hindu Remarriage, The Morning Chronicle*, 27. 12. 1856
৭৮. 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা', 'পৌষ, ১৭৭৮ শক
৭৯. *The Englishman*, 1. 8. 1891
৮০. 'নব্যভারত', ভাদ্র, ১২৯৮
৮১. 'বিবাহ ব্যবসায়', 'সুলভ সমাচার', ৩১ শ্রাবণ, ১২৭৮
৮২. 'হিন্দু পরিবারের পূর্বাপর অবস্থা', 'হালিসহর পত্রিকা', অগ্রহায়ণ, ১২৭৮
৮৩. বর্তমান কালচরিত্র', 'নিত্যধর্মানুরঞ্জিকা', ২৯ পৌষ, ১৭৭৭ শক
৮৪. 'নিত্যধর্মানুরঞ্জিকা', ১৫ চৈত্র, ১৭৭৭ শক
৮৫. 'নবজীবন', আষাঢ়, ১২৯২
৮৬. *The Friend of India*, 23. 12. 1856
৮৭. *The Hindoo Patriot*, 26. 2. 1857
৮৮. 'সংবাদ প্রভাকর', ২. ৭. ১৮৫৮

৮৯. 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা', পৌষ, ১৭৭৯ শক
৯০. ঐ, ভাদ্র, ১৭৮০ শক
৯১. 'সোমপ্রকাশ', ২২. ১২. ১৮৬২
৯২. ঐ, ২২. ৬. ১৮৬৩
৯৩. *The Well Wisher*, March, 1867, pp. 63-5
৯৪. ঐ, পৃ. ৭৩
৯৫. *The National Paper*, 22. 5. 1867
৯৬. 'ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও বিধবাবিবাহ', 'সোমপ্রকাশ', ২০. ৫. ১৮৬৭
৯৭. *The Hindoo Patriot*, 1. 7. 1867
৯৮. 'সোমপ্রকাশ', ৮. ৭. ১৮৬৭
৯৯. *The Widow Marriage Movement, The Hindoo Patriot*, 15. 7. 1867
১০০. বিদ্যাসাগর জীবনচরিত ও ভ্রমনিরাস', শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন, কুমুদকুমার ভট্টাচার্য সম্পাদিত (কলকাতা, ১৯৯২), পৃ. ২২৮
১০১. 'Pandit Eshwar Chunder Vydiasagar has stopped the mouths of his enemies by marrying his son, a youngman of 22 to a widow who lost her first husband at the age of 12.' *The Bengalee*, 20. 8. 1870
১০২. 'হিন্দুবিধবা', 'বামাবোধিনী', শ্রাবণ, ১২৭৭
১০৩. 'বঙ্গদেশীয় সমাজ সংস্করণ', 'হালিসহর পত্রিকা', আষাঢ়, ১২৭৯
১০৪. 'হিন্দুবিবাহ সমালোচন' (২য় খণ্ড), ভুবনেশ্বর মিত্র (কলকাতা, ১৮৭৬), পৃ. ১০৩
১০৫. 'সাধারণী', ৬. ২. ১৮৭৬
১০৬. 'বীরপূজা', যোগেন্দ্রনাথ শর্মা, 'নব্যভারত', ভাদ্র, ১২৯৮
১০৭. 'সোমপ্রকাশ', ৬. ৯. ১৮৮০
১০৮. 'বর্তমান বঙ্গসমাজ ও চারিজন সংস্কারক', শ্রীশচন্দ্র মজুমদার, 'মাসিক সমালোচক', ১২৮৬, পৃ. ৩১৮
১০৯. 'বিধবাবিবাহ', 'নব্যভারত', ভাদ্র, ১২৯৫
১১০. 'বাল্যবিবাহ ও বিধবাবিবাহ', পাঁচকড়ি ঘোষ, 'নব্যভারত', পৌষ, ১২৯৯
১১১. 'বিধবা ধর্মরক্ষা', শ্যামাপদ ন্যায়ভূষণ, পৃ. ৪
১১২. 'ঢাকাপ্রকাশ', ৭. ১১. ১৮৮৬ দ্র. 'উনিশ শতকে বাংলাদেশের সংবাদ সাময়িকপত্র' (৩য় খণ্ড), মুনতাসীর মামুন (ঢাকা, ১৩৮৮), পৃ. ৩৫৫-৬
১১৩. *Reis and Rayyet*, 18. 4. 1891.
১১৪. 'বিধবাবিবাহ বিধায়ক প্রবন্ধ সকলের সমালোচনা' (শান্তিপুর, ১২৯২), পৃ. ৮২

১১৫. 'বিধবাবিবাহ', 'সমাজদীপিকা', কার্তিক, ১২৯২
১১৬. 'ভূদেবচরিত' (১ম ভাগ), পৃ. ১৭৪-৫
১১৭. 'অনুসন্ধান', ১৫ শ্রাবণ, ১২৯৮
১১৮. 'সুবোধিনী', শ্রাবণ, ১২৯৮
১১৯. 'বামাবোধিনী', শ্রাবণ, ১২৯১
১২০. *The Hindoo Patriot*, 4. 9. 1856
১২১. *The Reformer*, 7. 4. 1833
১২২. 'কৌলীন্যপ্রথা', 'সমাজদীপিকা', জ্যৈষ্ঠ, ১২৯২
১২৩. 'হিন্দু মহিলাগণের হীনাবস্থা', কৈলাসবাসিনী দেবী (কলকাতা, ১৮৬৩), পৃ. ২১-২
১২৪. 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়', ১২. ৬. ১৮৫১
১২৫. *The Englishman*, 28. 11. 1855
১২৬. *The Hindoo Intelligencer*, 6. 8. 1855
১২৭. ঐ, ১৬. ৭. ১৮৫৫
১২৮. *Hindoo Polygamy and 'Orthodox' Reformers*, *The Friend of India*, 30. 3. 1865
১২৯. *Anti Polygamy Tracts*, No 1 (Calcutta, 1856), pp. 12-4
১৩০. *The Friend of India*, 30. 3. 1865
১৩১, 'সোমপ্রকাশ', ৩. ৮. ১৮৬৩
১৩২. *Koolin Polygamy*, *The Hindoo Patriot*, 26. 3. 1866
১৩৩. ঐ
১৩৪. *The Well Wisher*, April, 1866, p. 44
১৩৫. *The Friend of India*, 22. 3. 1866
১৩৬. *The Native Press and the Polygamy Bill*, *The National Paper*, 16. 1. 1867
১৩৭. *The Bengalee*, 9. 7. 1870
১৩৮. 'বামাবোধিনী', শ্রাবণ, ১২৭৭
১৩৯. ঐ, আশ্বিন, ১২৭৭
১৪০. 'সুলভ সমাচার', ৩১ শ্রাবণ, ১২৭৮
১৪১. *The Calcutta Review*, Vol. 106, 1871, p. XXVIII
১৪২. 'সনাতন ধর্মোপদেশনা', বৈশাখ, ১২৭৮
১৪৩. ঐ, জ্যৈষ্ঠ, ১২৭৮
১৪৪. *The Hindoo Patriot*, 7. 8. 1871
১৪৫. 'সুলভ সমাচার', ৩১ শ্রাবণ, ১২৭৮

১৪৬. 'সনাতন ধর্মোপদেশনী', আশ্বিন, ১২৭৮
১৪৭. 'বামাবোধিনী', আশ্বিন, ১২৭৮
১৪৮. *The Hindoo Patriot*, 16. 10. 1871
১৪৯. 'বিদ্যাসাগর, সোমপ্রকাশ ও বহুবিবাহ', এডুকেশন গেজেট, ১. ৯. ১৮৭১
১৫০. *The National Paper*, 30. 8. 1871
১৫১. ঐ
১৫২. 'কুলীন বহুবিবাহ নিষেধ বিষয়ক কথা', 'হালিসহর পত্রিকা', আশ্বিন, ১২৭৮
১৫৩. ঐ
১৫৪. 'কুলীন বহুবিবাহ', 'বামাবোধিনী', পৌষ, ১২৭০
১৫৫. 'বহুবিবাহ', 'এডুকেশন গেজেট', ৪. ১১. ১৮৭১
১৫৬. 'কুলকালিমা' (কলকাতা, ১২৮০), পৃ. ৮৩
১৫৭. 'সনাতন ধর্মোপদেশনী', ভাদ্র, ১২৭৮
১৫৮. 'পণ্ডিত কুলতিলক মহাত্মা তারানাথ তর্কবাচস্পতির জীবনচরিত', শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন (কলকাতা, ১৩০০), পৃ. ২৫
১৫৯. *One side of Koolin Polygamy*, *The Friend of India*, 21. 4. 1873
১৬০. 'মধ্যস্থ', ২৮ বৈশাখ, ১২৮০
১৬১. 'বহুবিবাহ', 'এডুকেশন গেজেট', ১. ৯. ১৮৭১
১৬২. 'জ্ঞানাঙ্কুর', কার্তিক, ১২৮১
১৬৩. *The Literature of Bengal*, R. C. Dutt, pp. 73-4
১৬৪. 'বঙ্গদর্শন', আষাঢ়, ১২৮০
১৬৫. 'বহুবিবাহ'···দ্বিতীয় পুস্তক, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (কলকাতা, ১৮৭৩), পৃ. ২৪১
১৬৬. *The Hindoo Patriot*, 23. 6. 1873
১৬৭. ঐ
১৬৮. *Banga Darsan Versus Iswara Chandra Vidyasagar*, *The Bengalee*, 2. 8. 1873
১৬৯. ঐ
১৭০. *Jonye*, *The Hindoo Patriot*, 26. 3. 1866
১৭১. 'বহুবিবাহ', 'বঙ্গমিহির', শ্রাবণ, ১২৮০
১৭২. ঐ
১৭৩. 'বঙ্গদর্শন ও বহুবিবাহ' (আখ্যাপত্র বিনষ্ট), পৃ. ১-২
১৭৪. 'ভারত সংস্কারক', ৬. ৯. ১৮৭৩
১৭৫. *The Calcutta Review*, Vol. 57, p. XVIII
১৭৬. 'কুলীনকামিনী ও বিধবারমণী', 'মধ্যস্থ', ৭ ভাদ্র, ১২৮০
১৭৭. 'কুলকালিমা' (কলকাতা, ১২৮০), পৃ. ৮৬

১৭৮. 'কৌলীন্যের ফল', 'এডুকেশন গেজেট', ১১. ৭. ১৮৭৩

১৭৯. *General (Misc) Pros.* No. 4B, May, 1875

১৮০. ঐ No. 6B, May, 1875

১৮১. ঐ No. 5B, May, 1875

১৮২. 'এডুকেশন গেজেট,' ৯. ৫. ১৮৭৩

১৮৩. 'বহুবিবাহ', 'সমাজদীপিকা', জ্যৈষ্ঠ, ১২৯২

১৮৪. 'বর্তমান বঙ্গসমাজ ও চারিজন সংস্কারক', মাসিক সমালোচক, ১২৮৬, পৃ. ৩১৮-৯

১৮৫. 'সাধারণী', ৬. ২. ১৮৭৬

১৮৬. 'সোমপ্রকাশ', ১৯. ৭. ১৮৮০

১৮৭. *Some thoughts on polygamy*, Umapada Basu, *The National Magazine*, September, 1891

লেখক বিদ্যাসাগর : সমকালের চোখে

সাহিত্যক্ষেত্রে বিদ্যাসাগরের আবির্ভাব পাঠ্যপুস্তক রচয়িতা হিসাবে। ১৮৪১-এ ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে যোগদানের পর যেসব বাংলা বই (যেমন পুরুষপরীক্ষা, হিতোপদেশ) তাঁকে পড়াতে হত, সেগুলি হয় নিতান্ত দুর্বোধ্য, আর না হয় আদিরসাত্মক। ফলে এখানে যোগ দেবার পর থেকেই, ছাত্রপাঠ্য একটি পুস্তকের অভাব তিনি অনুভব করতে থাকেন। এই অভাব পূরণের জন্য একটি বই লেখার কথাও তাঁর মাথায় আসে। এ-বিষয়ে সবরকম উৎসাহ, সাহায্য ও সহযোগিতা তিনি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সেক্রেটারি মার্শালের কাছ থেকে পান। প্রধানত মার্শালের উৎসাহেই ১৮৪৭-এ 'বৈতাল পচীসী' নামক হিন্দি পুস্তক অবলম্বনে তিনি রচনা করেন 'বেতাল পঞ্চবিংশতি'। প্রকাশের বছর দুয়েকের মধ্যে বইটির দ্বিতীয় সংস্করণ হয়। এই সংস্করণের বিজ্ঞাপনে বিদ্যাসাগর বলেন: 'যৎকালে প্রথম প্রচারিত হয়, আমার এমন আশা ছিল না, বেতালপঞ্চবিংশতি সর্বত্র পরিগৃহীত হইবেক। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে, বাঙ্গালা ভাষার অনুশীলনকারী ব্যক্তিমাত্রেই আদরপূর্বক গ্রহণ করিয়াছেন এবং এতদ্দেশীয় প্রায় সমুদয় বিদ্যালয়েই প্রচলিত হইয়াছে।'

যত সহজে কথাগুলি বিদ্যাসাগর লিখেছেন, 'বেতালপঞ্চবিংশতি'র প্রচার কিন্তু তত সহজে হয়নি।

১৮৪৭-এ 'বেতালপঞ্চবিংশতি' প্রকাশিত হলে এটিকে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পাঠ্যপুস্তক হিসাবে গ্রহণ করা যায় কিনা, তা কলেজ কর্তৃপক্ষ কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে জানতে চান। তিনি বইটিকে পাঠ্যপুস্তক করার বিপক্ষে মত প্রকাশ করেন। বিদ্যাসাগর তখন নিরুপায় হয়ে শ্রীরামপুর মিশনারিদের শরণাপন্ন হন। বিদ্যাসাগরের অবস্থা বুঝতে পেরে জন ক্লার্ক মার্শম্যান প্রচলিত সমস্ত গদ্যগ্রন্থের মধ্যে 'বেতালপঞ্চবিংশতি'কে সর্বোৎকৃষ্ট বলে এক প্রশংসাপত্র দেন।[১] মনে হয়, শ্রীরামপুর মিশনারিদের কাছ থেকে অনুকূল প্রশংসাপত্র সংগ্রহের ব্যাপারে বিদ্যাসাগর মার্শালের কাছ থেকে সাহায্য পেয়েছিলেন। এরপর এটিকে পাঠ্যপুস্তক করতে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ কর্তৃপক্ষের আর কোনো বাধা রইল না। ঠিক কি কারণে কৃষ্ণমোহন 'বেতালপঞ্চবিংশতি' সম্পর্কে আপত্তি করেন, তা আমরা জানি না। তবে দুর্বোধ্যতা ও অশ্লীলতা ছাড়া এ বইয়ের বিরুদ্ধে বলার মতো আর কিছু তিনি খুঁজে পেয়েছিলেন কিনা সন্দেহ।

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে চালু হবার পর, মার্শালের অনুরোধে সরকার এটিকে বাংলার বিভিন্ন স্কুল-কলেজে পাঠ্যপুস্তক হিসাবে মনোনীত করেন। কিন্তু হিন্দু কলেজের ম্যানেজাররা এটিকে পাঠ্যতালিকাভুক্ত করতে অস্বীকার করেন। বইটি

পরীক্ষা করে হিন্দু কলেজের সেক্রেটারি রসময় দত্ত দেখলেন : 'it contained a collection of hackneyed and somewhat indecent fables quite unsuited for the purpose.'[২] সেই কারণে হিন্দু কলেজের পক্ষ থেকে ১২. ৬. ১৮৪৭-এ সরকারকে পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দেওয়া হয়, বইটি হিন্দুকলেজের যুবক ছাত্রদের পাঠোপযোগী নয় ('they consider the 'Betal Pucheesee' to be unsuited for the young students of the Hindoo College')।[৩]

এই চিঠি পাবার পর সরকার একটু বিপাকে পড়েন। কারণ বইটি যদি হিন্দু কলেজের তরুণ ছাত্রদের পাঠোপযোগী না হয়, তাহলে অন্য বিদ্যালয়ের ছাত্রদেরও এটি অনুপযোগী। তাই মার্শালের কাছে সরকারের পক্ষ থেকে জানতে চাওয়া হয়, বাংলা ভাষায় পরিপূর্ণ ও নির্ভুল জ্ঞান অর্জনের পক্ষে বইটি কতখানি সহায়ক এবং এটিতে তরুণদের অনুপযোগী কোনো অশ্লীল আদিরসাত্মক অংশ আছে কিনা। উত্তরে মার্শাল জানান :

'The style and diction of the work in question are admitted by all competent judges whom I have met with to be unexceptionable. I have read the work through and consider it to be in this respect to be unsurpassed probably unequalled. The author has endeavoured to raise the standard of the language by introducing occasionally and I think judiciously certain Sanskertism, which may be distasteful to the anglicized Hindus of the old school.'

অশ্লীলতার অভিযোগ সম্পর্কে তিনি বললেন :

'There are not in my opinion any passages of an indecent or immoral nature. The incidents perhaps turn too often on the 'tender passion' for the present standard of European taste but the language is very guarded, a great improvement having been made in this respect on the Hindi 'Betal Pucheesee', of which it is a translation. Instances of immorality are introduced, but never flippantly and always I believe with reprehension. False morality is to be found, no doubt, as will be the case with all Hindu works of former ages. Had there been any other work combining more sterling qualities with elegance and purity of diction, I should have recommended it, instead of that under consideration. As it was, I assigned it to one of the highest classes the second, and I think it may safely be put into the hands of those youths who can be trusted with the works of Shakespeare and Pope, to say nothing of Horace and Ovid.'[৪]

মার্শালের মতামত পাবার পর, সরকার তাঁর চিঠির একটি কপি হিন্দু কলেজের ম্যানেজারদের পাঠিয়ে 'বেতালপঞ্চবিংশতি' সম্পর্কে তাঁদের পূর্ব মনোভাব পরিত্যাগ করে, পাঠ্যবই হিসাবে এটিকে চালু করার অনুরোধ জানান।

লক্ষ্য করবার বিষয়, 'বেতালপঞ্চবিংশতি' সম্পর্কে সমকালের বাঙালিসমাজের বিরূপ ধারণাকে দূর করার জন্য বিদ্যাসাগরকে বারবার বিদেশিদের শরণাপন্ন হতে হয়েছে। মার্শম্যান এবং মার্শালের অকুণ্ঠ সহযোগিতা না পেলে এটি পাঠ্যপুস্তক হিসাবে সর্বত্র চালু হতে পারত কিনা সন্দেহ। বিনা কারণে বিদ্যাসাগর যে নিজের ঘরে মার্শালের প্রতিকৃতি রাখেননি, তা বোঝাই যাচ্ছে।

পাঠ্যপুস্তক হিসাবে চালু হলেও, এই বইয়ের বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ উঠেছিল, বিদ্যাসাগর সেগুলিকে পুরোপুরি অগ্রাহ্য করতে পারেননি। দ্বিতীয় সংস্করণের 'বিজ্ঞাপনে' তাই তিনি উল্লেখ করেন, 'যে যে স্থান কোনও অংশে অপরিশুদ্ধ ছিল, পরিশোধিত হইয়াছে এবং অশ্লীল বাক্য ও উপাখ্যানভাগ পরিত্যক্ত হইয়াছে।' তা হবার পর সরকার এটিকে জুনিয়র স্কলারশিপ পরীক্ষার পাঠ্যতালিকাভুক্ত করেন। দ্বিতীয় সংস্করণে ভাষার জড়তা কাটিয়ে ওঠার জন্য দীর্ঘ সমাসবহুল পদ ত্যাগ করলেও, 'প্রাড়বিবাক', 'মলিম্লুচ', 'বৈয়র্থ্য', 'মহানস' প্রভৃতি আভিধানিক শব্দের মায়া বিদ্যাসাগর ত্যাগ করতে পারেননি। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তাই সংস্কৃত ঘেঁষা এই বইটির ভাষাকে 'বাংলা না বলে সংস্কৃতও বলা যেতে পারে'—বলে মন্তব্য করেন। তাঁর মতে এই জাতীয় বই পড়ে পণ্ডিতরা খুব খুশি হয়ে বলতেন 'এমন বই-ই লিখেছে যে অভিধান ভিন্ন একটা কথাও বুঝিবার জো নাই।' দ্বিতীয় সংস্করণে আদিরসাত্মক উপাখ্যানগুলি বাদ দিলেও, এটি যে একটি অশ্লীল বই এবং বিদ্যালয়ে পাঠ্য হওয়া উচিত নয়, একথা সেকালে অনেকেই মনে করতেন।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাংলায় অশ্লীলতাবিরোধী আন্দোলন বারবার মাথা-চাড়া দেয়। পঞ্চাশের দশকে এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন জেমস লং। এই আন্দোলনকে বিদ্যাসাগর সমর্থন করতেন। যে কারণে 'ঋজুপাঠ'-এর প্রথম ভাগে তিনি পঞ্চতন্ত্রের কিছু অংশ সংকলন করলেও, অশ্লীল উপাখ্যানগুলি বাদ দেন। 'ঋজুপাঠ'-এর তৃতীয় ভাগে তিনি হিতোপদেশ, বিষ্ণুপুরাণ, মহাভারত, ভট্টিকাব্য, ঋতুসংহার ও বেণীসংহার থেকে অংশবিশেষ সংকলন করেন। ভূমিকায় তিনি হিতোপ-দেশের মতো একটি বালকপাঠ্য গ্রন্থে অশ্লীল উপাখ্যানের ছড়াছড়ি দেখে বিস্ময়প্রকাশ করে বলেন, 'বালকদিগের নিমিত্ত নীতিপুস্তক লিখিতে আরম্ভ করিয়া, কি প্রকারে গ্রন্থকর্তার ঐরূপ অশ্লীল উপাখ্যান সংকলন করিতে প্রবৃত্তি হইল।' কালিদাসের রচনায় আদিরসের প্রাচুর্যও তাঁর চোখ এড়ায়নি। তাঁর মতে 'ঋতুসংহারের অধিকাংশই আদি-রস ঘটিত। বিশেষতঃ হিম, শিশির, বসন্তবর্ণনা আদিরসে এত পরিপূর্ণ, যে ঐ তিন সর্গ কোনক্রমেই বালকদিগের পাঠযোগ্য নহে। এই নিমিত্ত, গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ

বর্ণনামাত্র এই পুস্তকে পরিগৃহীত হইল। এই তিন সর্গেরও আদিরসঘটিত শ্লোকসকল পরিত্যক্ত হইয়াছে।'[৫] এতেও সন্তুষ্ট না হয়ে তিনি কালিদাসের কোনো কোনো বইয়ের আদিরসাত্মক অংশগুলি বাদ দিয়ে সংস্করণ বার করেন। 'বেতালপঞ্চবিংশতি'র লেখকের এই ধরনের কাজকে কটাক্ষ করে সমকালীন একটি পত্রিকায় অজ্ঞাতনামা জনৈক লেখক (সম্ভবত, কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য) লেখেন ঃ

'বেতাল একখানি দিব্যি বহি। কেহ কেহ বলে, ইহা আপনার নিজের নয়, হিন্দি থেকে তর্জমা করা। কিন্তু সেটা বড় কাজের কথা নয়, কেবল বক্তার ঈর্ষা ও দ্বেষের পরিচয় দেয় মাত্র।···তাহারা বুঝে না যে, হিন্দিতে শুদ্ধ কঙ্কালখানা পাইয়া রক্তমাংস চর্ম দিয়া এত চমৎকার কাণ্ড সৃষ্টি করিতে কত ক্ষমতা, কত কৌশল, কত বুদ্ধি দরকার করে। ফলতঃ হিন্দির তাই থেকে আপনি যে বেতালকে এক সরস মেওয়া করিয়া তুলিয়াছেন, ইহা সামান্য কথা নহে। সংস্কৃত শাস্ত্রের সুধানির্ঝরে ভিজিয়া যাহার মন সরস হইয়া আছে, সে ব্যতীত আর কেহ এমন করিতে পারিত না। আমি বেতালের আগাগোড়া ভালোবাসি। কিন্তু সেইখানটা—যেখানে ব্রাহ্মণ রাজাকে আশীর্বাদ করিতেছেন—এক অদ্ভুত ও হৃদয় বিলোড়ন রচনা। কোন কোন ধর্মভীরু মহোদয় আবার বেতালকে অশ্লীল ও যুবকদিগের পাঠের অযোগ্য বলিয়া থাকেন এবং আমি শুনিতে পাই যে, আপনিও নিজে এখনকার ছাপান বেতালের কোন কোন অংশ কেবল সেই বিষয়ে বাড়াবাড়ি বলিয়া ছাড়িয়া দিতেছেন। কিন্তু যাহা হউক, তদ্বিষয়ে আমি আর কিছুই বলিতে চাহি না, কেবল এই ভাবিয়া হাসিও পায়, দুঃখও ধরে, যে মহাশয় যখন প্রথম বেতাল লেখেন, তখন কি স্বপ্নেও জানিতেন যে ভবিষ্যতে কালেজের অধ্যক্ষ হইয়া রঘুকুমারাদি কাব্যের অশ্লীল ভাগগুলি ঝেঁটাইয়া সাফ করিয়া দিতে হইবে। মানুষের ভাগ্য এমনি বিপর্য্যসিনী। ইহারই নাম দৈবের লেখা রে।'[৬]

এইসব লেখালিখিকে বিদ্যাসাগর বিশেষ গুরুত্ব দেননি। তাই কিছুদিন পরে 'কুমারসম্ভব' সম্পাদনা করার সময় কালিদাসের ওপর কলম চালাতেও তিনি দ্বিধা করলেন না। 'কুমারসম্ভব'-এর রতিবিলাপে কালিদাস ব্যবহৃত 'স্তন' কথাটি অশ্লীল মনে হওয়ায়, বিদ্যাসাগর সেটি কেটে 'বক্ষ' করে দেন। তাঁর এই কাজ সমকালে প্রশংসিত হয়নি। বিদ্যাসাগরের এই কাজ সম্পর্কে সমকালীন একটি পত্রিকা মন্তব্য করে ঃ

'বিদ্যাসাগর মহাশয় একবার কুমারসম্ভবের রতিবিলাপে স্তন শব্দ কাটিয়া বক্ষ করিয়াছিলেন। সেইদিন অবশ্য তাঁহার মনে উদয় হইয়াছিল স্তন কথাটি অশ্লীল। কিন্তু আমরা বোধ করি, স্থানবিশেষে ও অর্থবিশেষে ভিন্ন-ভিন্ন প্রকার অর্থ হয়।'[৭]

বিদ্যাসাগরের এই বিচিত্র মনোভাবকে কটাক্ষ করে 'তমোলুক পত্রিকা' লেখে ঃ

'বেথুন সাহেবের আমোলে অশ্লীলতার মহা আন্দোলন হইবাতে কতকগুলি সাহেব সন্তোষকারী মহাপুরুষ ক্ষেপিয়াছিলেন।···যে বিদ্যাসাগর 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' নামে নেড়ির দলের গানের যোগ্য খেঁউড় গ্রন্থ বিদ্যালয়ে পাঠ্যপুস্তক করাইয়াছিলেন, তিনিও

মত্ত হইয়া কালিদাসের গ্রন্থের স্থানে স্থানে অশ্লীলতা নিবারণার্থ পরিবর্তন করিয়াছিলেন।'[৮]

এইসব লেখালিখি চলাকালীনই কেশবচন্দ্র সেনের উদ্যোগে কলকাতায় অশ্লীলতা-নিবারণী সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। সভার সভ্যরা বটতলার বই আর ভারতচন্দ্রের কাব্যের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেন। সভার কার্যকলাপকে পত্রপত্রিকাগুলি কটাক্ষ করলেও, বঙ্কিমচন্দ্র এর সমর্থনে 'বঙ্গদর্শন'-এ দীর্ঘ এক প্রবন্ধ লেখেন। বিদ্যাসাগরও সভার কার্যকলাপকে সমর্থন জানাতে দ্বিধা করলেন না। 'বেতালপঞ্চবিংশতি'র মতো 'অশ্লীল' গ্রন্থের লেখক অশ্লীলতাবিরোধী আন্দোলনের সমর্থনে এগিয়ে এসেছেন দেখে সেকালে অনেকেই কৌতুকবোধ করেন। বিদ্যাসাগরের এই বিচিত্র মনোভাবকে কটাক্ষ করে কাঁসারীপাড়ার সং-এর দল একটি গান বাঁধে। গানটির প্রথম স্তবকটি এইরকম ঃ

'আজব শহর কলকেতা
হেথা ঘুঁটে পোড়ে গোবর হাসে
বলিহারি সভ্যতা।
সহরে এক নতুন হুজুগ
উঠেছে রে ভাই,
অশ্লীলতা শব্দ মোরা
আগে শুনি নাই,
এর বিদ্যাসাগর জন্মদাতা,
বঙ্গদর্শন এর নেতা।'[৯]

বলে রাখা ভালো, অশ্লীলতানিবারণী আন্দোলনের কট্টর সমর্থক বিদ্যাসাগরের বিরুদ্ধে এইসময়ই নতুন করে অশ্লীলতার অভিযোগ ওঠে। পরবর্তীকালে ১৮৯০-এ তিনি 'শ্লোকমঞ্জরী' নামে যে বইটি প্রকাশ করেন, তার পরিশিষ্টে আদিরসাত্মক চল্লিশটি শ্লোক সংকলিত হয়। এর কৈফিয়ৎস্বরূপ তিনি বলেন, বইটি পাঠ্যপুস্তক হিসাবে লিখিত হয়নি, কাজেই 'ইহাতে আদিরসাত্মক শ্লোকের সম্ভাব কোনও অংশে দোষাবহ হইতে পারে না।'[১০]

'দোষাবহ' হোক না হোক, অশ্লীলতার দায়ে বিদ্যাসাগরের 'বেতালপঞ্চবিংশতি' যে একসময় অভিযুক্ত হয়েছিল, তা অস্বীকার করা যায় না। এই অভিযোগ ছাড়াও 'বেতালপঞ্চবিংশতি' রচনার গৌরব কতখানি বিদ্যাসাগরের প্রাপ্য, তা নিয়েও সেকালে প্রশ্ন উঠেছিল। মদনমোহন তর্কালঙ্কারের জামাই যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ ১৮৭১-এ মদনমোহনের যে জীবনীগ্রন্থ প্রকাশ করেন তাতে 'বেতালপঞ্চবিংশতি' রচনার ক্ষেত্রে মদনমোহনের বিশেষ অবদান প্রসঙ্গে মন্তব্য করা হয়, 'বিদ্যাসাগর প্রণীত বেতালপঞ্চবিংশতিতে অনেক নূতন ভাব ও অনেক সুমধুর বাক্য তর্কালঙ্কার দ্বারা অন্তর্নিবেশিত হইয়াছে। ইহা তর্কালঙ্কার দ্বারা এতদূর সংশোধিত ও পরিমার্জিত হইয়াছিল যে বোমাণ্ট ও ফ্লেচরের লিখিত গ্রন্থগুলির ন্যায় ইহা উভয় বন্ধুর রচিত

বলিলেও বলা যাইতে পারে।'[১১] এই অভিযোগে বিদ্যাসাগর রীতিমতো বিচলিত বোধ করেন এবং যোগেন্দ্রনাথের অভিযোগ যে অলীক ও অসঙ্গত তা 'বেতাল-পঞ্চবিংশতি'র দশম সংস্করণের বিজ্ঞাপনে (১৮৭৬) তুলে ধরার চেষ্টা করেন। এখানে তিনি জানান, 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' লিখে প্রকাশ করার আগে তিনি তা গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন ও মদনমোহন তর্কালঙ্কারকে শুনিয়েছিলেন। তাঁদের পরামর্শে দু' একটি শব্দ ছাড়া মূল গ্রন্থের কিছুই তিনি পরিবর্তন করেননি। এই অভিযোগ সম্পর্কে গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্নের মত জানতে চাইলে, ১২ বৈশাখ, ১২৮৩-তে একটি চিঠিতে বিদ্যাসাগরকে তিনি জানান, 'বেতালপঞ্চবিংশতি' সম্পর্কে যোগেন্দ্রনাথের দাবি 'নিতান্ত অলীক ও অসঙ্গত।' আসল ব্যাপার হল 'আপনি বেতাল পঞ্চবিংশতি রচনা করিয়া আমাকে ও মদনমোহন তর্কালঙ্কারকে শুনাইয়াছিলেন। শ্রবণকালে আমরা মধ্যে মধ্যে স্ব স্ব অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতাম। তদনুসারে স্থানে স্থানে দুই একটি শব্দ পরিবর্তিত হইত। বেতাল পঞ্চবিংশতি বিষয়ে আমার অথবা তর্কালঙ্কারের এতদতিরিক্ত কোন সংস্রব বা সাহায্য ছিল না।' আত্মপক্ষসমর্থনে গিরিশচন্দ্রের এই চিঠিটিও বেতালের দশম সংস্করণে বিদ্যাসাগর প্রকাশ করেন।

প্রশ্ন উঠবে, হঠাৎ যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাসাগরের বিরুদ্ধে এমন অভিযোগ করলেন কেন? আসলে এই ঘটনাটি যোগেন্দ্রনাথ তারানাথ তর্কবাচস্পতির কাছে শুনেছিলেন।[১২] বহুবিবাহ নিবারণ সংক্রান্ত প্রশ্নে বিদ্যাসাগরের সঙ্গে তারানাথের সম্পর্ক একসময় তিক্ততার চরম পর্যায়ে পেঁছেছিল। বিদ্যাসাগর চরিত্রে কলঙ্কলেপন করার জন্যই হয়ত তারানাথ এইরকম একটি কাহিনী যোগেন্দ্রনাথকে বলেছিলেন। আর যোগেন্দ্রনাথও তা ভালোভাবে যাচাই না করেই বইতে স্থান দিয়েছিলেন।

'বেতাল পঞ্চবিংশতি' সমকালে নানারকম বিতর্ক সৃষ্টি করলেও, বইটির জনপ্রিয়তার ওপর তা কোনো ছাপ ফেলতে পারেনি। যে কারণে জেমস লং বইটিকে 'very popular' বলে চিহ্নিত করেন। বইটি সেযুগে এতই জনপ্রিয় ছিল যে ঘরের বউ-ঝিরা পর্যন্ত আগ্রহ নিয়ে এর পাঠ শুনত। দীনবন্ধুর 'নীলদর্পণ' নাটকে সৈরিন্ধ্রীকে বলতে শুনি, 'ছোট বউ রসিস আমি আসচি, বিদ্যাসাগরের বেতাল শুনবো।'

বিদ্যাসাগরের পরবর্তী বই 'বাঙ্গালার ইতিহাস' (দ্বিতীয় ভাগ) বেশ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের ছাত্রদের জন্য মার্শম্যানের 'আউট লাইনস অফ হিস্ট্রি অফ বেঙ্গল'-এর শেষ নয় অধ্যায় অবলম্বনে তিনি এটি রচনা করেন। প্রসঙ্গত স্মরণীয়, ১৮৩৫ থেকে বাংলার ইতিহাস বিদ্যালয়ের নিম্নশ্রেণীতে পাঠ্যবিষয় হিসাবে নির্বাচিত হয়। এর ফলে উনিশ শতকের তৃতীয় ও চতুর্থ দশকে স্কুলপাঠ্য ইতিহাস রচনায় দেশীয় লেখকদের প্রচুর আগ্রহ দেখা যায়। মার্শম্যানের গ্রন্থের একাধিক অনুবাদও এইকালে প্রকাশিত হয়। বিদ্যাসাগরের আগেই মার্শম্যানের বই

অবলম্বনে ১৮৪০-এ গোবিন্দচন্দ্র সেন 'বাঙ্গালার ইতিহাস' রচনা করেন। ১৮৪৮-এ বিদ্যাসাগরের 'বাঙ্গালার ইতিহাস' (দ্বিতীয় ভাগ) প্রকাশিত হলে পাঠ্যপুস্তক হিসাবে এটিকে চালু করার জন্য মার্শাল সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেন। তাঁর চেষ্টায় প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে এটি সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে এবং বাংলার স্কুলগুলিতে পাঠ্যপুস্তক হিসাবে 'সমাদরের সঙ্গে গৃহীত হয়'। বইটির ভাষার প্রশংসা আমরা লং সাহেবের মুখে শুনতে পাই।[১৩] অনুবাদকালে বিদ্যাসাগর মার্শম্যানের সমস্ত বক্তব্যকে নির্বিচারে গ্রহণ করায় সেকালে কেউ কেউ ক্ষুণ্ণ হয়েছিলেন। মার্শম্যানের অনুসরণে সিরাজকে কৃষ্ণবর্ণে চিত্রিত করায় বিদ্যাসাগর-জীবনীকার সুবলচন্দ্র মিত্র বেদনাবোধ করেন। ক্ষোভের সঙ্গে তিনি বলেন, বিদ্যাসাগরের লাইব্রেরিতে অনেক মূল্যবান ইতিহাস গ্রন্থ আছে, যদি তিনি কষ্ট করে সেগুলি পড়তেন, তাহলে তাঁর ধারণা পালটে যেত। অন্ধকূপ হত্যার কাহিনী বিদ্যাসাগর বর্ণনা করেছেন—কিন্তু এই হত্যাকাণ্ড আদৌ ঘটেছিল কিনা সে বিষয়েই তো সংশয় আছে।[১৪]

'বাঙ্গালার ইতিহাস' (দ্বিতীয় ভাগ) প্রকাশের অল্পদিনের মধ্যে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সেক্রেটারি মার্শাল সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় বিদ্যাসাগরের বইটি ইংরেজিতে অনুবাদ করেন। ইংরেজি থেকে অনূদিত একটি গ্রন্থ আবার ইংরেজিতে অনুবাদের কারণ ব্যাখ্যা করে বইটির ভূমিকায় মার্শাল বলেন ঃ

'My principal object in this undertaking have been to give specimen of close and accurate translation combined with a due regard to the idiom of the language translated into, and to illustrate by notes the etymology and idiomatic peculiarities of the language translated from. I have added Notes and observations bearing upon the Geography and Statistics of Bengal, and the opinions and customs of its inhabitants. Taking the work as a whole, it may be considered as conveying hints on a number of intersting subjects; and on this ground, I have ventured to style it a 'Guide to Bengal.'[১৫]

'বাঙ্গালার ইতিহাস' (দ্বিতীয় ভাগ) প্রকাশের পরের বছর বিদ্যাসাগর চেম্বর্সের 'বায়োগ্রাফি' অবলম্বনে রচনা করলেন 'জীবনচরিত'। এটি যে একটি ছাত্রপাঠ্য গ্রন্থ তা 'জীবনচরিত'-এর প্রথমবারের বিজ্ঞাপন থেকে বোঝা যায়—'রবর্ট ও উইলিয়ম চেম্বর্স বহুসংখ্যক সুপ্রসিদ্ধ মহানুভবদিগের বৃত্তান্ত সঙ্কলন করিয়া ইঙ্গরেজি ভাষায় যে জীবনচরিত পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদিত হইলে, এতদ্দেশীয় বিদ্যার্থিগণের পক্ষে বিশিষ্টরূপ উপকার দর্শিতে পারে, এই আশয়ে আমি ঐ পুস্তকের অনুবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম।' অনুবাদ প্রসঙ্গে তিনি বলেন 'বাঙ্গালায়

ইঙ্গরেজির অবিকল অনুবাদ করা অত্যন্ত দুরূহ কর্ম ; ভাষাদ্বয়ের রীতি ও রচনাপ্রণালী পরস্পর নিতান্ত বিপরীত।' তা সত্ত্বেও 'এই অনুবাদ বিদ্যার্থিগণের পক্ষে নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর' হবে না বলে বিদ্যাসাগর আশা প্রকাশ করেন। বিদ্যাসাগর অবশ্য গোটা বইটি 'সময়াভাব ও অন্যান্য কতিপয় প্রতিবন্ধকবশতঃ' অনুবাদ করতে পারেননি— কোপার্নিকস, গালিলিয়, নিউটন, হর্শেল, গ্রোশ্যস, লিনিয়স, ডুবাল, জেঙ্কিন্স ও জোন্স এই ন'জনের জীবনচরিত তিনি বাংলায় রচনা করেন। প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে এই বইটিও পাঠ্যপুস্তক হিসাবে ছাত্রমহলে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে এবং ছ মাসের মধ্যে 'প্রথম মুদ্রিত সমুদায় পুস্তক নিঃশেষিত হয়'। সরকারি রিপোর্টেও বিদ্যাসাগরের বইটির জনপ্রিয়তার প্রমাণ মেলে। ১৮৪৯-৫০-এর ডি. পি. আই রিপোর্টে বলা হয় : 'The same gentleman (Pundit Eshwar Chandra Shurma) has also prepared a translation of Chamber's Biographical course, which is highly spoken of, and has been much used in our schools and colleges.'[১৬] সমকালে কোনো-কোনো পত্রিকাও বইটির প্রশংসা করে। ২৯ নভেম্বর, ১৮৫৪-য় 'সংবাদ প্রভাকর' মন্তব্য করে :

'আধুনিক পুস্তকাদির মধ্যে পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বেতাল পঞ্চবিংশতি ও জীবনচরিত প্রভৃতি যে কতিপয় পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন তৎপাঠে সকলেরই প্রয়াস জন্মে।'

'সংবাদ প্রভাকর' প্রশংসা করলেও, এদেশীয় বালকদের কাছে শুধু বিদেশীয়দের চরিত্র ও ব্যবহারকে আদর্শ হিসাবে দেখানোর ব্যাপারটি অনেকেই এ যুগে ভালোচোখে দেখেননি। ইংরেজি থেকে অনুবাদের ক্ষেত্রেও বিদ্যাসাগর তেমন কৃতিত্ব দেখাতে পারেননি এই বইটিতে। ফলে অনেক জায়গায় ভাষা হয়ে উঠেছে অত্যন্ত আড়ষ্ট। নিউটনের জীবনচরিত অনুবাদ প্রসঙ্গে তিনি লেখেন :

'পাঠশালার সকল বালকই, বিরামের অবসর পাইলে, খেলায় আসক্ত হইত ; কিন্তু তিনি সেইসময়ে নিবিষ্টমনা হইয়া, ঘরট্ট প্রভৃতি যন্ত্রের প্রতিরূপ নির্মাণ করিতেন। একদা, তিনি একটা পুরাণ বাক্‌স লইয়া জলের ঘড়ী নির্মাণ করিয়াছিলেন। ঐ ঘড়ীর শঙ্কু, বাক্‌সমধ্য হইতে অনবরতনির্গত জল বিন্দুপাত দ্বারা নিমগ্নকাষ্ঠ প্রতিঘাতে, পরিচালিত হইত ; বেলাবোধনার্থ তাহাতে একটি প্রকৃত শঙ্কুপট্ট ব্যবস্থাপিত ছিল।'[১৭]

এই ধরনের অনুবাদ সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে 'বঙ্গদর্শন'-এ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলেন, 'ইংরাজী পড়িলে বরং ইহা অপেক্ষা সহজে বুঝা যাইতে পারে।'[১৮] এই ধরনের কিছু কিছু বিরূপ মন্তব্য কানে আসায় বিদ্যাসাগর সিদ্ধান্ত করেন 'আর কখন ইঙ্গরেজি পুস্তকের অনুবাদ করিব না এবং এই পুস্তকও পুনর্মুদ্রিত করিব না।' বইটির রচনা-রীতিও এ যুগে অনেকের ভালো লাগেনি। কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের উক্তি প্রসঙ্গত স্মরণীয় —'জীবনচরিতে যেসকল বড় কথার নির্দেশ আছে, তাহার মূল্য তখন বুঝিয়াছিলেন

কিনা তদ্‌বিষয়ে আমার বিলক্ষণ সংশয় আছে, বিশেষতঃ প্রায় তাহার সর্বত্রই যে সকল বিজাতক সংস্কৃত শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহাদিগের অর্থ স্বয়ং ভালরূপে না বুঝিয়া গ্রন্থে বসাইয়া ভাল বা আপনার উপযুক্ত কর্ম হয় নাই। ফলতঃ দ্বিতীয়বারের বিজ্ঞাপনে আবার কখন ছাপাইবেন না বলিয়া যে সঙ্কল্প ছিল, তাহা সর্বত্র প্রশংসনীয়।'[১৯] কিন্তু 'প্রশংসনীয়' এই সঙ্কল্প বিদ্যাসাগর শেষপর্যন্ত বজায় রাখতে পারেননি। নতুন করে বাংলায় একটি জীবনচরিত লেখার তোড়জোড় শুরু করলেও, শেষপর্যন্ত সেটি লেখা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। নানা কারণে এই সময় তাঁর ব্যস্ততা এত বেড়ে যায় যে, কিছু কিছু সংস্কার করে 'জীবনচরিত'-এরই নতুন একটি সংস্করণ তিনি প্রকাশ করেন।

নতুন এই সংস্করণটি প্রকাশিত হবার কিছুদিন আগেই বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হয়েছেন (জানুয়ারি, ১৮৫১), সামাজিক বিভিন্ন কুপ্রথার প্রতি তাঁর দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে এবং এসব নিয়ে ভাবনাচিন্তাও শুরু করেছেন তিনি। সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষের দায়িত্বভার গ্রহণ করার অল্পদিনের মধ্যে ১৮৫১-র এপ্রিল মাসে 'অল্পবয়স্ক সুকুমারমতি বালক বালিকাদের জন্য' নানা ইংরেজি পুস্তক অবলম্বনে তিনি 'বোধোদয়' রচনা করেন। 'বোধোদয়' বিদ্যাসাগরের অন্যতম জনপ্রিয় পাঠ্যপুস্তক হলেও, সেকালে অনেকেই বইটিকে প্রীতির চোখে দেখেননি। বিদ্যাসাগর-জীবনীকার বিহারিলাল সরকারের মতে 'বোধোদয় হিন্দু সন্তানের সম্যক পাঠোপযোগী নহে। বোধোদয়ে বুদ্ধির অনেকস্থলে বিকৃতি ঘটিবারই সম্ভাবনা।' 'বোধোদয়ে' ঈশ্বর প্রসঙ্গ উপযুক্ত স্থান না পাওয়ায় বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ক্ষুব্ধ হয়ে বিদ্যাসাগরের কাছে অনুযোগ করেন। পরবর্তী সংস্করণে 'ঈশ্বর নিরাকার চৈতন্য-স্বরূপ' ও অন্যান্য কিছু কিছু উক্তি বিদ্যাসাগর যোগ করলেও, তা ঈশ্বরে নিবেদিত-প্রাণ মানুষদের তৃপ্ত করতে পারেনি। স্বামী বিবেকানন্দ 'বোধোদয়ে'র 'ঈশ্বর নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ' উক্তিটিকে কটাক্ষ করতে ছাড়েননি। 'বোধোদয়ে'র ভাষা সম্পর্কেও সেকালের মানুষের বেশ কিছু অভিযোগ ছিল, বইটির রচনাপ্রণালীও কারো কারো মনে হয়েছিল 'নীরস'। বইটির অন্য কিছু ত্রুটিও কারো কারো চোখে পড়ে-ছিল। বিদ্যাসাগর 'বোধোদয়'-এর 'কাল' নামক পরিচ্ছেদে লেখেন ঃ

'মুসলমানেরা মহম্মদের মক্কা হইতে পলায়নের, দিবস অবধি এক শাকের গণনা করেন, উহার নাম হিজিরা। ভারতবর্ষের প্রসিদ্ধ মোগল সম্রাট আকবর, হিজিরা নামের পরিবর্তে ঐ শাককে ইলাহী নামে প্রতিষ্ঠিত করেন। উহাই বাঙ্গালাদেশে সাল নামে প্রচলিত হইয়াছে।'

বিদ্যাসাগরের এই মত যে ঠিক নয় তা জানাতে গিয়ে উমেশচন্দ্র গুপ্ত একটি প্রবন্ধে[১৯ক] লেখেন ঃ

'কোনও পণ্ডিত হিজিরা বা এলাহী সনকে বঙ্গাব্দ বলিয়া জানেন না ও নির্দেশ করিয়া থাকেন না। হিজিরা সন আরবে, এলাহী সন দিল্লীতে এবং শালাব্দ বঙ্গদেশে

প্রবর্তিত ও সমারব্ধ। সরলপ্রাণ মহামনাঃ বিদ্যাসাগর এই ক্ষুদ্র পার্থক্যের কথা না ভাবিয়া, বোধোদয়ে ছিজিরা সনকে বাঙ্গলা শাল বলিয়া নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন।'

এই লেখাটি পড়ে সাহিত্য-সম্পাদক সুরেশচন্দ্র সমাজপতি ক্ষুব্ধ হয়ে উমেশচন্দ্রকে আক্রমণ করে বলেন, বিদ্যাসাগরের ভুল দেখাতে যাওয়াটা 'ধৃষ্টতাবিশেষ'। উমেশচন্দ্র এর উত্তরে সবিনয়ে জানান, বিদ্যাসাগর তাঁর 'অভীষ্ট দেবতা' হলেও, তাঁর 'প্রমাদ' পূজিত হতে পারে না। উমেশচন্দ্রের মতে 'অঋষি ও অসর্বজ্ঞ বিদ্যাসাগর'-এর 'প্রমাদ হইতে পারে না, এ কথাও আর এযুগে শোভা পায় না।'

রক্ষণশীল হিন্দুদের মুখপত্র 'বঙ্গবাসী' মনে করত, 'বোধোদয়' বইটি নানা অসঙ্গতিতে ভরা। ১৮৮৬-র ২৯ মে 'বোধোদয়ে'র অসঙ্গতি নিয়ে পত্রিকাটিতে ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি লেখাও প্রকাশিত হয়। লেখাটিতে শ্লেষাত্মক ভঙ্গিতে 'বোধোদয়ে'র অসঙ্গতিগুলিকে তুলে ধরা হয়। ব্যঙ্গরচনা হিসাবে এটি উদ্ধৃতিযোগ্য ঃ

'শিশুদিগের প্রতি উপদেশ
(বোধোদয় হইতে সঙ্কলিত)

১। পদার্থ তিন প্রকার। কতকগুলি চেতন, বাকিগুলি চেতন নয়, অর্থাৎ অচেতন; এই হইল দুই প্রকার। ইহাছাড়া আর এক প্রকার আছে, তাহা চেতনও নয়, চেতন নয়ও নয়, অর্থাৎ অচেতন নয়, কিন্তু সেগুলি ভুঁইফোঁড়, অর্থাৎ উদ্ভিদ। তবেই তিনপ্রকার হইল।

(ক) পরিশিষ্ট। এই তিনপ্রকার পদার্থ ছাড়া ইতস্ততঃ যে সকল বস্তু দেখিতে পাই, সে সমস্তই অপদার্থ। যেমন,

২। ঈশ্বর। ঈশ্বর চেতনও নয়, অচেতনও নয়, উদ্ভিদও নয়, কেবল নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ। ঈশ্বর যে নিরাকার ইহা সকলেই দেখিয়াছে, সুতরাং বুঝাইবার দরকার নাই। আর ঈশ্বর যে চৈতন্যস্বরূপ তাহাতে এই বুঝিবে যে, ঈশ্বর ভট্টাচার্য্যের নেড়া মাথার টীকিটীর মত, ঊর্দ্ধদিকে ভেদ করিয়া উঠে, অথচ উদ্ভিদ নয়; ঐ যে মাথার উপরে আছে, সেইখানেই থাকে, সে স্থান হইতে অন্যস্থানে যাইতে পারে না, তথাপি অচেতন নয়; এবং কাটিয়া দিলে আবার গজায়, ভট্টাচার্য্যের সঙ্গে যেখানে ইচ্ছা গমনাগমন করিতে পারে, অথচ চেতন পদার্থও নয়। সুতরাং ঈশ্বর নেহাৎ অপদার্থ। ফলে তাহাতে বিশেষ ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। যেহেতু—

৩। ঈশ্বর কি চেতন, কি অচেতন, কি উদ্ভিদ সমস্ত পদার্থের সৃষ্টি করিয়াছেন। তা, অপদার্থেও এসব কাজ পারে, যেমন কাণ্ডজ্ঞানহীন মহামূর্খ লোকও পুস্তকাদির সৃষ্টি করিয়া থাকে।

৪। সমুদয় চেতন পদার্থের সাধারণ নাম জন্তু। যেমন, গ্রন্থকার চেতন পদার্থ সুতরাং তিনিও জন্তুবিশেষ। এইজন্য বোধোদয় না হওয়াতেই জুয়লজিকাল গার্ডেন সর্বাঙ্গসুন্দর হইতে পারে নাই।

৫। প্রায় সকল জন্তুর পাঁচ ইন্দ্রিয় আছে। তাছাড়া, গোটাকতক জন্তুর ইন্দ্রিয়-দোষও আছে, যথা—

৬। পুত্তলিকার চক্ষু আছে, দেখিতে পায় না—এ তার ইন্দ্রিয় দোষ।

৭। যে সকল জন্তুর শরীরের চর্ম রোমশ অর্থাৎ রোমে আবৃত, এবং যাহারা চারি পায়ে চলে, তাহাদিগকে পশু কহে। যথা খোঁকা; তাহার প্রত্যেক লোমকুপে রোম আছে এবং তাহার শরীরে চর্মের উপর সেই রোম আছে এবং সে চারি পায়ে হামাগুড়ি দিয়া চলে, অতএব সে পশু। বোধোদয় পড়িলে পর, তবে সে মানুষ হইবে।

যে সকল জন্তুর শরীর ভিন্ন অন্য স্থানের চর্ম রোমশ হয়, যেমন কোন জন্তুর ভিস্তির চর্ম কিম্বা কোন জন্তুর তবলার চর্ম, যদি রোমশ হয়, তাহা হইলেও সে জন্তুকে পশু বলা যায় না।

পরিশিষ্ট। অনেক ভদ্রলোকে আসবাবের জন্য হরিণের কি ব্যাঘ্রের রোমশ চর্ম রাখিয়া থাকে। যদিও সেইসকল ভদ্রলোক জন্তু বটে, এবং যদিও তাহাদের সেই চর্ম রোমে আবৃত, এবং যদিও তাহারা সেই চর্ম চতুষ্পদ চেয়ারের উপর পাতিয়া বসিয়া থাকে, তথাপি তাহারা পশু নহে, কারণ সে চর্ম রোমশ হইলেও তাহাদের শরীরের চর্ম নহে, এবং চেয়ারের চারিখানা পা থাকিলেও সে বসিয়া থাকে, চলে না।

৮। জন্তুর মধ্যে পক্ষীজাতি দেখিতে অতি সুন্দর। তাহাদের সর্বাঙ্গ পালকে ঢাকা। পক্ষীর ঠোঁটে এবং পায়ে পালক হয় না, যেহেতু পক্ষীজাতির ঐ দুটি অঙ্গ সর্বাঙ্গ ছাড়া। সেই ঠোঁট এবং সেই পা অন্য কোন জন্তুর অঙ্গ বুঝিতে হইবে। নহিলে তাহা পালকে ঢাকা থাকিত।

৯। পক্ষী চতুষ্পদ নহে, কারণ উহার দুটী বই পা নয়। এজন্য [চতুষ্পদ] না বলিয়া দ্বিপদ বলা উচিত। মনুষ্যেরও দুটি বই পা নয়, কিন্তু মনুষ্য পক্ষী নহে; সেইজন্য তাহাকে চতুষ্পদ বলা যাইবে। দুটী বই পা নাই বলিয়া যদি চতুষ্পদ বলিতে আপত্তি থাকে, তাহা হইলে তাহাকে ত্রিপদ বলিলে চলিতে পারে।

পরিশিষ্ট। পক্ষীর যদি তিনটী পা থাকিত; তাহা হইলেও তাহাকে একদিন চতুষ্পদ বলা যাইত। কারণ দুটী বই পা না থাকাতেই পক্ষী চতুষ্পদ হইতে পারে নাই।

১০। ঈশ্বর কি অভিপ্রায়ে কোন জন্তুকে সৃষ্টি করিয়াছেন, আমরা তাহা অবগত নহি; এজন্য কতকগুলিকে পূজ্য ও পবিত্র জ্ঞান করি, আর কতকগুলিকে ঘৃণা করি। কিন্তু ইহা অন্যায় ও ভ্রান্তিমূলক। বিশ্বকর্তা ঈশ্বরের সন্নিধানে সকল জন্তুই সমান। যেমন গ্রন্থকর্তা এবং গাধা দুই-ই সমান। কারণ ঈশ্বর কি অভিপ্রায়ে গ্রন্থকর্তাকে সৃষ্টি করিয়াছেন, আমরা তাহা অবগত নহি। আমরা যে গ্রন্থকর্তাকে পূজ্য ও পবিত্র জ্ঞান করি, ইহা অন্যায় ও ভ্রান্তিমূলক। কারণ তাহা হইলে গাধাকেও পূজ্য ও পবিত্র জ্ঞান করিতে হয়।

১১। মানুষ পশুর ন্যায় চারি পায়ে চলে না, দুই পায়ের উপর ভর দিয়া সোজা হইয়া দাঁড়ায়, অর্থাৎ মোটেই চলে না, কেবল দাঁড়ায়, চলিতে হইলে চারি পায়ে চলিত।

১২। মনুষ্য ভিন্ন সকল জন্তুই কাঁচা বস্তু খাইয়া থাকে। মনুষ্যেরা কাঁচা বস্তু খায় না, খাইলে পরিপাক হয় না, পীড়াদায়ক হয়। এইজন্য মনুষ্যেরা কচু এবং কলা পোড়াইয়া খায়। কদাচ আম, কাঁঠাল, পেয়ারা, লিচু, জাম প্রভৃতি খায় না।

১৩। মনুষ্যের পাঁচ ইন্দ্রিয়। হিন্দুর একাদশ ইন্দ্রিয়। এজন্য হিন্দু মনুষ্য নয়।

১৪। মনুষ্যেরা মুখদ্বারা শব্দের উচ্চারণ করিয়া মনের ভাব ব্যক্ত করে। অন্য জন্তুরা, মনের ভাব ব্যক্ত করিতে হইলে, মুখ ছাড়া অন্য অঙ্গের দ্বারা শব্দ উচ্চারণ করিয়া থাকে।

১৫। যে বস্তু যাহার, সে ব্যক্তি পরিশ্রম করিয়া তাহা প্রাপ্ত হইয়াছে। বিনা পরিশ্রমে কেহ কোন বস্তু পাইতে পারে না। যে হাত পা যাহার, সে ব্যক্তি পরিশ্রম করিয়া সেই হাত পা পাইয়াছে। কারণ বিনা পরিশ্রমে কেহ হাত পা পাইতে পারে না।

১৬। ভিক্ষা করিলে পরিশ্রম ব্যতিরেকে কোন কোন বস্তু পাওয়া যায়। যেহেতু ভিক্ষা বাড়ী বসিয়াই হয়; এবং যে পিতা মরিলেই সম্পত্তি পায়, সে ঘোরতর পরিশ্রম করিয়াই পাইয়া থাকে। কারণ তাহাকে শ্রম স্বীকারপূর্বক মাতৃগর্ভে বাস করিতে হয়, এবং পিতামাতা কর্তৃক প্রতিপালিত হইতে হয়।

পরিশিষ্ট। ভিক্ষা করিলে কোন কোন বস্তু পাওয়া যায়, সকল বস্তু পাওয়া যায় না; যেমন টাকা পাওয়া যায় এবং টাকা দিয়া যাহা কেনা যায়, তাহাই পাওয়া যায়, আর কিছুই পাওয়া যায় না। ভিক্ষা করিলে রৌদ্র, জল, বাতাস প্রভৃতি কোন মতেই পাওয়া যায় না। অতএব হে বালকগণ! তোমরা কত পুণ্যফলেই এই বঙ্গদেশে জন্মগ্রহণ করিতেছ।'[২০]

শুধু ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ই নন, 'বোধোদয়'-এর রচনাভঙ্গি ও বিষয়বস্তু একালের এক বিশিষ্ট সাহিত্যসেবক দামোদর মুখোপাধ্যায়েরও ভালো লাগেনি। 'বোধোদয়'-কে ব্যঙ্গ করে লেখা তাঁর একটি রচনাও প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য ঃ

'বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 'বোধোদয়।'—পণ্ডিতবর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বোধোদয় সকলেই জানেন। আমরা একবার এক পণ্ডিত মহাশয়কে বোধোদয়ের ১ম পাঠের নিম্নলিখিতরূপ ব্যাখ্যা করিতে শুনিয়াছি ঃ—

'আমরা ইতস্ততঃ যে সকল বস্তু দেখিতে পাই, সে সমুদায়কে পদার্থ কহে।' পণ্ডিত মহাশয়ের অর্থ ঃ—

'ইস্তক জুড়িচড়া তেল চুকচুকে বাবু, নগাইদ রামী ভিখারিণী সকলেরই নাম পদার্থ।'

'পদার্থ ত্রিবিধ; চেতন, অচেতন, উদ্ভিদ।'

পণ্ডিত মহাশয়ের অর্থঃ—

'বাবু হইতে ভিখারী পর্য্যন্ত যত পদার্থ সকলেরই হয় চেতন, নয় অচেতন, নয় উদ্ভিদ এই তিনের কিছু না কিছু হইতেই হইবে।'

'যে সকল বস্তুর জীবন আছে এবং ইচ্ছামত গমনাগমন করিতে পারে তাহারা চেতন পদার্থ।'

পণ্ডিত মহাশয়ের ব্যাখ্যা ঃ

'যাহাদের ধড়ে প্রাণ আছে, অর্থাৎ অন্যায় দেখিলে সহিতে পারে না, গালি দিলে রাগ করে, পড়িয়া মার খায় না, নিজের খুসিতে কাজ করে, নিজে রোজকার করিয়া নিজে খায়, দশজন লোক তাহাদের মুখ চাহিয়া থাকে বই তাহারা কাহারও মুখ চাহে না, পা থাকিতে খোঁড়া হইয়া গাড়ি চড়ে না, মুখে যাহা বলে কাজে তাহা করে, পরের মুখে ঝাল খায় না এবং নিজের ক্ষমতার উপর অধিক ভরসা করে, তাহাদের নাম চেতন পদার্থ।'

'যে সকল বস্তুর জীবন নাই, যেখানে রাখে সেইখানে থাকে একস্থান হইতে অন্যস্থানে যাইতে পারে না। উহাদিগকে অচেতন পদার্থ কহে।'

পণ্ডিত মহাশয়ের অর্থ ঃ—

'যাহারা মুখে ভাত তুলিয়া না দিলে খাইতে পারে না, যতক্ষণ কেহ অনুগ্রহ না করে ততক্ষণ যেখানে ফেলিয়া রাখে সেইখানেই পড়িয়া থাকে, মারিলেও কথা কয় না, নিজের ভাল নিজে বুঝিতে পারে না, যেমন করিয়া চালাইবে ঠিক তেমনি করিয়া চলিবে, পেটের ভাত কেহ না দিলে জুটাইতে পারে না, কেহ জোর দিলে তবে জোর পায়, আফিসের সাহেব ঝাঁটার জোর দেখাইলে তবে কলম চালায়, মদ পেটে গিয়া জোর করিলে তবে ভিজে বিড়াল হয় এবং কিছুই জোর না করিলে যাহারা কিছুই করিতে পারে না, তাহারা অচেতন পদার্থ।'

একজন তীক্ষ্নবুদ্ধি ছাত্র বলিল,—

'পণ্ডিত মহাশয়! তবে তো ইতস্তত: অচেতন পদার্থই অনেক ?'

পণ্ডিত বলিলেন,—

'তা আর বলিতে ? এদেশটাই অচেতন পদার্থের দেশ বাপু। দৈবাৎ দুই একটা চেতন পদার্থ দেখা যায়। তাহার পর শুন।'

'যেসকল বস্তু ভূমিতে জন্মে, উহারা উদ্ভিদ পদার্থ।'

পণ্ডিতের ব্যাখ্যা ঃ—

'যাহাদের সুবিধামত জন্ম হওয়ায় খাওয়া দাওয়ার ভাবনা ভাবিতে হয় না, কোন দায়ে ঠেকিতে হয় না, চলিয়া বেড়াইবার বা নাড়বার চড়িবার দরকার হয় না, দুটো কথাও নিজে বলিতে পারে না, অপরের চেষ্টায় কিম্বা বাপ পিতামহের অথবা শ্বশুর বা শ্যালক বা ভগ্নিপতির ধনে খায় পরে ও ব্যয় করে, সংসারের যত ঝঞ্ঝাট আছে তাহার কাছেও যায় না, দিব্য নির্ভাবনায় শীতল হইয়া বসিয়া থাকে, এবং

নিজে বড় একটা কাহার সহিত মেশে না, আর অপরকেও আপনার সহিত মিশায় না, তাহারা উদ্ভিদ পদার্থ ।'

সেই তীক্ষ্ণবুদ্ধি ছাত্র আবার জিজ্ঞাসিল—'যদি কোন স্থানে এ তিনরকম ছাড়াও পদার্থ দেখা যায়, তাহাদের কি বলা যাইবে ?'

পণ্ডিত মহাশয়ের উত্তর,—

'এ তিনরকম ছাড়া আর পদার্থ নাই। তবে যদি দৈবাৎ কোথাও অন্য কোনরকম পদার্থ দেখিতে পাও, নিশ্চয় জানিও তাহা অপদার্থ ।'[২১]

শুধু সমকালীন বাঙালিদেরই নয়, 'বোধোদয়ে'র লেখকের ঈশ্বর পরকাল ইত্যাদি সম্পর্কে আগ্রহের অভাব জন মার্ডকের মতো গোঁড়া মিশনারিকেও বিচলিত করে তুলেছিল। ১৮৭১-এ প্রকাশিত *On the reading books chiefly used in Mission Schools in Bengal* বইতে তিনি বললেন, চেম্বার্সের বইটি বছর তিরিশ আগে প্রকাশিত হলেও, কোনোদিনই জনপ্রিয় হয়ে ওঠেনি। যে কারণে প্রকাশকরাই এটি ছাপা বন্ধ করে দিয়েছেন। যে নীতির ওপর ভিত্তি করে বইটি রচিত, তা ভুল বলেই মার্ডক মনে করতেন। 'বোধোদয়ে'র লাইন ধরে ধরে বিশ্লেষণ করে তিনি দেখালেন, মূলে যেখানে ঈশ্বর বা আত্মার প্রসঙ্গ ছিল, অনুবাদে সেগুলি কিভাবে বাদ দেওয়া হয়েছে। বইটিতে এমন একটি অনুচ্ছেদ ('ইন্দ্রিয়') আছে, যা মার্ডকের মতে ছাত্রদের *rank materialism* শিক্ষা দেবে। ১৮৭২-এ মাদ্রাজ থেকে প্রকাশিত *Education as a Missionary Agency in India* বইটিতে এই একই অভিযোগের পুনরাবৃত্তি করলেন তিনি। ক্ষোভের সঙ্গে তিনি বললেন, বাংলার সেরা লেখক, সরকারি কলেজের প্রাক্তন একজন অধ্যক্ষ এই ধরনের বই লিখেছেন—এটা খুবই পরিতাপের বিষয়।[২২] পরবর্তীকালেও এই বইটি মিশনারি স্কুলে যাতে পড়ানো না হয়, তার জন্য তিনি সাধ্যমতো চেষ্টা করেন।

করলেও, 'বোধোদয়ে'র জনপ্রিয়তা কিন্তু এর পরেও হ্রাস পায়নি। এই জনপ্রিয়তা দেখে ২৩.৪ ১৮৭৫-এ 'এডুকেশন গেজেটে' একজন মন্তব্য করেন, 'বিদ্যাসাগর মহাশয় বোধোদয় স্বয়ং রচনা করিলে যাহা হইত, অনুবাদ করায় তাহা অপেক্ষা কম ফল হইয়াছে, বলিতে পারা যায় না।' বিদ্যাসাগরের জীবিতকালেই বইটির শতাধিক সংস্করণ হয়। ১৮৮৮ ও ৮৯-এ 'বোধোদয়ে'র ১০৩ ও ১০৪ নং সংস্করণ প্রকাশিত হয়। দুটি সংস্করণেরই মুদ্রণসংখ্যা ছিল তিরিশ হাজার। বেশ বোঝা যাচ্ছে, রক্ষণশীল হিন্দু ও গোঁড়া মিশনারিদের সমালোচনা 'বোধোদয়'কে পাঠ্যপুস্তকের তালিকা বহির্ভূত করতে পারেনি। আসলে 'বোধোদয়ে'র সমালোচনায় যাঁরা ছিলেন মুখর, তাঁরা কিন্তু এর কোনো বিকল্পের সন্ধান দিতে পারেননি। আর তাই বইটির জয়যাত্রা ছিল অব্যাহত।

'বোধোদয়' প্রকাশের মাসছয়েক পরে প্রকাশিত হয় 'সংস্কৃত ব্যাকরণের

উপক্রমণিকা'। পরবর্তী দু'বছরে 'ঋজুপাঠ'-এর তিনটি ভাগ ও 'ব্যাকরণ কৌমুদী'র কয়েকটি ভাগ (১ম ১৮৫৩, ২য় ১৮৫৩) প্রকাশিত হয়। এগুলি প্রকাশিত হলে পুরোনো মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ উঠিয়ে দিয়ে বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজে নিজের 'সংস্কৃত ব্যাকরণের উপক্রমণিকা' এবং 'ব্যাকরণ কৌমুদী' পাঠ্য করান এবং কাব্যের পাঠ্য হিসাবে নির্ধারিত করেন 'ঋজুপাঠ'-এর তিনটি ভাগ। 'সংস্কৃত ব্যাকরণের উপক্রমণিকা'র প্রকাশকে স্বাগত জানিয়ে সেকালের বিশিষ্ট পত্রিকা 'ক্যালকাটা রিভিউ' লেখে : দেশীয় ছাত্রদের কাছে সংস্কৃত শিক্ষাকে সহজসাধ্য করার জন্য সংস্কৃত কলেজের বিদ্বান অধ্যক্ষ যে মহান পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন, তার জন্য আমরা তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ। ইউরোপীয় ছাত্রদের সংস্কৃত শিক্ষার জন্য উইলিয়ম যা করেছেন, তার সঙ্গে তাঁর প্রয়াস তুলনীয়। এতদিন সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদের মুগ্ধবোধের জটিল ও দুর্বোধ্য সূত্রগুলির মধ্যে তিন বছর ধরে পথ হাতড়াতে হত, কিন্তু এই ব্যাকরণটির সাহায্যে এখন একজন ছাত্র ছ'মাসের মধ্যে সহজেই সন্ধিসমাসের নিয়মকানুনের সঙ্গে পরিচিত হয়ে, সহজ সরল সংস্কৃত রচনাসম্ভারের পরিচয় গ্রহণ করতে পারবে। বিদ্যাসাগরের এই ব্যাকরণটির বহুল প্রচার কামনা করে পত্রিকাটি লেখে :

We are glad to see this useful innovation introduced by an eminent Sanskrit scholar—one who, himself, having been trained up under the old system, has known by experience, its disadvantages. The Tatwabodhini Sabha, several years ago published the first part of a Sanskrit Grammar ; but they did not continue it beyond the pronouns. Dr. Ballantyne published in English a catechism of Sanskrit Grammar for one rupee, but this one of Ishwar's, at the low rate of eight annas, deserves a wide circulation, and, being, taught in the Sanskrit College, will send out a class of men trained in this simple and easy mode of commencing Sanskrit.'[২৩]

'ক্যালকাটা রিভিউ' প্রশংসা করলেও, মুগ্ধবোধের জায়গায় উপক্রমণিকা চালু করাকে অনেকে ভালোচোখে দেখেননি। এটি চালু হবার পর সংস্কৃত কলেজের কোনো কোনো ছাত্র ভুল সংস্কৃত লিখতে থাকায় প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ অত্যন্ত ক্ষোভের সঙ্গে মন্তব্য করেন, 'উপক্রমণিকায় সব মাটি হল দেখছি।' সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্নের পুত্র হরিশ্চন্দ্র কবিরত্ন একদিন প্রশ্নোত্তরে 'কাশীস্থিতগবাম' লেখায় প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ ক্ষোভের সঙ্গে গিরিশচন্দ্রকে বলেন, উপক্রমণিকা পাঠ করায়, ছেলের ব্যাকরণের বুনিয়াদ পাকা হয়নি, ঘরে তাকে মুগ্ধবোধ পড়ানো উচিত। এই কথোপকথনের মাঝখানে ঈশ্বরচন্দ্র এসে উপস্থিত। তাঁকে দেখে তর্কবাগীশ বলে উঠলেন—'ঈশ্বর কলেজটি মাটি করলে—ছেলেগুলির মাথা খেলে বাপু।' বিদ্যাসাগর সব শুনে বললেন—'না, মহাশয়! আর ভয় নাই—এইবার ব্যাকরণ কৌমুদী বাহির

হইয়াছে ; ইতঃপর আপনার শ্রেণীতে ব্যাকরণে পরিপক্ক বালকেরই রপ্তানি দেখিতে পাইবেন।'[২৪] বিদ্যাসাগর ঠিকই বলেছিলেন। 'ব্যাকরণ কৌমুদী' পড়ে অনেকে সংস্কৃত ভাষায় প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য অর্জন করেছেন—একথা স্বীকার করতে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী দ্বিধাবোধ করেননি। তবে বইটি আসলে যে original নয়, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের উইলসনের ব্যাকরণকে ভিত্তি করেই রচিত—তারও উল্লেখ করতে তিনি ভোলেন নি।[২৫] হরপ্রসাদের অনেক আগেই অবশ্য জেমস লং বইটি যে ইউরোপীয় আদর্শ অনুসরণে রচিত তার উল্লেখ করেন।[২৬]

'সংস্কৃত ব্যাকরণের উপক্রমণিকা' বা 'ব্যাকরণ কৌমুদী' বিদ্যাসাগরের এই বইদুটি সমকালে যতখানি সমাদরলাভ করেছিল, 'ঋজুপাঠে'র ভাগ্যে তা জুটেছিল কিনা সন্দেহ। যদিও 'ঋজুপাঠে'র প্রথম ভাগ প্রকাশিত হবার পর 'ক্যালকাটা রিভিউ' এর যে সমালোচনা করে, তাতে প্রশংসার ভাগটাই বেশি। পত্রিকাটি লেখে :

'This is designed as a sequel to the excellent Grammar of the author : and we have only to regret that he has not given a translation into Bengali of the introductory part, so as to facilitate the progress of beginners and enable them to pursue the study with greater zest. This is the plan now adopted in Europe, where students are not required to devote years to the intricacies of Grammatical studies, but are encouraged to educe to a certain extent the rules of Grammar for themselves in the course of reading. In Sanskrit this is still most necessary.'[২৭]

এ সময় পর্যন্ত বিদ্যাসাগর যে কটি বই লিখেছিলেন সবই ছাত্রসমাজের মুখ চেয়ে। কিন্তু ১৮৫৩ সালে 'বেথুন সোসাইটি'র পক্ষ থেকে যখন তাঁকে সংস্কৃতভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে একটি বক্তৃতা দেবার আমন্ত্রণ জানানো হল, তখন তিনি ছাত্রসমাজের সঙ্কীর্ণ গণ্ডির বাইরে যে বৃহত্তর জনগোষ্ঠী রয়েছে, তাঁদের কথা চিন্তা করতে শুরু করলেন। ১৮৫৩-র মার্চ মাসে বিদ্যাসাগর 'বেথুন সোসাইটি'র মাসিক অধিবেশনে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ পাঠ করেন। সেকালের বিখ্যাত দৈনিক 'সংবাদ প্রভাকর' এ সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলে, 'বীটন সভার মাসিক বৈঠকে শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় সংস্কৃত বিদ্যার গৌরব প্রতিভা সন্দীপন-মূলক বঙ্গভাষায় যে এক দীর্ঘ প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছেন তাহা সর্বাংশে উত্তম হইয়াছে, তাহাতে তিনি অসামান্য লিপিনৈপুণ্য ও সংস্কৃত বিদ্যার বিপুল ব্যুৎপন্ন প্রদর্শনে ত্রুটি করেন নাই, যে সকল মহাশয়েরা সভাগারে উপস্থিত ছিলেন, তাহারা সকলেই বিদ্যাসাগর মহাশয়কে সাধুবাদ প্রদান করিয়াছেন।' একথা লেখার কয়েকদিন পরেই বক্তৃতাটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। 'সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃতসাহিত্যশাস্ত্র বিষয়ক

প্রস্তাব' রচনা করতে গিয়ে বিদ্যাসাগর প্রথম পাঠ্যপুস্তকের গণ্ডির বাইরে পা বাড়ালেন। শুধু তাই নয়, এটি রচনাকালে দেশি-বিদেশি কোনো বইও তাঁর সামনে মডেল হিসাবে ছিল না—সেই দিক দিয়ে এটিকে তাঁর প্রথম মৌলিক রচনা হিসাবে চিহ্নিত করতে পারি। বইটি প্রকাশিত হবার অল্পদিনের মধ্যে 'বিবিধার্থ সংগ্রহে' রাজেন্দ্রলাল মিত্র এর বিস্তৃত সমালোচনা করেন। সমালোচনা প্রসঙ্গে তিনি মন্তব্য করেন :

'...বিদ্যাসাগরের নামোচ্চারণেই পাঠকবৃন্দের মনে উক্ত প্রস্তাবের ঔৎকর্ষবিষয়ে নানাবিধ সম্ভাবের উদয় হইতে পারে, ফলতঃ তৎপাঠে কেহই অপরিতুষ্ট হইবেন না। গদ্যরচনায় বিদ্যাসাগর বহু দিবসাবধি প্রসিদ্ধ আছেন ; তাঁহার প্রণীত 'বেতাল পঞ্চবিংশতি', 'জীবনচরিত' ও 'বঙ্গদেশের ইতিহাস' সহৃদয় পাঠকবর্গ প্রকৃষ্ট সমাদরপূর্বক পাঠ করিয়া থাকেন। রচনা সম্বন্ধে উল্লিখিত প্রস্তাব ঐসকল পূর্বপ্রকাশিত পুস্তক হইতে কোন মতে লাঘবাস্পদ নহে—বরং সারল্যগুণে উৎকৃষ্টই বলিতে হইবেক। সংস্কৃতানভিজ্ঞ সামান্য পাঠকপক্ষে দুরূহ সংস্কৃত শব্দ ও বহুশব্দের দীর্ঘ সমাস অনায়াসে বোধগম্য হয় না, সুতরাং যে সকল গ্রন্থ রচনায় তদ্রূপ শব্দ ও সমাসের প্রাচুর্য থাকে তাহার ক্লিষ্টতা অনায়াসেই সম্ভবে। বেতাল পঞ্চবিংশতি গ্রন্থের স্থানে স্থানে উক্ত দোষ কেহ কেহ প্রদর্শন করিয়াছেন, কিন্তু উপস্থিত প্রস্তাবে তাহার লেশমাত্র নাই। সুমধুর কোমল ভাষায় রচিত হইয়া এই প্রস্তাব সরলতার শুক্লাম্বরে পরিশুদ্ধরূপে বিভূষিত হইয়াছে। রচনার উৎকর্ষাপকর্ষ বিষয়ে সকলের অভিপ্রায় কদাপি তুল্য হয় না, পরন্তু প্রস্তাবিত রচনা বঙ্গভাষায় গদ্যরচনার এক শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্তস্বরূপে গণ্য হইবেক, বলাতে, বোধহয়, অনেকেই আমাদিগের সপক্ষ হইবেন। একান্ততঃ আমাদিগের অনুরোধে উক্ত প্রস্তাব পাঠ করিলে কাহারও শ্রম বিফল হইবে না।'

বহুবিস্তৃত সংস্কৃত সাহিত্যের প্রধান প্রধান গ্রন্থের স্থূল মর্ম প্রকাশ করাই যে লেখকের উদ্দেশ্য তা বলতে রাজেন্দ্রলাল ভোলেননি। তাঁর মতে এ-বিষয়ে 'তিনি সম্পূর্ণ সিদ্ধকাম হইয়াছেন। রঘুবংশ, কুমারসম্ভব, কিরাতার্জুনীয়, শিশুপালবধ, নৈষধ, ভট্টি, রাঘবপাণ্ডবীয়, গীতগোবিন্দ, মেঘদূত, ঋতুসংহার, নলোদয়, সূর্যশতক, শান্তিশতক, নীতিশতক, শৃঙ্গারশতক, বৈরাগ্যশতক, কাদম্বরী, আর্য্যাসপ্তশতী, দশকুমারচরিত, বাসবদত্তা, চম্পূকাব্য, পঞ্চতন্ত্র, হিতোপদেশ, কথাসরিৎসাগর ও একাদশখানি উত্তমোত্তম নাটকের বিবরণ এই প্রস্তাবমধ্যে বিবৃত আছে ; এবং তাহার অধিকাংশই অতি সদ্বিবেচনার সহিত লিখিত হইয়াছে। রচনার দোষগুণ নিরূপণে বিদ্যাসাগর বিশেষ তৎপর ; কালিদাসের ক্ষমতাবিষয়ে তাঁহার উক্তি সর্বতোভাবে সত্য।'

প্রশংসার সঙ্গে সঙ্গে বইটির ত্রুটিগুলির কথা বলতেও রাজেন্দ্রলাল ইতস্তত করেন নি। সমালোচনা প্রসঙ্গে তাই তিনি মন্তব্য করেন :

'যদিচ সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্য এই উভয় বিষয়ই প্রস্তাবের উদ্দেশ্য, পরন্তু ফলতঃ এই প্রস্তাব সংস্কৃত সাহিত্য বিষয়েই ব্যাপৃত আছে। ইহার দুইপত্র মাত্র

সংস্কৃত ভাষার প্ররোচক, এবং তাহাতেও সংস্কৃতের গুণকীর্তন মাত্র আছে, ভাষার ধর্ম ও লক্ষণ বিষয়ে প্রায় কিছুমাত্র উক্ত হয় নাই।'

রাজেন্দ্রলালের এই উক্তির সত্যতা বইটির পাতা ওলটালেই ধরা পড়ে। শুধু তাই নয়, বইটিতে 'বিদ্যাসাগর মহাশয় যমকাদি শব্দালঙ্কার বিশিষ্ট যে কএকটি চিত্রকাব্যের দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহা মনোহর বটে, কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই, তাহার অর্থ লিখিত হয় নাই, তদভাবে অনেকেই তাহার রসাস্বাদনে অশক্ত হইবেন।'[২৮]

দু' একটি ত্রুটির কথা বললেও, রাজেন্দ্রলালের সমালোচনায় প্রশংসার মাত্রাটাই বেশি। তবে এই বইতে ভবভূতি সম্পর্কে বিদ্যাসাগরের মন্তব্যকে কেউ কেউ গ্রহণযোগ্য মনে করেননি। এ নিয়ে একসময় কিছুটা বিতর্কেরও সৃষ্টি হয়। ১২৭৯-র জ্যৈষ্ঠ মাসের 'বঙ্গদর্শনে' বঙ্কিমচন্দ্র এই বিতর্কের সূত্রপাত করেন। এই সংখ্যা থেকে তাঁর 'উত্তরচরিত' প্রবন্ধটি ধারাবাহিকভাবে 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত হতে আরম্ভ করে। এই প্রবন্ধে ভবভূতি সম্পর্কে বিদ্যাসাগরের কোনো-কোনো মন্তব্যের প্রতিবাদ করলেন তিনি। তাঁর মতে বিদ্যাসাগর 'অদ্বিতীয় পণ্ডিত ও লোকহিতৈষী' হলেও 'তাদৃশ কাব্যরসজ্ঞ' নন। 'সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যশাস্ত্র বিষয়ক প্রস্তাবে' ভবভূতির যে সমালোচনা তিনি করেছেন, বঙ্কিমচন্দ্রের মতে তা 'কাব্যরসজ্ঞতার অভাবের চিহ্নস্বরূপ।' আক্ষেপ করে তিনি বললেন, 'বিদ্যাসাগরও যদি উত্তরচরিতের মর্যাদা বুঝিতে সমর্থ হইলেন না, তবে যদু বাবু, মাধু বাবু তাহার কি বুঝিবেন।' বিদ্যাসাগর বলেছিলেন 'কবিতা শক্তি অনুসারে গণনা করিতে হইলে, কালিদাস, মাঘ, ভারবি, শ্রীহর্ষদেব ও বাণভট্টের পর তদীয় নাম নির্দেশ করা বোধহয় অসঙ্গত নয়।'[২৯] ভবভূতি সম্পর্কে এই ধরনের মন্তব্য বঙ্কিমচন্দ্রের ভালো লাগেনি। তাঁর মতে ভবভূতি পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি। বিদ্যাসাগর যাঁদের নাম করেছেন, তাঁদের মধ্যে কালিদাস ছাড়া আর কেউ তাঁর সমকক্ষ নন।[৩০] এই লেখাটি প্রকাশিত হবার পরই এক পত্রলেখক 'এডুকেশন গেজেটে' একটি চিঠি লিখে 'অসাধারণ কাব্যরসজ্ঞ' বিদ্যাসাগর সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের মন্তব্যের প্রতিবাদ করেন—'বর্তমান জ্যৈষ্ঠ মাসের 'বঙ্গদর্শনে' মহাকবি ভবভূতি প্রণীত উত্তররামচরিতের সমালোচন পাঠ করিয়া আশানুরূপ পরিতৃপ্তিলাভ করিতে পারিলাম না। কবিত্বশক্তি বিষয়ে সমালোচক ভবভূতির অসাধারণ কবিত্ব সহৃদয় সমাজের হৃদগত না হওয়ায় নিতান্ত আক্ষেপপরায়ণ হইয়াছেন, এবং শ্লেষোক্তিতে অসাধারণ কাব্যরসজ্ঞ বিদ্যাসাগর মহাশয়কেও আক্রমণ করিয়াছেন। আমরা বিদ্যাসাগর মহাশয়কৃত 'সংস্কৃত সাহিত্যশাস্ত্র বিষয়ক প্রস্তাবে' মহাকবি ভবভূতির কবিত্ব বিষয়িণী সমালোচনা পাঠ করিয়াছি, এবং উক্ত মহাশয় সম্প্রতি যে উত্তরচরিত প্রচারিত করিয়াছেন, তাহাতেও তিনি ভবভূতির অসাধারণ কবিত্বশক্তির অপলাপ করেন নাই। তাঁহার সহৃদয়তা ও রসজ্ঞতাদ্বারা সংস্কৃত সাহিত্য বহুলপরিমাণে উপকৃত হইয়াছে।' কবিত্বশক্তিতে শ্রীহর্ষের 'রত্নাবলী' যে ভবভূতির 'উত্তরচরিতে'র চেয়ে নিম্নস্থানের অধিকারী নয়, তা প্রমাণ করার জন্য পত্রলেখক

অলঙ্কারশাস্ত্রবোদ্ধা প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশের একটি উক্তি উদ্ধার করেন। পত্রলেখকের মতে 'ভবভূতি উত্তরচরিতের প্রথম দুই অঙ্কে যেরূপ চমৎকার কবিত্বশক্তি প্রকাশ করিয়াছেন, অন্যান্য অঙ্কে তদ্রূপ নয়। তাঁহার কবিত্বশক্তি অসাধারণ; কিন্তু তিনি সেই শক্তি উত্তরচরিতের সমুদায় ভাগে সমানরূপে প্রতিভাত করিতে পারেন নাই। তাঁহার গাম্ভীর্য অসাধারণ, এবং তিনি আদিরসাবতারণে অতি সাবধান। সমালোচক বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অরসজ্ঞতার বিষয়ে উল্লেখ করিয়া নিজে তাহা হইতে মুক্ত হইতে পারেন নাই। বোধহয়, রসজ্ঞ মাত্রেই 'রত্নাবলী'কে 'উত্তরচরিত' অপেক্ষা নিকৃষ্ট বোধ করিবেন না। উত্তরচরিতে যে সকল দোষ আছে, রত্নাবলীতে তৎসমুদায় অতি অল্প পরিমাণে দৃষ্ট হয়।'[৩১]

পরের সংখ্যা 'এডুকেশন গেজেটে' প্রকাশিত আর একটি পত্র-প্রবন্ধেও বঙ্কিমচন্দ্রের বক্তব্যের প্রতিবাদ করে বলা হয়ঃ

বঙ্গদর্শনের দ্বিতীয় সংখ্যায় উত্তরচরিত নামধেয় একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। এইরূপ রচনা সাধারণের অত্যন্ত হিতজনক এবং সাহিত্যানুরাগোদ্দীপনক্ষম।...কিন্তু কোন কোন স্থলে আমাদিগের মতের সহিত তাঁহার মতের বিভিন্নতা হইয়াছে।...

'উপরিউক্ত প্রবন্ধরচয়িতা লিখিয়াছেন 'শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় উত্তরচরিতের মর্যাদা বুঝিতে সমর্থ হয়েন নাই।' কারণ তিনি কবিত্বশক্তি অনুসারে কবিগণকে শ্রেণীভুক্ত করিবার সময় কালিদাস, মাঘ, ভারবি, শ্রীহর্ষ ও বাণভট্টের নিম্নে ভবভূতির পদ নির্দেশ করিয়াছেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় নিজমতের সমর্থনযোগ্য কোন কারণ নির্দেশ করেন নাই। কিন্তু আমরা জিজ্ঞাসা করি, সমালোচক মহাশয়ই বা প্রশস্ত চারিপৃষ্ঠাব্যাপী প্রবন্ধে ভবভূতির প্রাধান্য সংস্থাপনের কি প্রমাণ দিয়াছেন। এমত হইতে পারে যে, নব অনুরাগবশত তিনি প্রধানতম কবিগণের সহিত ভবভূতির সমকক্ষতা প্রতিপন্ন করিতে এত উদ্যোগী। যদিও ইনি অনেক দেশের বড় বড় কবিদের নাম করিয়াছেন, তথাপি তিনি তাহাদের সকলের মর্মগ্রহণে ও দোষগুণ বিচারে সম্যক ক্ষমতাপন্ন কিনা, ইহার বিশেষ প্রমাণ তাঁহার প্রবন্ধে প্রাপ্ত হওয়া যায় না।'[৩২]

দুই পক্ষের এই বাদানুবাদ দেখে 'এডুকেশন গেজেটে' অপর একজন লিখলেন ঃ

'দুই দলের বিচারকালে উভয়পক্ষের হইয়াই কিছু বলা যাইতে পারে। কিন্তু একজনের যে সব কথাগুলি সত্য ও অপরের নিছক মিথ্যা, ইহা হইতে পারে না।... একজন বিখ্যাত লোকের নিন্দা করিলেই কেহ কেহ আপনাকে বড় মনে করে। কিন্তু কথা বলার চেয়ে আর সহজ কি আছে? লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যক্তির মত প্রায় সকলেই অবগত থাকে। সে মত খণ্ডন করিতে হইলে, তাঁহার কথা ভাল নয় আমার কথাটিই ভাল বলিলে হয় না, বিনা নাম নির্দেশে, প্রমাণ দ্বারা আপনার মত সিদ্ধ করাই ভাল। তাহা হইলেই লোকে জানিতে পারে যে অমুক ব্যক্তির মত ভাল নহে।'

পত্রলেখকের মন্তব্যের লক্ষ্য যে বঙ্কিমচন্দ্র, তা বুঝতে অসুবিধা হয় না। বিদ্যাসাগরকে সমর্থন করে তিনি বললেন, 'বিদ্যাসাগর মহাশয় ভবভূতিতে যে কিছু

রসকস নাই এমন কথা বলেন নাই।...যাঁহারা একটি নূতন মত প্রকাশ করিলেই আপনাদিগকে প্রতিষ্ঠিত মনে করে না, এমন ব্যক্তিমাত্রেই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মতের অনুমোদন করেন বোধহয়। এবং ভবভূতি যে একজন উচ্চদরের নাটককার তদ্বিষয়েও বোধহয়, কাহারও সন্দেহ নাই।'[৩৩]

কে, কোথায় কি বললেন, তা নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে শ্রাবণ, ১২৭৯-র 'বঙ্গদর্শনে' বিদ্যাসাগরকে সরাসরি অভিযুক্ত করে বঙ্কিমচন্দ্র বললেন, বিদ্যাসাগর উত্তরচরিতের কোনো কোনো অংশের প্রকৃত অর্থ ঠিকমতো বুঝতে পারেননি। ঐ অংশের প্রকৃত অর্থ নিবেদন করতে গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র বললেন, 'বিদ্যাসাগর মহাশয়কে উত্তর রামচরিতের অর্থ বুঝাইতে প্রবৃত্ত হওয়া ধৃষ্টতার কার্য হইতেছে, তথাপি কবির গৌরবার্থ আমাদিগকে সে দোষও স্বীকার করিতে হইল।' ব্যাপার দেখে 'হালিসহর পত্রিকা'র জনৈক লেখকের 'হৃৎকম্প' উপস্থিত হয়। এ সম্পর্কে প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে তিনি লিখলেন :

'পাঠক! আমাদের অনুরোধে না হউক, অন্তত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সম্মান রক্ষার জন্য একবার 'বঙ্গদর্শনে'র সেই দূষিত অংশটা পাঠ করিয়া দেখিবেন যে, এই বাতুলের অর্থ সঙ্গত না বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অর্থ সঙ্গত?...সমালোচক মহাশয়! বিদ্যাসাগর মহাশয় নির্বোধ নহেন, সংস্কৃতেও উঁহার কিছু কিছু অধিকার আছে।' অত্যন্ত ক্ষোভ ও বিরক্তির সঙ্গে তিনি বললেন, সমালোচনাকালে ভবভূতির কয়েকটি দোষের কথা উল্লেখ করেও বঙ্কিমচন্দ্র তাঁকে মাপ করেছেন। 'কিন্তু উহার গুহাবিহারী সিংহসম বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পুচ্ছদেশে দংশন করিতে ত্রুটি করেন নাই। দুঃখের বিষয়, সিংহ একবার চক্ষুরুন্মীলনও করিল না। বোধহয় অমন শত সহস্র দংশ মশক সিংহের পুচ্ছ দংশন করিতেছে। পুচ্ছ লোমে আবৃত, দন্তই ভগ্ন হয়। সিংহের তাহাতে ক্ষতিবৃদ্ধির সম্ভাবনা কি?'[৩৪]

এই লেখাটি বেরোনোর কয়েকদিনের মধ্যে ভাদ্র সংখ্যা 'বঙ্গদর্শনে' বঙ্কিমচন্দ্র আবার ভবভূতি প্রসঙ্গে বিদ্যাসাগরের সঙ্গে মতানৈক্য প্রকাশ করলেন। বিদ্যাসাগরের মতে ভবভূতিতে যে দীর্ঘ সমাসঘটিত রচনা আছে, তাতে 'অর্থবোধ ও রসাস্বাদ' বিষয়ে ব্যাঘাত ঘটে। বঙ্কিমচন্দ্র বললেন, ভবভূতির দীর্ঘ সমাস ব্যবহার নিন্দনীয় নয়। 'ভবভূতির এই কয় সমাসের মধ্যে যে কবিত্বশক্তি আছে, রত্নাবলী নাটকের একটি সমগ্র অঙ্কমধ্যে তাহা আছে কিনা সন্দেহ।'

এই সংখ্যাটি প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে 'হালিসহর পত্রিকা' বিদ্যাসাগর সম্পর্কে কটাক্ষ করার জন্য বঙ্কিমচন্দ্রকে কুৎসিতভাবে আক্রমণ করে লিখল :

'কৃতবিদ্য সমালোচক বিদ্যাসাগর মহাশয়কে মূর্খরূপে প্রতিপন্ন ও আপনাকে পণ্ডিতরূপে দেখাইবার জন্য সাধ্যমত চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই; কিন্তু প্রথম এইটিই বিবেচ্য, যে সংস্কৃত সমালোচন বিষয়ে কোন মূর্খ ঐরূপ আত্মশ্লাঘী বর্ণজ্ঞানহীন ধৃষ্টের কথা গ্রাহ্য করিবে, যাহার মর্ত্যলোকে অবতারণা কেবল ভাঁড়ামির জন্য, সে

যদি নীতিশাস্ত্রের উপদেশ দিতে আইসে, তাহা হইলে তাহার অদৃষ্টে কি ফল ফলিতে পারে ?'[৩৫]

দেখা যাচ্ছে, সেকালের বিদ্যাসাগর-ভক্তরা প্রতিপক্ষকে আক্রমণকালে শালীনতা বা সৌজন্যের কোনো ধার ধারতেন না।

'উত্তরচরিত' প্রবন্ধে বিদ্যাসাগরের ভবভূতি সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিবাদ করতে গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র যথেষ্ট পরিমাণে সমালোচিত হয়েছিলেন, সন্দেহ নেই। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের এই সমালোচনা যে অমূলক নয়, তা স্বয়ং বিদ্যাসাগরই কিছুদিনের মধ্যে প্রকারান্তরে স্বীকার করে নেন। 'সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃতসাহিত্যশাস্ত্রবিষয়ক প্রস্তাব'-এর পরবর্তী সংস্করণে বিদ্যাসাগর লিখলেন, 'ভবভূতি একজন অতিপ্রধান কবি ছিলেন। কবিত্বশক্তি অনুসারে গণনা করিতে হইলে কালিদাসের অব্যবহিত পরেই ভবভূতির নাম নির্দেশ হওয়া উচিত।' এই কথাটাই তো বঙ্কিমচন্দ্র 'উত্তরচরিত' সমালোচনা করতে গিয়ে প্রথমে বলেছিলেন।

এই বইটিকে কেন্দ্র করে সাহিত্য-সমালোচক হিসাবে বিদ্যাসাগর কতখানি যোগ্য তা নিয়ে প্রশ্ন উঠলেও, সেকালে কেউ কেউ এটিকে বিদ্যাসাগরের শ্রেষ্ঠ কীর্তি বলে মনে করতেন। জেমস লং-এর মতে এটি 'an able review of the various branches of Sanskrit studies.' 'পূর্ণিমা' পত্রিকায় বইটি সম্পর্কে কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য বলেন, 'আপনি যাহা কিছু লিখিয়াছেন, সংস্কৃত সাহিত্যশাস্ত্র বিষয়ক প্রস্তাবখানি সর্বাপেক্ষা ভাল জিনিস হইয়াছে। এইখানি নিঃসন্দেহ শীঘ্র বিস্মৃতিসাগরে ডুবিয়া যাইবে না। ভবিষ্যতে লোকে ইহা দ্বারা বুঝিবে যে, বাঙ্গালা ভাষার প্রথম পরিশীলনের পর কত শীঘ্রই এমন সুন্দর, এমন অর্থগৌরববিশিষ্ট এমন প্রগাঢ় অথচ প্রসাদগুণশালী, এমন ললিত অথচ তেজস্বিনী রচনা বাহির হইয়াছিল।' তবে বইটি আকারে খুব ছোট হওয়ায় আক্ষেপ করে কৃষ্ণকমল বললেন, 'পড়িয়া আমাদের ক্ষুধাশান্তি হয় না, আমরা খাইবার সময় বারবার 'আরও দাও, আরও দাও' এইরূপ বলিতে থাকি, কিন্তু একথার জবাব অসময়ে বন্ধ হইয়া যায়।' সেকালের অন্য একটি পত্রিকাও মনে করত, 'বিদ্যাসাগর লিখিত পুস্তকসমূহ মধ্যে যে উহার রচনা অত্যুৎকৃষ্ট তাহাতে অনুমাত্র সংশয় নাই।'[৩৬]

তা থাকুক, বা না থাকুক, পাঠ্যপুস্তক ছাড়া অন্য ধরনের বই লেখার ক্ষমতাও যে বিদ্যাসাগরের আছে, 'সংস্কৃতভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্যশাস্ত্রবিষয়ক প্রস্তাব' তা প্রমাণ করল। ঈশ্বরচন্দ্রই যে বাংলাভাষার একমাত্র আশাভরসা—এমন কথাও এইসময় শোনা যেতে লাগল। ১৮৫৪-র আগস্ট মাসে 'সংবাদ প্রভাকরে' 'বঙ্গভাষার সহিত ইংরাজী ভাষার কথোপকথন' নামে একটি কবিতা প্রকাশিত হয়। লেখক কৃষ্ণনগর কলেজের ছাত্র দ্বারকানাথ অধিকারী। কবিতাটিতে ইংরেজি ভাষার সঙ্গে কথোপকথনের সময় বঙ্গভাষা নিজের দীনতার কথা স্বীকার করে নিয়েও বলেছে :

'একাকী ঈশ্বর মম, বিদ্যার সাগর,

তার যদি জননীর প্রতি থাকে টান,
ত্বরায় উঠিবে মম যশের তুফান।'

দ্বারকানাথের এই বিশ্বাসের মর্যাদা রাখতেই বোধহয় বিদ্যাসাগর ১৮৫৪-র ডিসেম্বর মাসে সংস্কৃত ভাষার 'সর্বোৎকৃষ্ট নাটক' কালিদাসের 'অভিজ্ঞান শকুন্তলে'র উপাখ্যান-ভাগ বাংলায় সংকলন করেন। বইটির বিজ্ঞাপনে তিনি বলেন, 'বাঙ্গালায় এই উপাখ্যানের সঙ্কলন করিয়া, আমি কালিদাসের ও অভিজ্ঞানশকুন্তলের অবমাননা করিয়াছি।' বিদ্যাসাগরের এই উক্তিকে সেকালে বিনয় বলেই সকলে ধরে নিয়েছিলেন। প্রকাশের পর বইটি খুবই জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। এমনকি সংস্কৃত কলেজের ছাত্ররাও মূল 'শকুন্তলা'র বদলে বিদ্যাসাগরের 'শকুন্তলা'র ভক্ত হয়ে পড়ায় এক ব্যক্তি আক্ষেপ করে লেখেন:

'কলিকাতাস্থ সংস্কৃত কালেজে অগ্রে যেরূপ ঐ ভাষার চর্চা হইত এক্ষণে আর সেরূপ হয় না। উক্ত বিদ্যালয়স্থ বালকেরা কালিদাস কৃত শকুন্তলা পরিত্যাগ করিয়া সম্প্রতি বিদ্যাসাগরী শকুন্তলার পাণিগ্রহণ করিতেছে। যে শকুন্তলা ব্রহ্মাণ্ডস্থ সমস্ত সৌন্দর্যোৎকৃষ্টা, যিনি সমস্ত সদ্‌গন্ধের পর মনোহারিণী, যিনি সকল সদ্বাক্যের পর অমৃতবাচী, যিনি সকল রূপের পর মোহিতকারিণী, আহা! সেই শকুন্তলার প্রতি কি অনাদর। বোধহয় উল্লেখিত কালেজস্থ ছাত্রেরা তাঁহার প্রতি ভ্রান্ত দুষ্মন্তের ন্যায় আচরণ করিতেছেন।'[৩৭]

শুধু জনপ্রিয়তার মানদণ্ডে বইটিকে বিচার করলে ভুল হবে, এটি প্রকাশিত হবার পর গদ্যলেখক হিসাবে বিদ্যাসাগরের মর্যাদা রীতিমতো বৃদ্ধি পায়। কেউ কেউ তাঁকে বঙ্গভাষার শ্রেষ্ঠ লেখকের সম্মান দিতে তৎপর হয়ে ওঠেন। ব্যাপারটা 'সংবাদ প্রভাকর' সম্পাদক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের ভালো লাগেনি। 'প্রভাকরে' প্রকাশিত একটি কবিতায় বিদ্যাসাগরের রসবোধের এবং মৌলিকতার অভাবের প্রতি কটাক্ষ করে তিনি বললেন, বিদ্যাসাগর সুপণ্ডিত হলেও তাঁর নিজস্ব কোনো পুঁজি নেই, অন্যের ভাব ধার করে তিনি কাজ চালান। গুপ্তকবির মতে বিদ্যাসাগর কবি নন, গদ্যলেখক। আর গদ্য তো কাকের ডাকের মতো কর্কশ, কুভাষ—

'তাহে তুমি কত গুণ করিবে প্রকাশ
ভাবরস প্রেম আছে, কোথায় তোমার?
কার বলে কর তুমি, পুস্তক প্রচার?
কবিগণ মহাজন নাহি রাখে ধার।
ব্যয় করে পুঁজিপাটা, শুধু আপনার।
তোমার কি আছে পুঁজি? সকলেরি ধারো
ধার করা ভাব লোয়ে, যা করিতে পারো॥

খেরো হয়ে হেরো হলে, মুখে বল জিত।
জানিতে না পারো কিছু, কারে বলে হিত ॥
সাগর ডাগর নাম, বিহীন রতন
এমন সাগরে আমি, করিনে যতন।'[৩৮]

ঈশ্বর গুপ্ত এসব লিখলেও, বিদ্যাসাগরের জনপ্রিয়তা কিন্তু দিন দিন বেড়েই চলে। 'শকুন্তলা' প্রকাশের মাসখানেকের মধ্যে ১৮৫৫-র জানুয়ারি মাসে 'বিধবা-বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব' প্রকাশিত হয়। এটি প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কি পরিমাণ আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল, তা আমরা আগেই আলোচনা করেছি। বিধবাবিবাহ বিষয়ে বিদ্যাসাগরের বক্তব্যকে খণ্ডন করার জন্য একের পর এক পুস্তিকা প্রকাশিত হতে থাকে। সেগুলির উত্তর দিতে গিয়ে ১৮৫৫-র অক্টোবরে তিনি প্রকাশ করলেন 'বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব, দ্বিতীয় পুস্তক'।

বিধবাবিবাহ বিষয়ক দুটি পুস্তক প্রকাশের মাঝখানে তাঁর 'বর্ণপরিচয়' প্রথম ভাগ (এপ্রিল, ১৮৫৫) ও দ্বিতীয়ভাগ (জুন, ১৮৫৫) প্রকাশিত হয়। 'বর্ণপরিচয়' বিদ্যাসাগরের সবচেয়ে জনপ্রিয় পাঠ্যপুস্তক। ১৮৫৫-৯০-এর মধ্যে 'বর্ণপরিচয়ে'র প্রথম ভাগের ১৫২টি ও দ্বিতীয়ভাগের ১৪০টি সংস্করণ হয়। এত বেশি সংস্করণ আর কোনো বাংলা বইয়ের হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই। জনপ্রিয় হলেও, এই বইটি সেকালে বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে দাঁড়ায়। ছাত্রপাঠ্য এই বইটিতে বাংলা বর্ণমালার কিছু সংস্কার করার চেষ্টা করেন বিদ্যাসাগর। বাংলা ভাষায় দীর্ঘ ঋ ও দীর্ঘ ৯-এর ব্যবহার নেই বলে বিদ্যাসাগর 'বর্ণপরিচয়'-এর প্রথমভাগে এ দুটি বর্জন করেন। বাংলা স্বরবর্ণ থেকে দীর্ঘ 'ঋ'-কে বাদ দেওয়ার ব্যাপারটা বিহারিলাল সরকার সমর্থন করেননি। তিনি ছাড়া কালীপ্রসন্ন ঘোষ, পঞ্চানন তর্করত্ন, মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি প্রভৃতি অনেকেই এ-জন্য বিদ্যাসাগরের সমালোচনা করেন। অনুস্বর ও বিসর্গ এতদিন স্বরবর্ণ বলেই গণ্য হত, অনেক বিবেচনা করে, বিদ্যাসাগর ঐ দুটিকে ব্যঞ্জনবর্ণ ভুক্ত করেন। শুধু তাই নয়, চন্দ্রবিন্দুকেও বিদ্যাসাগর 'ব্যঞ্জনবর্ণস্থলে এক স্বতন্ত্র বর্ণ" বলে গণনা করেন। ব্যাপারটা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের একেবারেই ভালো লাগেনি। তাঁর ভালো না লাগাটা তিনি প্রকাশ্য এক সভায় প্রকাশ করলেন। ২০. ২. ১৮৬৫-তে 'বেথুন সোসাইটি'র এক অধিবেশনে রাজেন্দ্রলাল মিত্র *On Writing in Ancient India and the Sanskrit Alphabet* নামে একটি নিবন্ধ পাঠ করেন। বক্তৃতাপ্রসঙ্গে সংস্কৃত বর্ণমালার কথা তিনি বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেন। প্রসঙ্গত তিনি বিদ্যাসাগরের মতো এমন একজন পণ্ডিতও আধুনিক বাংলা ব্যাকরণের ক্ষেত্রে পাণিনিকে অনুসরণ না করায় ক্ষোভপ্রকাশ করে বলেন :

'So accurate a scholar like Pundit Iswar Chunder Vidyasagar,

in his grammar of the modern Bengali, should have changed the classification of Panini, and adopted one, which rendered it more redundant and unscientific. For instance the Pundit had included the chandravindu among his letters, although it had no independent existence in the language. Its only use was to indicate those letters which should be pronounced with a nasal twang. He adduced several other instances of redundancy in the alphabet given by Pundit Iswar Chunder Vidyasagar.'[৩৯]

বিষয়টি নিয়ে সভায় কিছু বাদানুবাদের সৃষ্টি হয়। উপভোগ্য এই ভাষণটির জন্য রাজেন্দ্রলালকে ধন্যবাদ জানাতে গিয়ে লালবিহারী দে বললেন, 'বর্ণপরিচয়' সম্পর্কে রাজেন্দ্রলালের বক্তব্যের সঙ্গে তিনি একমত নন। তাঁর মতে 'The Varna Parichay of Pundit Iswar Chunder Vidyasagar was merely a primer for the instruction of young students, and was nothing like a scientific treatise or work on the subject. The chandravindu to which the Lecturer referred, was shown separately for the easy apprehension of the young, and no scientific value was intended to be attached to the classification of his letters.'[৪০]

বিষয়টি সম্পর্কে মতামত প্রকাশ করতে গিয়ে রেভাঃ ডাল বললেন, 'all the ancient alphabets including the Sanskrit, should, in the age of progress, make room for the phonetic alphabet, which was suited to the expression of all sounds in any tongue, and which it took the shortest time possible to transcribe.'[৪১]

বোঝা যাচ্ছে, বর্ণমালা সংস্কারের ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগরকে সমর্থন করার মতো বিদগ্ধ ব্যক্তির অভাব সেযুগে ছিল না।

বাংলা স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণ নিয়ে বিদ্যাসাগর যতখানি চিন্তা করেছিলেন, সংযুক্ত বর্ণ নিয়ে ততখানি করেননি। অথচ সংযুক্ত বর্ণগুলিও যে বিশেষরকম সংস্কার করা দরকার, একথা সেকালে অনেকেই অনুভব করেছিলেন। সংযুক্ত বর্ণ আয়ত্ত করা যে কি কঠিন ব্যাপার জন মার্ডক ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে তা বুঝতে পেরেছিলেন। ১৮৬৫-তে বিদ্যাসাগরকে একটি চিঠিতে তিনি বললেন ঃ সংযুক্ত বর্ণগুলি পণ্ডিতদের কাছে সহজবোধ্য হলেও ছাত্রদের (বিশেষ করে গরিব ঘরের ছাত্র—যারা অল্পদিন বিদ্যাভ্যাস করে) কাছে বিভীষিকার মতো। এই বিভীষিকার হাত থেকে ছাত্রসমাজকে রক্ষা করার জন্য তিনি বাংলা বর্ণমালা সংস্কারের কিছু প্রস্তাব করলেন (সংযুক্ত বর্ণগুলিকে এইভাবে লেখার সুপারিশ করলেন তিনি—চিন্তা->চিন্‌তা, মন্থন->মন্‌থন্‌, কণ্টক->কণ্‌টক, বন্ধু->বন্‌ধু ইত্যাদি)। এই প্রস্তাব কার্যকর করার জন্য বিদ্যাসাগরের কাছে আবেদন জানিয়ে তিনি বললেন ঃ

'By giving up the joined consonants, the first part of your Borniporichay, with a few additions, would attain all that was necessary to teach the reading of Bengali.'[৪২]

মার্ডকের এই প্রস্তাবকে বিদ্যাসাগর তেমন গুরুত্ব দেননি। এ-বিষয়ে তাঁর নিস্পৃহতা অনেককে ক্ষুব্ধ করেছিল। কয়েকবছর পরে 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে এই ক্ষোভ প্রকাশ পেল :

'বাঙ্গালা সংযুক্ত বর্ণগুলি অতি ভয়ঙ্করাকৃতি। বর্ণপরিচয়ের সংযুক্ত বর্ণবিষয়ক পত্রগুলি দেখিলে বোধহয় 'কুস্তির আখড়া' একটার পর আর একটা চড়াই করে বসেছে। এইরূপ বিলাতি কুলুপের মতো নানাপ্রকার পেঁচদার সংযুক্ত বর্ণগুলির গুণেই বিদেশীয়েরা বঙ্গভাষা শিখিতে অগ্রসর হন নাই। বিদেশীয় কেন, এগুলির ভয়ে দেশীয় কত ছেলে যে পীড়িত হইয়া পাঠশালা কামাই করে, তাহা বলা যায় না। বাস্তবিক 'ক্ষ', 'ক্ষ', প্রভৃতি অক্ষরগুলিকে বাল্যকালে মহিষাসুরের ন্যায় ভয়ঙ্কর বোধ হইত। অতএব এগুলির বিশেষরূপ সংস্কার করা উচিত।'[৪৩]

'বর্ণপরিচয়'-এর পরবর্তী সংস্করণগুলিতে বর্ণমালা সংস্কারের কোনো উদ্যোগ বিদ্যাসাগর নেননি, বিষয়টি নিয়ে পরবর্তীকালে তেমন কোনো বাদানুবাদও হয়নি। কিন্তু এই কালেই 'বর্ণপরিচয়' মিশনারি স্কুলগুলিতে পড়ানো উচিত কিনা তা নিয়ে এক বিতর্কের সৃষ্টি হল। সৃষ্টি করলেন আমাদের পূর্বপরিচিত জন মার্ডক।

রেভাঃ ডঃ জন মার্ডক (১৮১৯-১৯০৪) পঞ্চাশ বছরের ওপর ভারতে কাজ করেন, রচনা করেন শতাধিক পুস্তক-পুস্তিকা। দক্ষিণ ভারত তাঁর মূল কর্মক্ষেত্র হলেও, বাংলাদেশ সম্পর্কেও তাঁর আগ্রহের অভাব ছিল না। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে এদেশে উপযুক্ত পাঠ্যপুস্তকের অভাব দূর করার কাজে তিনি আত্মনিয়োগ করেন। দক্ষিণ ভারতের 'খ্রিশ্চান স্কুল বুক সোসাইটি'র সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন। ১৮৫৭-র মহাবিদ্রোহের স্মারক হিসাবে ১৮৫৮-য় লন্ডনে 'খ্রিশ্চান ভার্নাকুলার এডুকেশন সোসাইটি' প্রতিষ্ঠিত হয়। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে এর কার্যক্ষেত্র বিস্তৃত হয়। ১৮৫৮-র ডিসেম্বরে মার্ডক কলকাতায় এলে, সোসাইটির বাংলা বিভাগের দায়দায়িত্ব তাঁর ওপর এসে পড়ে। বাংলা বিভাগের জন্য যে কমিটি গঠিত হয় তাতে মার্ডক ছাড়াও আলেকজান্ডার ডাফ, জেমস লং, জেমস হিল, ওব্রায়ান স্মিথ, জে· ওয়েঙ্গার, ম্যাকলিয়ড উইলি প্রভৃতি ছিলেন।

দায়িত্বভার হাতে পাবার পর এখনকার বিভিন্ন স্কুলে প্রচলিত বাংলা পাঠ্যপুস্তকগুলি দেখে তিনি ভীষণ হতাশ হলেন। 'খ্রিশ্চান ভার্নাকুলার এডুকেশন সোসাইটি'র এক বৈঠকে ক্ষোভপ্রকাশ করে তিনি বললেন :

'It is matter of deep regret that Bengali School Books prepared by orthodox Hindus, Vedantists, or on the "neutrality" principle are in such extensive use. Though the language of some of them

may be superior, many of them are framed after antiquated models, and all are deficient in the highest object of education. It is hoped that a series will be prepared unexceptionable in style, adopted to the circumstances of the people and thoroughly Christian in tone.'[৪৪]

এই সঙ্কল্পকে রূপ দিতে তিনি ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। তাঁর তত্ত্বাবধানে মিশনারি স্কুলের ছাত্রদের প্রাথমিক স্তরে বাংলা শেখার জন্য কয়েকটি বই রচিত হল। কিন্তু কিছুদিন পরে ক্ষোভের সঙ্গে তিনি লক্ষ্য করলেন, এইসব বই পাঠ্য করতে মিশনারিরাই তেমন আগ্রহ বোধ করছেন না।

'খ্রিশ্চান ভার্নাকুলার এডুকেশন সোসাইটি' প্রতিষ্ঠিত হবার অনেক আগে থেকেই বাংলার মিশনারি পরিচালিত স্কুলগুলিতে (২৪ পরগনার ব্যাপ্টিস্ট মিশন পরিচালিত স্কুলগুলি বাদ দিয়ে) বিদ্যাসাগরের 'বর্ণপরিচয়', 'বোধোদয়', 'চরিতাবলী' ও 'কথামালা' পড়ানো হত। বিশেষকরে 'বর্ণপরিচয়' ও 'বোধোদয়' মিশন স্কুলগুলিতে ছিল অবশ্যপাঠ্য। 'খ্রিশ্চান ভার্নাকুলার এডুকেশন সোসাইটি' বাংলা বর্ণমালা শিক্ষার দুটি বই ও শিশুদের পাঠোপযোগী কয়েকটি বই প্রকাশ করার পর মার্ডক ভেবেছিলেন, এই বইগুলি হাতে পেলে মিশনারি স্কুলে বিদ্যাসাগরের বই পড়ানোর আর কোনো প্রয়োজনই হবে না। কিন্তু সোসাইটি প্রকাশিত শিশুশিক্ষার এই বইগুলি বিদ্যাসাগরের বইগুলির তুলনায় এত অপকৃষ্ট ছিল যে মিশনারিরাও বিদ্যাসাগরের বইয়ের বদলে এগুলি পড়ানোর কথা ভাবতেই পারলেন না। মার্ডকের দু'চারজন অনুরাগী এগুলি চালাবার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হলেন। মার্ডকের এক ঘনিষ্ঠ সহযোগী ১৮৭২-এ জানালেন, 'The C.V.E.S-Primers and Second Book were put in the place of (Bidyasagar's) Bornoporichay, Kathamala and Bodhodoy, but the experiment does not appear successful.'[৪৫]

নিজের প্রচেষ্টার এই ব্যর্থতাকে স্বীকার করে নেবার মতো মানসিক ঔদার্য মার্ডকের ছিল না। তাই ১৮৭০-এ লন্ডন থেকে ফিরে আসার পরই তিনি বিদ্যাসাগরের লেখা কয়েকটি পাঠ্যপুস্তকের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করলেন। ১৮৭১-৮১-র মধ্যে প্রকাশিত অন্তত ছটি বইতে তিনি বিদ্যাসাগরের পাঠ্যপুস্তকগুলিকে আক্রমণ করলেন। ১৮৭১-এর আগে পর্যন্ত বিদ্যাসাগর সম্পর্কে মার্ডকের ধারণা ছিল খুবই ভালো। ১৮৬৫-তে বাংলা বর্ণমালার জটিলতা দূর করার আবেদন জানিয়ে বিদ্যাসাগরকে যে চিঠি তিনি লেখেন, তাতে বিদ্যাসাগর সম্পর্কে তাঁর গভীর সম্ভ্রমই প্রকাশিত। চিঠিটিতে তিনি বলেন :

'Though I have never had the pleasure of meeting you, your name and character have long been familiar to me. Your reputation as a Sanskrit scholar is deservedly high. You have the great merit of originating an elegant Bengali prose style, free from bom-

bastic phraseology on the one hand, and vulgurism on the other. Your school books, which have attained so large a circulation, have done much to faciliate the progress of the pupils, and to store their minds with useful knowledge. Your efforts in the cause of female education, widow re-marriage and other points connected with social reform, will entitle you to the gratitude of your countrymen.'[৪৬]

বিদ্যাসাগরের প্রশংসা করতে গিয়ে তাঁর লেখা পাঠ্যপুস্তকগুলির উপযোগিতা স্বীকার করতেও মার্ডক এইকালে দ্বিধা করেননি। কিন্তু 'খ্রিশ্চান ভার্নাকুলার এডুকেশন সোসাইটি'র কর্ণধার হিসাবে যে মুহূর্তে তিনি বুঝতে পারলেন, বিদ্যাসাগরের বই চালু থাকলে তাঁর প্রচেষ্টা সফল হবে না, সেই মুহূর্ত থেকে তিনি বিদ্যাসাগরের লেখা পাঠ্যপুস্তকগুলির নিন্দাবাদে মুখর হয়ে উঠলেন। 'বর্ণপরিচয়' ও 'বোধোদয়' বিদ্যাসাগরের এই দুটি বইকে তিনি বিশেষভাবে আক্রমণের জন্য বেছে নিলেন। ১৮৭১-এ বাংলার মিশন স্কুলগুলিতে প্রচলিত পাঠ্যপুস্তক সম্পর্কে তিনি একটি পুস্তিকা লেখেন। এতে বিদ্যাসাগরের 'বর্ণপরিচয়' ও 'বোধোদয়' সম্পর্কে তাঁর মনোভাব প্রকাশিত। 'বোধোদয়' সম্পর্কে তিনি কি ধারণা পোষণ করতেন, তার কিছু পরিচয় আমরা দিয়ে এসেছি। 'বর্ণপরিচয়' সম্পর্কে তাঁর আপত্তির কারণ একাধিক। তাঁর মতে বইটির বিন্যাস ত্রুটিপূর্ণ, তাছাড়া বইটিতে ঈশ্বর প্রসঙ্গে কোনো কথা বলা হয়নি—কাজেই মিশন স্কুলে এ ধরনের বই পড়ানো উচিত নয়। 'বর্ণপরিচয়'-এর দুটি ভাগের মধ্য দিয়ে লেখকের যে বিশেষ মনোভাব ফুটে উঠেছে সে বিষয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে মার্ডক বলেন ঃ

'In the 67 pages which they contain, there does not seem to be a single allusion to God or a future state. Some sentences, it is true would seem to recognise what Lord Stanly called "the eternal principles of justice ;" but the grand argument against telling lies and using bad words is, that a boy will be disliked by others if he does. What low miserable morality to be taught in a Christian school! On the same principle, a Hindu should not become a Christian, for his relatives and neighbours would dislike him if he did. Missionaries, above all other men, are bound not to teach such a doctrine in their schools.'[৪৭]

একজন গোঁড়া ধর্মপ্রচারক হিসাবে মার্ডক চাইতেন, মিশন স্কুলের ছেলেদের এমন বই পড়ানো হোক, যাতে তারা একেবারে ছেলেবেলা থেকেই খ্রিস্টধর্মের মাহাত্ম্য উপলব্ধি করতে পারে। বিদ্যাসাগর বা অক্ষয়কুমার দত্তের বই পড়লে ছেলেরা বাংলাটা

শিখবে বটে, কিন্তু ঈশ্বর, পরলোক ইত্যাদি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হয়ে উঠবে না। সেই কারণেই মিশনারি স্কুলে এই ধরনের বই পড়ানো সম্পর্কে আপত্তি করলেন মার্ডক। মার্ডকের কাছে আগে ধর্মপ্রচার, পরে শিক্ষাবিস্তার।

মার্ডকের এই দৃষ্টিভঙ্গিকে মিশনারিরাই মেনে নিতে পারলেন না। 'বর্ণপরিচয়' সম্পর্কে মার্ডকের বক্তব্যের প্রতিবাদ জানিয়ে 'ক্যালকাটা মিশনারি ইনটেলিজেনসার' লিখল:

'He takes exception at some of those (books) which are in use mainly, as far as we can see, because the morality taught in some passages is 'low and miserable', adducing some passages as specimens, partly also because the authors are not Christians and are irreligious men. Now it is perfectly true that higher motives might be assigned in some of the cases which he has instanced. For instance, when a boy reads, 'Learn your lesson every day, donot say, I will prepare it to-morrow; whatever you postpone, you will not be able to learn;' it would be easy from the Bible, and even without the Bible, to urge the duty more effectively. But in an elementary Reading book it seems somewhat unnecessary to insist upon such a defect.'

মিশনারিরাই যে তাঁর বক্তব্যকে মেনে নেবেন না—এটা মার্ডক ভাবতে পারেননি। আত্মপক্ষ সমর্থনে তিনি বললেন:

'The phrase what 'low miserable morality' must be understood in the connection in which it occurs. Instead of being too strong, the reverse is the case. It may rather be characterised as an Atheistic Morality. This is the most fitting epithet to be applied to moral teaching which ignores God and a future state. The readers can judge whether this is a 'defect' which 'it seems unnecessary to insist upon.'[৪৮]

এটুকু লিখেই মার্ডক ক্ষান্ত হলেন না। এর পরের বছর চার্চ মিশনারি সোসাইটিকে লেখা এক চিঠিতে তিনি 'বর্ণপরিচয়' সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করলেন। আলোচনাকালে 'বর্ণপরিচয়'-এর বিষয়বস্তু সম্পর্কে বিশেষ কিছু না বলে বইটির বিন্যাসগত ত্রুটির দিকে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করলেন:

'*Primer, Part I.* This is a book of 30 pages, of which 19 pages consist simply of letters or words; the last 11 pages contain sentences. After the vowels, it places all the consonants, E.c.,

containing 39 letters, before the children—a long dreary task. This ancient practice is now abandoned by the best educationists in Europe. The principle "Divide and conquer" is adopted. In the C. V. E. S. Bengali primer a commencement is made with three easy letters, which combine into simple words of two letters each. It is pleasanter to the children to read words which they can understand than to name symbols. Other three letters are taken in like manner. The exercise ends with the alphabet in regular order.

Primer, Part I. This is a book of 30 pages, of which 19 pages consist simply of letters or words; the last 11 pages contain sentences. After the vowels, it places all the consonants, &c., containing 39 letters, before the children—a long dreary task. This ancient practice is now abandoned by the best educationists in Europe. The principle "Divide and Conquer" is adopted. In the C. V. E S. Bengali Primer a commencement is made with three easy letters, which combine into simple words of two letters each. It is pleasanter to the children to read words which they can understand than to name symbols. Other three letters are taken in like manner. The exercise *ends* with the alphabet in regular order.

Bidyasagar next gives the vowel combinations in the usual way. The chief defect is that he follows largely the course followed in the old editions of Mavor. There are 13 pages consisting entirely of detached words in columns. Reading lessons should be interspersed, and not all placed at the end.

The writer however, must acknowledge that the Pandit is in advance of several of the Government Primers. The Tamil First Book, for example, has the alphabet followed by vowel combinations, like ba, be, &c.,—long ago exploded in England.

Primer, Part II.—This commences with the joined letters still abounding in most of the India alphabets, like the contractions met with in old Greek MSS. The Pandit puts them together, simply in alphabetical order. They can be classified in such a way as greatly to facilitate progress. Some letters are written *after*; others, *below*, &c. A few of a group should be taught at a time, with exercises upon them.

Bodhoday, next read, is based on "Rudiments of Knowledge," published by Messrs Chambers, more than thirty years ago. It

Bidyasagar next gives the vowel combinations in the usual way. The chief defect is that he follows largely the course followed in the old editions of Mavor. There are 13 pages consisting entirely of detached words in columns. Reading lessons should be interspersed, and not all placed at the end....

***Primer, Part II.*—This commences with the joined letters still abounding in most of the India alphabets, like the contractions met with in old Greek Mss. The Pandit puts them together, simply in alphabetical order. They can be classified in such a way as greatly to facilitate progress. Some letters are written after ; others, below, E.c. A few of a group should be taught at a time, with exercises upon them.'**[৪৯]

বিদ্যাসাগরকে 'বাংলার এডিসন' বলে স্বীকার করে নিয়েও মার্ডক বললেন, তাঁর রচনারীতি শিশুদের পক্ষে একটু গুরুভার (**Bidyasagar, no doubt, is the Addision of Bengal; but his style is rather high for children.'**)।[৫০] শুধু লেখালিখি করেই ক্ষান্ত হলেন না মার্ডক, মিশনারিদের ধরে ধরে তিনি জানতে চাইলেন, কেন তাঁরা 'বর্ণপরিচয়,' 'বোধোদয়', 'চারুপাঠ'-এর মতো বই স্কুলে পড়ান। বেশিরভাগই বললেন, উন্নত রচনারীতির জন্য। দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এক মিশনারি বললেন, 'চারুপাঠ'-এর সমমানের কোনো বই আমাদের দিন, আমরা তাই পড়াবো। অন্যদল বললেন: আপনার তত্ত্বাবধানে 'খ্রিশ্চান ভার্নাকুলার এডুকেশন সোসাইটি' শিশুপাঠ্য যে বইগুলি প্রকাশ করেছে, সেগুলি মোটেই সুবিধার নয়। এগুলি পড়ে ছেলেরা বাংলা শিখতে পারবে না।

মিশনারিদের সঙ্গে কথা বলে সুবিধা করতে না পেরে ১৭ ফেব্রুয়ারি, ১৮৭২-এ তিনি মিশন স্কুলে বিদ্যাসাগরের বই পড়ানো সম্পর্কে আপত্তি জানিয়ে ক্যালকাটা মিশনারি কনফারেন্স-এ এক চিঠি লিখলেন। নিজের অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিতে গিয়ে তিনি বললেন: গত তেরো বছর ধরে মিশনারিদের কাছে অনবরত জানতে চেয়েছি তাঁরা বিদ্যাসাগরের বই পড়ান কেন? সাধারণভাবে সবাই বলেছেন, বইগুলির রচনারীতি অত্যন্ত উচ্চাঙ্গের, তাই। রচনারীতিটাই হয়ে উঠেছে তাঁদের কাছে প্রধান ব্যাপার, বইয়ের বিষয়বস্তু নিয়ে তাঁরা মাথা ঘামাননি। পাঠ্যপুস্তকের রচনারীতি অবশ্যই ভালো হওয়া দরকার, কিন্তু গ্রামের স্কুলের ছাত্রদের পাঠ্যপুস্তকের ক্ষেত্রে বিষয়বস্তুর গুরুত্বটা ঢের বেশি।[৫১] ক্ষুব্ধ মার্ডক মিশনারিদের কাছে প্রশ্ন রাখলেন, আপনারা এদেশে কিজন্য এসেছেন—ছাত্রদের স্টাইল শেখাতে না ধর্মপ্রচার করতে? ক্যালকাটা মিশনারি কনফারেন্সের কাছে তিনি জানতে চাইলেন, ভারতের সর্বত্র মিশন

স্কুলগুলিতে যখন খ্রিস্টানি বই পড়ানো হচ্ছে, তখন বাংলার স্কুলগুলিতে ব্রাহ্ম ও ধর্মনিরপেক্ষ পাঠ্যপুস্তক পড়ানো কতখানি যুক্তিসঙ্গত ?[৫২]

Exception has been taken to the following sentence in the pamphlet (page 17): "Let a Missionary determine whether his grand aim is to be the evangelization of his pupils or to teach them elegance of style." I inserted this on the following account. During the last thirteen years I have frequently asked Missionaries the question, Why do you use Pundit Bidyasagar's Reading Books? The *usual* answer has been, the language is very beautiful. This seemed the grand consideration. The *subject matter* of the books did not appear to be taken into account. Of course, it is desirable that the style of School Books† should be good; and with advanced students, I allow that style is of value as a study; but in the case of *children* in *village* schools, the *subject matter* of the books is of far more importance. I must confess I have felt very strongly when the above reason has been assigned. It seemed to show a forgetfulness of the great design of Missionary education.

Latterly, it has been more commonly urged that Christian Reading Books cannot be taught by Hindus. The last Bengal Report of the C. V. E. S. assigns the following reasons for this :—

1. It hardens the teachers. The writer says that he has met with two or three illustrative cases (p. 12). But this does not

কেন মিশনারিরা বিদ্যাসাগরের বই পড়ান—
১৩ বছর ধরে এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজেছেন জন মার্ডক

মার্ডকের চিঠিটি এবং বিদ্যাসাগরের বইয়ের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগগুলি ক্যালকাটা মিশনারি কনফারেন্স-এ আলোচিত হল। আলোচনা করে তাঁরা দেখলেন, মার্ডকের অভিযোগের কোনো সারবত্তা নেই। ক্যালকাটা মিশনারি কনফারেন্সের পক্ষ থেকে ২২ মার্চ, ১৮৭২-এ মার্ডককে জানানো হল: মিশনারিদের বিরুদ্ধে ব্রাহ্ম ও ধর্মনিরপেক্ষ বই পড়ানোর যে অভিযোগ তিনি এনেছেন তা বিভ্রান্তিকর। আসলে এই বইগুলি দু'জন মানুষের লেখা—প্রথমজন বিখ্যাত হিন্দু সমাজ-সংস্কারক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, দ্বিতীয়জন প্রথম যুগের একজন সেরা ব্রাহ্ম অক্ষয়কুমার দত্ত। তাঁদের বইগুলি বেশিরভাগই ইংরেজি বইয়ের অনুবাদ। বিদ্যাসাগরের বইগুলি সম্পর্কে মিশনারি কনফারেন্সের অভিমত হল:

'Of those by Bidyasagar, the Bodhodoy treats of the five senses, the colours, the metals and other 'rudiments of knowledge,' the Kathamala is a translation of Æsop's Fables, and the Charitabali is a collection of brief biographies of celebrated men. It is not correct to style them 'secularist books.'[৫৩]

'চারুপাঠ'কেও 'ব্রাহ্ম' বই বলতে মিশনারিরা রাজি হলেন না, কারণ এতে ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের কোনো প্রয়াস লক্ষ্য করা যায় না। মার্ডককে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হল, প্রতিটি মিশন স্কুলেই ধর্মশিক্ষা দেওয়া হয়। মার্ডককে আরো জানানো হল, তাঁর তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত শিশুপাঠ্য বইগুলিতে যেভাবে খ্রিস্টধর্ম প্রচার করা হয়েছে, তার ফল শুভ হবে না বলে মিশনারিদের একটা বড় অংশ মনে করেন।

ক্যালকাটা মিশনারি কনফারেন্সের উত্তর পেয়ে হতাশ হলেন মার্ডক, কিন্তু হাল ছেড়ে দিলেন না। ১৮৭২-এ প্রকাশিত একটি পুস্তিকায় আত্মপক্ষ সমর্থনে তিনি বললেন, বিদ্যাসাগরের বইগুলিকে 'secularist' বই হিসাবে চিহ্নিত করে অন্যায় তিনি কিছু করেননি। কারণ **'The author deliberately struck out the injunction to worship God ; because his moral teaching has no reference to God's will, but simply to what people around would think or do ; because he omitted all passages teaching the immorality of the soul, the responsibility of men, and the difference between him and the brutes that perish. If it is 'misleading' to describe such books as "secularist", the writer confesses he does not know the meaning of the term.'**[৫৪]

বাংলার মিশনারিদের বিদ্যাসাগরের পুস্তক-বিরোধী করে তুলতে না পারলেও, তিনি কিন্তু তাঁর লড়াই অব্যাহত রাখলেন। ১৮৭৩-এ মাদ্রাজ থেকে প্রকাশিত ***Hints on Government Education in India*** বইটিতে তিনি আবার 'বর্ণপরিচয়' ও 'বোধোদয়'-এর তীব্র সমালোচনা করলেন। প্যারীচরণ সরকারের ফার্স্ট বুক সিরিজের বইগুলির সঙ্গে বিদ্যাসাগরের 'বর্ণপরিচয়'-এর তুলনা করে জানালেন :
'The moral and religious tone of the series is far higher than that of the Bengali Reading Books which have the largest circulation. In the 67 pages of the Bornoporichoy, parts 1 and II, there does not seem to be a single allusion to God or a future state.'[৫৫]

১৮৮১-তে মাদ্রাজ থেকে প্রকাশিত 'এডুকেশন ইন ইন্ডিয়া' বইটিতে তিনি আবার বিদ্যাসাগর রচিত পাঠ্যপুস্তকগুলির বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করলেন। আক্ষেপ করে তিনি বললেন : হা ঈশ্বর ! বর্ণপরিচয়ের মতো বই এখনও মিশন স্কুলে পড়ানো হয় ![৫৬] তাঁর এই স্বীকারোক্তি থেকেই বোঝা যায়, বর্ণপরিচয়ের বিরুদ্ধে সংগ্রামে তিনি জয়ী হতে পারেননি।

'বর্ণপরিচয়' নিয়ে এতসব বিতর্ক দানা বাঁধার আগেই জেমস লং-এর 'এ ডেস-ক্রিপটিব ক্যাটালগ অব বেঙ্গলি ওয়ার্কস' প্রকাশিত হয়। সেকালের বিখ্যাত মিশনারি পত্রিকা 'ক্যালকাটা খ্রিশ্চান অবজার্ভারে' জে. ওয়েঙ্গার ক্যাটালগটির সমালোচনা

প্রসঙ্গে মন্তব্য করেন ঃ গত দশ-বারো বছরের মধ্যে বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে এক বিস্ময়কর পরিবর্তন এসেছে। লেখকের সংখ্যা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে, লেখার মানও উন্নত হয়েছে। কৃষ্ণমোহন, গৌরীশঙ্কর, মদনমোহন, রাজেন্দ্রলাল, নীলমণি বসাক ও তারাশঙ্করের নাম প্রসঙ্গত স্মরণীয়। কিন্তু পূর্ণচন্দ্রোদয় প্রেসের উৎসাহী মালিক ইউ· সি· আঢ্য ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নাম বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। একালের লেখকদের মধ্যে বিদ্যাসাগরের শ্রেষ্ঠত্ব সংশয়াতীত। সমালোচনা প্রসঙ্গে বর্তমান বাংলাসাহিত্যে মৌলিকতার অভাবের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে ওয়েঙ্গার বলেন ঃ বাংলা সাহিত্যের এখনও নিতান্ত শৈশব অবস্থা। এই কথার সপক্ষে এটাই বলা যথেষ্ট যে অধিকাংশ বাংলা বই-ই (আদিরসাত্মক কুরুচিপূর্ণ কয়েকটি বই বাদ দিলে) হয় ইংরেজি, নয় সংস্কৃত, আর না হয় অন্য কোনো বিদেশি ভাষার অনুবাদ অথবা অনুকরণ। এমনকি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরও প্রধানত একজন অনুবাদক বা বিদেশি মডেলের অনুকারক হিসাবে খ্যাত। ('Bengali Literature is even now in its infancy. In proof of this startling question, we need only to refer to the plain fact that (with the exception of a number of disreputable erotic works) the great majority of Bengali books of any rate are either translations or imitations of Sanskrit or English or other foreign originals. Even Ishwar Chandra Vidyasagar is principally distinguished as a translator or imitator of foreign models.')[৫৭]

সাহিত্যিক হিসাবে বিদ্যাসাগরের স্থান নিয়ে যখন আলোচনা শুরু হয়েছে, তখনই বিধবাবিবাহ আন্দোলনের সূত্র ধরে বিদ্যাসাগর বাঙালিসমাজে রীতিমতো সম্ভ্রমের এক আসন অধিকার করে নিয়েছেন। প্রধানত তাঁর প্রচেষ্টায় ১৮৫৬-র জুলাই মাসে বিধবাবিবাহ আইন প্রণীত হল এবং এর কয়েক মাসের মধ্যে শহর কলকাতার বুকে ধুমধাম করে অনুষ্ঠিত হল প্রথম বিধবা বিয়ে। এইসব ঘটনার সুবাদে বিদ্যাসাগর পরিণত হলেন প্রবাদপুরুষে। এত ব্যস্ততার মধ্যেও কিন্তু তাঁর পাঠ্যপুস্তক রচনার স্রোত অব্যাহত। পাঠ্যপুস্তক রচনার সূত্রে তিনি শুধু অপরিমিত বিত্তই অর্জন করলেন না, বাংলার শ্রেষ্ঠ পাঠ্যপুস্তক রচয়িতার গৌরবও লাভ করলেন। ১৫ সেপ্টেম্বর ১৮৫৪-য় 'সংবাদ প্রভাকর' বালক-শিক্ষার উপযোগী বই-এর একমাত্র লেখক হিসাবে বিদ্যাসাগরকে চিহ্নিত করে বলে 'পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় যে কয়েকখানি পুস্তক প্রকটন করিয়াছেন কেবল তাহাই বালকদিগের শিক্ষাপোযোগী হইয়াছে।' ১৮৫৬-র ফেব্রুয়ারি মাসে প্রকাশিত হল তাঁর 'কথামালা'। এই বইটি লিখতে তাঁকে উৎসাহিত করেছিলেন শিক্ষাকর্মাধ্যক্ষ গর্ডন ইয়ং। রেভাঃ টমস জেমসের ইংরেজি অনুবাদ অবলম্বন করে বিদ্যাসাগর ঈশপের গল্পগুলিকে বাংলায় রূপান্তরিত করলেন। ছেলেদের কাছে আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য এর প্রথম সংস্করণে ৬টি উডকাট ছবি ব্যবহৃত হয়। জেমস লং বইটির 'simple but elegant style'-এর

প্রশংসা করেন।[৫৮] রেভাঃ কে. এস. ম্যাকডোনাল্ড অবশ্য মনে করতেন 'কথামালা'য় উন্নতির প্রচুর অবকাশ আছে। তাঁর মতে বইটিতে যে ছবিগুলি আছে, সেগুলি জঘন্য ধরনের।[৫৯]

'কথামালা' প্রকাশিত হবার মাসচারেক পর ছেলেদের লেখাপড়ায় 'অনুরাগ ও উৎসাহবৃদ্ধির জন্য' তিনি কয়েকজন 'মহানুভবের বৃত্তান্ত' সংক্ষেপে সরল ভাষায় 'চরিতাবলী' নাম দিয়ে সংকলন করেন। যেসব মহানুভবের কথা এদেশের বালকদের জন্য বিদ্যাসাগর সংকলন করেন তাঁরা হলেন ডুবাল, রস্কো, হীন, জিরমস্টোন, হন্টর, সিমসন, ইটন, ওগিলবি, লীডন, জেঙ্কিন্স, গিফোর্ড, উইঙ্কিলমন, পণ্টেলস, এড্রিয়ন, প্রিডো, এডাম, লমনসফ, মেডক্স, লঙ্গোমণ্টেন্স ও রেমস। 'চরিতাবলী'র মতো স্কুল-পাঠ্য গ্রন্থে শুধু বিদেশীয়দের মাহাত্ম্যপ্রচার করাকে সেকালে অনেকেই প্রসন্নচোখে দেখেননি। বিখ্যাত শিক্ষাবিদ ভূদেব মুখোপাধ্যায় এই কাজকে সমাজের পক্ষে ক্ষতিকর বলে মনে করতেন। তাঁর মতে 'চরিতাবলী'র মতো পাঠ্যপুস্তকে সুকুমারমতি বালকেরা বড়লোকের চরিত্র পাঠ করতে গিয়ে কেবল বিদেশীর নাম দেখে এবং তাদের স্বদেশীয়দের মধ্যে বড়লোক বা ভালো লোক কেউ নেই এরকম মনে করতে শেখে, এর ফলে তারা জাতীয় মর্যাদাবোধশূন্য হয়ে পড়ে। ডুবালের কাহিনী শুধু 'জীবনচরিতে' লিখে সন্তুষ্ট না হয়ে বিদ্যাসাগর আবার তা 'চরিতাবলী'র জন্য নতুন করে লেখেন। এ সম্পর্কে ক্ষোভপ্রকাশ করে ভূদেব মুখোপাধ্যায় বলেন ঃ

'ডুবাল একটি বিড়াল মারিয়া তাহার চর্ম বিক্রয় করিয়া পুস্তক ক্রয় করিয়াছিলেন—এই বিবরণ শুনিয়া এ দেশের ভদ্র হিন্দু, জৈন এবং মুসলমান সন্তানেরা কি শিখিবে? ঐরূপ কার্য তাহাদিগের করিতে যাওয়া কি সম্ভব বা প্রার্থনীয়? এদেশে দানধর্মের বাহুল্য নিবন্ধন এবং পুস্তক লিখিয়া লওয়ার প্রাচীন রীতির স্মৃতি রক্ষিত থাকা নিবন্ধন, ওরূপ অবস্থাতে কাহাকেও পড়িতে হয় না।'[৬০] ছাত্রদের এই ধরনের বইপড়া ঠিক নয় মনে করে তিনি কালীময় ঘটককে 'চরিতাষ্টক' লিখতে উৎসাহিত করেন। 'চরিতাষ্টকে'র প্রথম ভাগ ১৮৬৭-তে প্রকাশিত হয়। এতে কৃষ্ণচন্দ্র রায়, জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন, ভারতচন্দ্র রায়, কৃষ্ণ পান্তি, রামমোহন রায়, পদ্মলোচন মুখোপাধ্যায়, মতিলাল শীল ও হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের জীবনকাহিনী আলোচিত হয়। বইটির সমালোচনা প্রসঙ্গে বিদ্যাসাগরকে কটাক্ষ করে 'সোমপ্রকাশ' লেখে ঃ

'আমাদের চতুষ্পার্শ্বে মহানুভব লোকের অপ্রতুল নাই, কিন্তু আমাদের এমনি এক বিষম রোগ জন্মিয়াছে যে আমরা তাঁহাদের প্রতি একবারও দৃষ্টিপাত না করিয়া··· বিদেশীয় ব্যক্তিদিগের জীবনচরিতের অনুবাদ করিয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ জ্ঞান করি। যদি গ্রন্থ প্রয়ণেচ্ছুক মহাশয়েরা ইহা না করিয়া স্বদেশীয় ব্যক্তিদিগের গুণপ্রকটনে প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলে তাঁহাদিগের শ্রম সার্থক হয় এবং তাঁহাদিগের গ্রন্থপাঠপূর্বক গ্রন্থবর্ণিত ব্যক্তির গুণ দর্শন করিয়া পাঠকগণেরও তাঁহাদের অনুকরণে প্রবৃত্তি জন্মে।'[৬১]

বিদেশীয়দের জীবনচরিত রচনা করার ব্যাপারটাকে বিদ্যাসাগরের ভাই শম্ভুচন্দ্রও

ভালোচোখে দেখেননি। তাই স্বদেশীয় পনেরো জন বিশিষ্ট লোকের জীবনী অবলম্বনে তিনি রচনা করেন 'চরিতমালা'। এই পনেরো জনের মধ্যে বিদ্যাসাগরও ছিলেন। 'চরিতমালা'র ভূমিকায় শম্ভুচন্দ্র লেখেন, 'বিদেশীয় মহানুভবলোকের জীবনবৃত্তান্ত পাঠ করা অপেক্ষা স্বদেশীয় লোকের জীবনচরিত পাঠে সুকুমারমতি বালকদিগের লেখাপড়ায় সবিশেষ অনুরাগ জন্মিতে ও উৎসাহ বৃদ্ধি হইতে পারে, এতদভিপ্রায়েই এই চরিতমালা নামক পুস্তক লেখা হইয়াছে।' শম্ভুচন্দ্রের বইটি সেকালে রীতিমতো জনপ্রিয়তা অর্জন করে। এতে 'স্বজাতীয় বড়লোকদের' বিবরণ থাকায় ভূদেব মুখোপাধ্যায় 'ঐ পুস্তকখানিকে চরিতাবলী অপেক্ষা উৎকৃষ্ট পুস্তক' বলে মনে করতেন।

'চরিতাবলী' প্রকাশের পর বছরতিনেক সংস্কৃত প্রেস থেকে বিদ্যাসাগরের নতুন কোনো বই প্রকাশিত হয়নি। আসলে এইসময়ে তিনি বিধবাবিবাহ নিয়ে এত ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন যে, নতুন কোনো বই লেখার মতো অবসর তাঁর ছিল না। সাহিত্য-জগৎ থেকে বিদ্যাসাগরের এই স্বেচ্ছানির্বাসনে সেকালে অনেকে ব্যথিত হয়েছিলেন। 'পূর্ণিমা' পত্রিকায় কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য এজন্য ক্ষোভপ্রকাশ করে লেখেন :

'অনেকদিন অবধি আপনি চুপ করিয়া আছেন। যদিও দিবারাত্রে একবারও আপনার ছাপাখানার কামাই নাই, তথাপি বহুকাল হইল আপনার কোন নূতন জিনিসের সহিত আপনার মুদ্রাযন্ত্রের সমাগম নাই, কেবল ভূগোল আর জ্যোতিষ আর হ্যান ত্যান আর রাবিশ বাহির হইতেছে। ভাবিয়াছেন বুঝি 'ঢের হইয়াছে, এখন বিধবাবিবাহ প্রচলিত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, আর ও সকলে কাজ কি।' আপনার এখন বুঝি ইচ্ছা হইয়াছে যে 'লোকে আমার বেতাল, আমার আর সকল ভুলিয়া যাউক। কেবল এইমাত্র মনে রাখুক, যে আমি এখন যে ব্রতের ব্রতী হইয়াছি, তাহাতে আমার ধন, মান, স্বাস্থ্য ও স্বাচ্ছন্দ্য, সকলই বলিদান দিতে রাজী আছি এবং তাহা কেবল কতকগুলি হতভাগা জীবের প্রতি দয়ার নিমিত্ত।

'কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করি যে যদি আপনার মনের গতিক এমন হইয়া থাকে, তাহা হইলে আপনাকে কি কিছু কৃতঘ্ন হইতে হয় নাই ? বাগ্‌দেবীর আশ্রয় লইয়াই আপনি কীর্তির পথে অবতীর্ণ হইয়াছেন এবং তাঁহারই অনুকম্পায় লোকের নিকট পরিচিত হইয়াছেন এবং তাহারই প্রভাবে আপনার লৌকিক ক্ষমতার সূত্রপাত হইয়াছে। বাঙ্গালার মধ্যে আপনিই তাঁহার জ্যেষ্ঠ এবং প্রিয়পুত্র। তিনি যেরূপ বৎসলভাবে আপনার প্রতিপালন করিয়াছেন, যে সকল স্নেহের অভিজ্ঞান দিয়াছেন, এখন কি তাহা বিস্মরণ হওয়া উচিত ? এখন চারিদিক হইতে তাঁহার সতিনপোরা বড় হইয়া তাঁহাকে যে অশেষ ক্লেশ দিতেছে ; তাঁহাকে জোর করিয়া সঙ সাজাইয়া দিতেছে এবং বিবিধ-প্রকারে তাঁহার অপমান করিতেছে, সে সকল কি আপনার তামাসার মত দাঁড়াইয়া দেখা উচিত ?

'একথা বলিলে আস্ত খোসামুদির মত শুনাইবে বটে যে, বাঙ্গালাভাষায় যাহা কিছু ভাল জিনিষ হইয়াছে, সকলই আপনা হইতে। যদি ইংরেজির তেমন প্রচার না

হইত, যদি লোকে নূতন নূতন বিষয় ভাবিতে না পাইত, তাহা হইলে আপনা হইতেই যে এখন যেমনটি হইয়াছে, তেমনি হইত, আমার এরূপ বিশ্বাস হয় না। কিন্তু ইহাও না মানিলে চলে না যে, যদি আপনি না পথ দেখাইয়া দিতেন, যদি আপনি না আশা দিতেন যে, কালক্রমে বাঙ্গালা রচনা দ্বারা মানুষের মনকে যেদিকে খুসি লওয়া যাইতে পারা যাইবে, তবে কি কেহ এখন স্বভাষার উন্নতিসাধনে হাত দিত ?···এখন আমরা দেখিতে পাই যে ইংরেজির পারগামীরা পর্যন্ত দুই এক ঘণ্টা আমাদিগকে স্বভাষায় উপদেশ দিতে লজ্জাবোধ করেন না। ইটী আপনারই কীর্তি।···

'সে যাহা হউক, আপনার কিন্তু এখনও ইহলোকের কর্ম শেষ হয় নাই—অথবা উত্তরকালে অমর হইবার সনন্দ সম্পূর্ণরূপে পাওয়া হয় নাই। যশোমন্দিরের ভিতরে যাইবার কি টিকেট সংগ্রহ করিয়াছেন। আমার [বিবেচনায়] দুই গ্রন্থ বই আর কিছুই [নাই] এক বেতাল, আর সংস্কৃত সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব। অতএব সে দুখানি টিকেট গ্রাহ্য হইবে কিনা তাহা বিবেচনা করা আবশ্যক।'[৬২]

'পূর্ণিমা'র এই লেখাটি পড়ে সম্ভবত বিদ্যাসাগর এ-বিষয়ে কিছুটা সচেতন হয়ে ওঠেন। তাই এই লেখাটি প্রকাশিত হবার অল্পদিনের মধ্যেই সংস্কৃত প্রেস থেকে তাঁর নতুন দুটি বই প্রকাশিত হয়। প্রথম বইটি 'মহাভারতের উপক্রমণিকা'। এটি লেখার কাজে বিদ্যাসাগর হাত দিয়েছিলেন বহুদিন আগেই। ১৭৭০ শকের ফাল্গুন মাস থেকে ১৭৭৪ শকের চৈত্র মাস পর্যন্ত 'তত্ত্ববোধিনী'তে কখনও প্রতিমাসে, কখনও বা দু'একমাস অন্তর এটি প্রকাশিত হচ্ছিল। পাঠ্যপুস্তক রচনা ও অন্যান্য কাজকর্মে ব্যস্ত থাকায়, নিয়মিতভাবে এই অনুবাদ প্রকাশ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি ('তত্ত্ব-বোধিনী পত্রিকা'র ১৭৭১ শকের কার্তিক, মাঘ, ফাল্গুন, ১৭৭২ শকের বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আশ্বিন-পৌষ, ১৭৭৩ শকের আষাঢ়-কার্তিক, ১৭৭৪ শকের আষাঢ়, আশ্বিন-ফাল্গুন সংখ্যায় মহাভারতের অনুবাদ প্রকাশিত হয়নি)। মহাভারতের আদিপর্বটুকু অনুবাদ করেই বিদ্যাসাগর থেমে যান এবং ১৮৬০-এর গোড়ার দিকে এই অংশটুকু 'মহাভারতের উপক্রমণিকা' নাম দিয়ে পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন।

এর কয়েকমাসের মধ্যে ভবভূতির 'উত্তররামচরিত' ও বাল্মীকির রামায়ণের উত্তরকাণ্ড অবলম্বনে তিনি রচনা করলেন 'সীতার বনবাস'। এটি প্রকাশিত হবার কিছুদিন পরে 'শুভকরী' পত্রিকা লেখে, 'বিদ্যাসাগর মহাশয় 'সীতার বনবাস' প্রভৃতি কয়েকখানি গ্রন্থ রচনা করিয়া ভাষার কত শ্রীবৃদ্ধি সাধনই করিয়াছেন। তাঁহার রচনাশক্তির পরিচয় আর অধিক কি দিব। এক কথা বলিলেই সকলেই বুঝিতে পারিবেন যে বিদ্যাসাগর প্রণীত গ্রন্থ প্রচারিত হইবার পূর্বে অনেকে বাঙ্গালাপুস্তক অধ্যয়ন করিতে প্রবৃত্তই হইতেন না।'[৬৩] 'সীতার বনবাসে' বিদ্যাসাগরের 'পাণ্ডিত্য-দর্শন' করে শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন মোহিত হয়ে গেলেন। করুণরসের বর্ণনায় বিদ্যাসাগরকে বাল্মীকির তুল্য ক্ষমতার অধিকারী বলতে তিনি ইতস্তত করলেন না। তাঁর মতে

'অতি নিষ্ঠুর নির্দয় ব্যক্তিও সীতার বনবাসের অষ্টম পরিচ্ছেদ পাঠ বা শ্রবণ করিলে অশ্রুজল বিসর্জন না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে সক্ষম হন না।' সেকালে অনেকে এটিকে বিদ্যাসাগরের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকীর্তি বলে মনে করতেন। হেমনাথ মিত্রের মতে 'সীতার বনবাস বিদ্যাসাগরের সর্বোৎকৃষ্ট গ্রন্থ। ইহার ভাষা যেরূপ সুধাবর্ষিণী, রচনাও সেইরূপ হৃদয়গ্রাহিণী। কয়েকটি স্থলের রচনা ভিন্ন ইহাকেও মৌলিক গ্রন্থ বলা যাইতে পারে। এই পুস্তক আদ্যোপান্ত পাঠ করিলে বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম হয় যে বিদ্যাসাগর মহাশয় করুণরসের অবতারণায় অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন।'[৬৪] হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এটিকে অনুবাদ বলে মনেই করতেন না। তাঁর মতে 'সীতার বনবাসের ন্যায় প্রকাণ্ড কাব্য আজিও বাংলা ভাষায় দৃষ্টিগোচর হয় নাই। অনেকে বলেন যে সীতার বনবাস মৌলিক গ্রন্থ; কিন্তু মৌলিক হউক, আর নাই হউক, অনুবাদ তো নয়।'[৬৫]

বইটিতে বিদ্যাসাগরের কবিত্বশক্তি ও করুণরস সৃষ্টির দক্ষতা দেখে অনেকে অভিভূত হলেও, বঙ্কিমচন্দ্র হননি। 'সীতার বনবাস'কে তিনি 'কান্নার জোলাপ' মনে করতেন। 'উত্তরচরিত' প্রবন্ধে ভবভূতির রামের রোদনপ্রবণতার সমালোচনা প্রসঙ্গে বিদ্যাসাগরকে কটাক্ষ করে তিনি লেখেন, 'ইহাতেও কোন মান্য আধুনিক লেখকের মন উঠে নাই। তিনি স্বপ্রণীত বাঙ্গালা গ্রন্থে আরও কিছু বাড়াবাড়ি করিয়াছেন, তাহা পাঠকালে রামের কান্না পড়িয়া আমাদিগের মনে হইয়াছিল যে বাঙ্গালির মেয়েরা স্বামী বা পুত্রকে বিদেশে চাকরি করিতে পাঠাইয়া এইরূপ করিয়া কাঁদে বটে।' 'সীতার বনবাসে' করুণরসের বাড়াবাড়ি বঙ্কিমচন্দ্রের ভালো না লাগলেও, সেকালের বাঙালি পাঠকসমাজ কিন্তু বইটিকে সাদরে গ্রহণ করেছিল। বইটির জনপ্রিয়তাই তার প্রমাণ। ১২৭২-এ 'সীতার বনবাস' অবলম্বনে উমেশচন্দ্র মিত্র 'সীতার বনবাস' নাটক রচনা করেন। উপক্রমণিকায় উমেশচন্দ্র বললেন, 'বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রণীত সীতার বনবাসই এই নাটকখানির আদর্শ বলিতে হইবেক। ইহার অনেকস্থানে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভাষা অবিকল ব্যবহার করিয়াছি।' নাটকটি ১৮৬৬ সালের জুন মাসে ভবানীপুরের নীলমণি মিত্রের বাড়িতে অভিনীত হয়। পূর্ববঙ্গের রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়ও বিদ্যাসাগরের বইটিকে অবলম্বন করে পদ্যে 'সীতার বনবাস' রচনা করলেন। বিদ্যাসাগরের বইটি দীর্ঘকাল পাঠ্যপুস্তক হিসাবে প্রচলিত থাকার পর বাতিল হয়ে গেলে 'নবজীবন' পাঠ্যপুস্তক নির্বাচন সমিতির কার্যকলাপের তীব্র সমালোচনা করে বলে, 'এখন সীতার বনবাসের আদর নাই। উহার স্থলে রামচরিত, রাম বনবাস ও রামের জন্মাভিষেকেরই জয় ঘোষণা হইতেছে।...প্রেসিডেন্সিতে (বিভাগে) রামের রাজ্যাভিষেক বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সীতার বনবাসকে টিটকারি দিতেছে।'[৬৬]

দিলেও, তা নিয়ে মাথা ঘামাবার মতো অবকাশ ছিল না বিদ্যাসাগরের। 'সীতার বনবাস' প্রকাশিত হওয়ার বছরতিনেক পর ১৮৬৩-তে কয়েকটি ইংরেজি পুস্তক অবলম্বনে তিনি রচনা করলেন 'আখ্যানমঞ্জরী'। এতে প্রচারিত আখ্যানগুলির সাহায্যে বিদ্যাসাগর ছাত্রদের 'ভাষাজ্ঞান ও নীতিজ্ঞান' শিক্ষা দেবার চেষ্টা করলেন।

'আখ্যানমঞ্জরী' প্রকাশিত হবার পরের বছর 'শব্দমঞ্জরী' নামে বিদ্যাসাগর যে ছোট বাংলা অভিধানটি প্রকাশ করেন, সেটি অবশ্য তাঁর অন্যান্য পুস্তকের মতো জনপ্রিয়তা লাভ করেনি। এটি প্রকাশিত হবার পর বছরপাঁচেক বিদ্যাসাগর গদ্যে নতুন কিছু লেখেননি—না কোনো পাঠ্যপুস্তক, না কোনো অনুবাদ গ্রন্থ। দীর্ঘ নীরবতার পর ১৮৬৯-এর ডিসেম্বরে প্রকাশিত হল 'ভ্রান্তিবিলাস'। বইটির বিজ্ঞাপনে তিনি বলেন, "কিছুদিন পূর্বে ইংলণ্ডের অদ্বিতীয় কবি শেক্সপীয়র প্রণীত ভ্রান্তিপ্রহসন পড়িয়া আমার বোধ হইয়াছিল, এতদীয় উপাখ্যানভাগ বাঙ্গালাভাষায় সঙ্কলিত হইলে লোকের চিত্তরঞ্জন হইতে পারে। তদনুসারে ঐ প্রহসনের উপাখ্যানভাগ বাঙ্গালাভাষায় সঙ্কলিত ও ভ্রান্তিবিলাস নামে প্রচারিত হইল।' এর আগে বিদ্যাসাগর ইংরেজি থেকে বেশ কয়েকটি বই বাংলায় অনুবাদ করলেও, তার কোনোটিই 'লোকের চিত্তরঞ্জন' করার জন্য রচিত হয়নি। সেদিক দিয়ে 'ভ্রান্তিবিলাস' এক ব্যতিক্রম। আর একটি দিক দিয়েও বিদ্যাসাগর প্রচলিত অনুবাদ-রীতি থেকে সরে এসেছেন। তাঁর মতে 'বাঙ্গালাপুস্তকে ইয়ুরোপীয় নাম সুশ্রাব্য হয় না, বিশেষতঃ যাঁহারা ইঙ্গরেজী জানেন না, তাদৃশ পাঠকগণের পক্ষে বিলক্ষণ বিরক্তিকর হইয়া উঠে। এই দোষের পরিহার-বাসনায়, ভ্রান্তিবিলাসে সেই সেই নামের স্থলে এতদ্দেশীয় নাম নিবেশিত হইয়াছে। উপাখ্যানে এবংবিধ প্রণালী অবলম্বন করা কোনও অংশে হানিকর বা দোষাবহ হইতে পারে না। ইতিহাস বা জীবনচরিতে নামের যেরূপ উপযোগিতা আছে, উপাখ্যানে সেরূপ নহে।' বেশ বোঝা যাচ্ছে, সাহিত্যসৃষ্টির প্রচলিত পথ ছেড়ে বিদ্যাসাগর এক স্বতন্ত্র পথের যাত্রী হতে চাইছেন।

তাঁর এই চাওয়াটাকে সেকালে অনেকেই যে প্রসন্নচোখে দেখেননি, তা বোঝা যায় ১২৭৭-এর ৩১ বৈশাখ 'এডুকেশন গেজেট'-এ প্রকাশিত 'ভ্রান্তিবিলাস'-এর দীর্ঘ সমালোচনা থেকে। 'এডুকেশন গেজেট'-এ যেসব পুস্তক সমালোচনা প্রকাশিত হত, তা ভুদেব মুখোপাধ্যায়ই লিখতেন। বিদ্যাসাগরের 'ভ্রান্তিবিলাসে'র সমালোচনাও যে তিনিই করেছিলেন, এ-বিষয়ে সংশয়ের অবকাশ নেই। সুদীর্ঘ এই সমালোচনায় 'ভ্রান্তিবিলাস'কে অবলম্বন করে তিনি বিদ্যাসাগরের রচনাবৈশিষ্ট্য আলোচনা করলেন। এই লেখাটি নিছক একটি পুস্তক সমালোচনা মনে করলে ভুল হবে, আজকের দিনে আমরা যাকে Review-article বলি, এটি তা-ই। বিদ্যাসাগরের লেখায় একাধিক গুণ সমালোচকের চোখে পড়ে। মুক্তকণ্ঠে সেগুলির কথা বলতে তিনি দ্বিধা করেননি। বিদ্যাসাগরের 'রসগ্রাহিতা শক্তির প্রখরতা' সমালোচকের চোখ এড়ায়নি। এ-প্রসঙ্গে সমালোচকের মন্তব্য ঃ

'বিদ্যাসাগর প্রণীত কোন কাব্যগ্রন্থ পড়িলে সর্বাগ্রে তাঁহার রসগ্রাহিতা শক্তির প্রখরতার দিকে বিশেষ দৃষ্টি পড়ে। নিজের কল্পনাশক্তি এত অল্প থাকিয়া কেবল রসানুভাবকতার শক্তির বলে অপরের ভাবকে সম্যক পরিমাণে নিজায়ত্ব করিতে পারেন, এ-পর্য্যন্ত বাঙ্গালা লেখকের মধ্যে আমরা বিদ্যাসাগরের সদৃশ কাহাকেও

দেখি নাই।...তাঁহার গ্রন্থ দেখিলে বোধ হইবে, তিনি যেটী বুঝিয়াছেন, সেটী আর কেহ তেমন বুঝিতে পারে নাই। যেখানে অন্য লোকে কেবল ভাবের আভাসমাত্র পাইয়াছে, বিদ্যাসাগর তাহার মর্ম অধিকার করিয়াছেন।...তাঁহার প্রচারিত গ্রন্থে কোথাও ব্যাকুলতা প্রকাশ নাই, আয়াস প্রকাশ নাই, জটিলতা নাই, উষাকালীন মৃদুল আলোক নাই; তিনি সর্বত্রই সমান ধীর, সমান সমর্থ, সমান মর্মদর্শী; সর্বত্রই মধ্যাহ্ন সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী। অভিনব প্রকাশিত ভ্রান্তিবিলাস গ্রন্থেও এই সমস্ত গুণের পরিচয় পাওয়া যায়।'[৬৬ক]

উপাখ্যান রচনায় বিদ্যাসাগরের কৃতিত্ব স্বীকারে ভুদেব কুণ্ঠাবোধ করেননি। তাঁর মতে, 'উপাখ্যান রচনার পারিপাট্য বিষয়ে বিদ্যাসাগর মহাশয়কে অদ্বিতীয় বলিতে হইবে।...বিদ্যাসাগর মহাশয় এইরূপ সঙ্কলনকার্য্যে অতি পারদর্শী ও সর্বদাই কৃতকার্য্য হইয়া থাকেন। তাঁহার লিখিত উপাখ্যান প্রায় কুত্রাপি নীরস হয় না, খালিও থাকে না।...রসের প্রাচুর্যবশতঃ ষোল কলায় পূর্ণ থাকে।'

বাংলা ভাষায় 'গদ্যকাব্য' রচনায় বিদ্যাসাগরের কৃতিত্ব অকপটে স্বীকার করে তিনি বলেন, অন্য অনেকে এই চেষ্টা করেছেন,' 'কিন্তু কেহই বিদ্যাসাগরের মত কৃতকার্য্য হয়েন নাই।'

বিদ্যাসাগরের ভাষার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে ভুদেব বললেন:

'ভাষাবিষয়ে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করিতে হয়। এমন মার্জিত পবিত্র বাঙ্গালা আর কাহারও লেখনী হইতে বাহির হয় না।...বিদ্যাসাগর মহাশয়ের লেখনী হইতে ভ্রমেও সংস্কৃত কি ইংরাজী দোষ কলুষিত ভাষা বিনির্গত হয় না। ইহাঁর রচনা বিশুদ্ধ বাঙ্গলার আদর্শস্বরূপ হইয়া আছে। এ পর্য্যন্ত বাঙ্গলা ভাষার যে প্রকৃতি স্ফূর্তি হইয়াছে, তাহা বিদ্যাসাগর যেমন বুঝিয়া চলেন, কি পদ্য কি গদ্য রচনাকার মধ্যে আর কেহই তেমন বুঝিয়া চলিতে পারেন না।' (বিদ্যাসাগরের ভাষা সম্পর্কে ভুদেবের এই ধারণা কোনোদিনই পরিবর্তিত হয়নি। শেষজীবনে অসুস্থ অবস্থায় বিদ্যাসাগর যখন ফরাসডাঙায় ছিলেন, ভুদেব তখন তাঁর সঙ্গে দেখা করে বলেছিলেন, 'ভাষার উপকার জন্য বাঙ্গালি জাতিটা আপনার নিকট চিরকৃতজ্ঞ।')

বিদ্যাসাগরের এত প্রশংসা করলেও, তাঁর ত্রুটির দিকগুলি তাঁর চোখ এড়ায়নি। 'ভ্রান্তিবিলাস' সমালোচনা প্রসঙ্গে আক্ষেপ করে তিনি বললেন, 'ভ্রান্তি প্রহসন' শেক্সপিয়রের সর্বনিকৃষ্ট নাটক। 'বিদ্যাসাগর মহাশয় এতদ্দেশে সেক্সপীয়রের পরিচয় দিবার নিমিত্ত তদীয় সর্বনিকৃষ্ট নাটকখানি মনোনীত করিয়া আপনার আশয়গত ত্রুটি দেখাইয়াছেন বলিতে হইবে; কিন্তু সে নিমিত্ত তাঁহাকে তিরস্কার না করিয়া কেবল আপনাদিগের অদৃষ্টকেই তিরস্কার করিতে হয়। অশ্বমেধ যজ্ঞের অধিকারী হইয়া তিনি আমাদের কপালগুণে ঘেঁটু পূজার অনুষ্ঠানে তৃপ্তিবোধ করিলেন, বঙ্গ কাব্যোদ্যানের শোভা সম্পাদনের নিমিত্ত নন্দনকানন ভ্রমণপূর্বক ভাণ্ডীবৃক্ষ আনয়ন করিলেন।'

ভূদেবের মতে বিদ্যাসাগর নিজের শক্তির ক্ষমতা জানেন, তাই যা তিনি করতে পারেন, তার বাইরে সাধ্যাতীত কোনো বিষয়ে কখনও তিনি হাত দেন না। বিদ্যাসাগরের এই সংযমের প্রশংসা করেছেন তিনি। জানিয়েছেন, বিদ্যাসাগর 'যেসব কাব্যরত্নাকর' হতে 'রত্ন' উদ্ধারে ব্রতী হয়েছেন, সেগুলির গভীরে প্রবেশ করতে পারেননি। 'কালিদাস ও ভবভূতি হইতে দুই চারিটী গভীর জলশায়ী মণিমুক্তা আহরণ করিয়াছেন বটে ; কিন্তু সেক্সপীয়রের বেলায় তিনি হাঁটুজলের বাহিরে যাইতে সাহসী হয়েন নাই।' ভূদেবের মতে এজন্য বিদ্যাসাগরকে সমালোচনা করা ঠিক নয়। কারণ 'কালিদাস সেক্সপীয়র প্রভৃতি মহাকবিগণের ভাবরাশি সম্যক আয়ত্ব করিয়া ভাষান্তরিত করা সেক্সপীয়র ও কালিদাসের হইতেও অধিক ক্ষমতা সাপেক্ষ।' 'সাধ্যাতীত' বিষয়ে ব্যর্থতার জন্য বিদ্যাসাগরকে দোষারোপ না করলেও, 'সাধ্যায়ত্ত' বিষয়ের বিকৃতি ঘটানোর জন্য ভূদেব তাঁর তীব্র সমালোচনা করেছেন :

'সাধ্যাতীত বিষয়ে নিশ্চেষ্টভাব অবলম্বন জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয়কে অবশ্যই ক্ষমা করিতে হইবে। কিন্তু যে স্থলে তিনি সাধ্যায়ত্ত বিষয়ের বিকৃতি জন্মাইয়াছেন, সে স্থলে তাঁহাকে কোন ক্রমেই ক্ষমা করা যাইতে পারে না। তিনি যে সমস্ত মহাগ্রন্থ অবলম্বনপূর্বক পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন, তদ্বর্ণিত নায়ক-নায়িকাগণের প্রকৃতি ভিন্ন ভিন্ন। বিদ্যাসাগর সর্বত্রই এই প্রকৃতিগত ভেদের বিপর্যয় করিয়া সমস্ত নায়ক-নায়িকাকে সমপ্রকৃতিক বা অপ্রকৃতিক করিয়া তুলিয়াছেন।

'বিদ্যাসাগর মহাশয় নায়ক-নায়িকার বর্ণনা বিষয়ে আমাদিগের দেশী চিত্রকর ও প্রতিমাকরের নিকটে উপদেশ লইয়াছেন। তাঁহার সমস্ত রাজা, সমস্ত রাণী, সমস্ত ঋষিগুলি এক গড়নের, সকলেই অভিন্ন অবয়ব। তাঁহার কার্যালয়ে যে দুই চারিটী মাত্র ছাঁচ আছে, তিনি তদ্দ্বারাই সর্ববিধ প্রতিমার গঠন করেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় যদি মহা মহা কবিগণের গ্রন্থে হস্তার্পণ না করিয়া কেবল আরব্য উপন্যাস রচনা করিতেন, তাহা হইলে এরূপ ব্যবহারে কোন দোষ স্পর্শিত না ; কিন্তু রাজা দুষ্মন্ত, কণ্বমুনি, অনসূয়া, প্রিয়ম্বদা, জানকী, রামচন্দ্র, চিরঞ্জীব, কিঙ্কর এ সমস্তের তাদৃশ আদর্শ পাইয়া সকলকেই প্রকৃতিব্যঞ্জক অবয়বরহিত কাষ্ঠপুত্তলির মত যে সৃজন করিয়াছেন, ইহাতে তাঁহাকে দোষী না করিয়া ক্ষান্ত থাকা যায় না।...তিনি যে নাটকোচিত প্রকৃতিভেদ উচ্ছেদপূর্বক সকলগুলিকেই কাঠের পুতুল প্রস্তুত করেন, সকলগুলিকেই এক নাক, এক চোক, এক আকার প্রদান করেন, এটী তাঁহার সদৃশ রসজ্ঞ ব্যক্তির নিকটে প্রত্যাশা করা যাইতে পারে না।'[৬৬খ]

এইকালেই 'ক্যালকাটা রিভিউ'-এ 'ভ্রান্তিবিলাস'-এর আর একটি সমালোচনা প্রকাশিত হয়। এতে বিদ্যাসাগরের অনুবাদের প্রশংসা করে বলা হয় : বিদেশি নামের জায়গায় দেশি নাম ব্যবহার করে বিদ্যাসাগর উচিত কাজই করেছেন, এর ফলে এটা পড়তে বসে মনেই হয় না যে কোনো অনুবাদগ্রন্থ পড়ছি। একথা বলাবাহুল্য যে এটির রচনারীতি চমৎকার এবং গল্প বলার ভঙ্গিটিও সুন্দর।

আর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের চমৎকার লাবণ্যময় গদ্যরীতির কথা তো সকলেরই জানা। সেই কারণে এই বইটিকে লঘু সাহিত্যের ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন বলতে আমাদের কোনো দ্বিধা নেই। এতসব প্রশংসাবাণী উচ্চারণ করার পর সমালোচক সবিনয়ে জানালেন : বাংলা সাহিত্যকে তিনি এ পর্যন্ত যা দিয়েছেন, তার থেকে আর একটু বেশি আমরা প্রত্যাশা করি। তিনি তাঁর নিজের নামের প্রতি সুবিচার করতে পারেননি। তাঁর বিরাট প্রতিভা ও বিস্তৃত বিদ্যার উপযোগী কোনো কিছু তিনি এখনও পর্যন্ত রচনা করে উঠতে পারেননি। পাঠ্যপুস্তক রচনা এবং সাধারণ ইংরেজি ও সংস্কৃত প্রবন্ধাবলী অনুবাদের ভার স্বচ্ছন্দে কম প্রতিভাসম্পন্ন মানুষদের হাতে ছেড়ে দেওয়া যেতে পারে। সীতার বনবাস, বেতালপঞ্চবিংশতি এবং বর্তমান বইটি বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান, কিন্তু মনোরম হলেও, এগুলির মূল্য বড় কম। দেশ তাঁর বিদ্যা ও প্রতিভার উপযুক্ত কোনো স্মারক চায়, এবং আমরা আন্তরিকভাবে আশা করি সদ্যপ্রকাশিত এই বইটির মতো মনোরম অথচ অকিঞ্চিৎকর বস্তুর পেছনে নিজের দুর্লভ প্রতিভার অপব্যয় না করে, এমন কোনো কাজে তিনি আত্মনিয়োগ করবেন যা তাঁকে সাহিত্য সংসারে অমরত্ব দেবে। 'It may, however be permitted us to remark that vernacular literature expects more from the learned Pundit than what he has already contributed to its stores. He has hardly yet done justice to himself. He has written nothing worthy of his great talents and vast erudition. The composition of school-books and the translation of ordinary English and Sanskrit treatises might be well left to inferior men. The Banabas of Sita, the Betalpanchabinsati and the present performance, are graceful contributions to Bengali literature, but they are at best but elegant trifles. The country expects some more worthy monument of his learning and genius; and we sincerely trust that the learned Pundit instead of wasting his rare talents on such beautiful bagatelles as the late before us will direct them to the elaboration of a work which posterity will not willingly let die.'[৬৭]

'ক্যালকাটা রিভিউ'-এ এই সমালোচনাটি কে করেছিলেন, নিশ্চিত করে বলা মুশকিল। তবে আমাদের অনুমান, এটি বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা। কারণ, বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে 'ক্যালকাটা রিভিউ'-এর যোগাযোগ ছিল, এই পত্রিকায় বিভিন্ন বাংলা বইয়ের সমালোচনা তিনি করতেন। ১৮৭১-এ 'ক্যালকাটা রিভিউ'-এ প্রকাশিত Bengali Literature প্রবন্ধে বিদ্যাসাগর সম্পর্কে যে বক্তব্য তিনি রাখেন তারই পূর্বাভাস মেলে এই রচনাটিতে। তাছাড়া এইসময় থেকেই শুরু হয় বঙ্কিমচন্দ্রের ধারাবাহিক বিদ্যাসাগর-বিরোধিতা।

'ভ্রান্তিবিলাস'কে কেন্দ্র করে এই ধরনের মতামত প্রকাশিত হবার অল্পদিন আগে বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে মৌলিক রসস্রষ্টা প্রতিভাধর আর এক শিল্পীর আবির্ভাব হয়েছে। বিদ্যাসাগরের 'ভ্রান্তিবিলাস' প্রকাশকালেই তাঁর তিনটি উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছে এবং সেগুলি বাঙালি পাঠকসমাজকে মুগ্ধ করেছে। ফলে এই সময় অনিবার্যভাবেই একটা প্রশ্ন এসে পড়ল—বাংলা গদ্যের শ্রেষ্ঠ লেখক কে—বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী বিদ্যাসাগর না সাহিত্যসংসারে নবাগত বঙ্কিমচন্দ্র? পত্রপত্রিকায় বিদ্যাসাগর ও বঙ্কিমচন্দ্রের লেখার তুলনামূলক আলোচনা শুরু হল। 'এডুকেশন গেজেট'-এ জনৈক পত্রলেখক বিদ্যাসাগরী রীতির সমালোচনা করে ঘোষণা করলেন, 'বঙ্কিমবাবুর লেখায় যত দোষ থাকুক, তথাপি বিদ্যাসাগরের লেখা অপেক্ষা উহা শতগুণে উৎকৃষ্ট।' 'এডুকেশন গেজেটে'র পত্রলেখক যাই বলুন, উনিশ শতকের সত্তরের দশকের গোড়ার দিকে শিক্ষিত বাঙালিসমাজের অধিকাংশ মানুষই বিশ্বাস করতেন, বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ লেখক হচ্ছেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। কেউ কেউ তো বিদ্যাসাগরের নামোচ্চারণ করেই গদগদ হয়ে উঠতেন। মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের কথাই ধরা যাক। ১৮৭০-এ 'জ্ঞানদীপিকা সভা'য় 'বঙ্গভাষার ইতিহাস' বিষয়ে একটি প্রবন্ধ পাঠকালে তিনি বলেন, 'বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নামোচ্চারণ মাত্রেই আমাদিগের অন্তঃকরণ এক অপূর্ব ভাবে আপ্লুত হয়। বস্তুতঃ তাঁহার করপল্লবনিঃসৃত বেতালপঞ্চবিংশতি, বিধবাবিবাহ, সীতার বনবাস, শকুন্তলা, ভ্রান্তিবিলাস, জীবনচরিত, চরিতাবলী, বোধোদয় প্রভৃতি এবং সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব যিনি একবার পাঠ করিয়াছেন, তিনি কখনই তাঁহাকে বিস্মৃত হইতে পারিবেন না।'[৬৮]

সাহিত্যবিচারের ক্ষেত্রে এই ভক্তিবিহ্বলতা ব্যাপারটা বঙ্কিমচন্দ্রের ভালো লাগেনি। বিদ্যাসাগর নিঃসন্দেহে অনেক ভালো কাজ করেছেন, এদেশের হিতকারী ব্যক্তিদের মধ্যে তাঁর স্থান পুরোভাগে। কিন্তু তাই বলে বাংলা ভাষার শ্রেষ্ঠ লেখকের সম্মানও তাঁকে দিতে হবে? বঙ্কিমচন্দ্রের এই ক্ষোভই ভাষা পেল ১৮৭১-এ হরিমোহন মুখোপাধ্যায়ের 'কবিজীবনী'র সমালোচনাসূত্রে 'ক্যালকাটা রিভিউ'-এ প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে। বাংলা সাহিত্যের পর্যালোচনা প্রসঙ্গে বিদ্যাসাগরের সাহিত্যপ্রতিভার মূল্যায়ন করতে গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র বললেন:

জীবিত বাঙালিদের মধ্যে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মতো সম্মানীয় ব্যক্তি বেশি নেই। হিন্দু বিধবাদের জন্য তাঁর প্রয়াস, একজন পণ্ডিত ও অধ্যাপক হিসাবে সাহসের সঙ্গে প্রথম তাঁদের পক্ষ সমর্থন, পরিশ্রমসাধ্য গবেষণা ও নিষ্ঠার সঙ্গে তাঁর প্রয়াসকে টিঁকিয়ে রাখার চেষ্টা, হৃদয়ের ঔদার্য, বাংলা শিক্ষাবিস্তারের জন্য তাঁর পরিশ্রমী ভূমিকা—এই সবকিছু একত্রিত হয়ে তাঁকে এদেশের হিতকরী ব্যক্তিদের পুরোভাগে আসন করে দিয়েছে। তাঁর প্রতি দেশবাসীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার কারণ অনেক, কিন্তু উচ্চাঙ্গের সাহিত্যিক প্রতিভা নিশ্চয়ই তার অন্তর্ভুক্ত নয়। ঈশ্বর গুপ্তের মতো তাঁরও বিরাট সাহিত্যিক খ্যাতি আছে—কিন্তু দু'জনের কারোই এই খ্যাতি

প্রাপ্য নয়, বিশেষ করে বিদ্যাসাগরের তো নয়ই। যদি অন্য ভাষা থেকে সার্থক অনুবাদ বা ভালো শিশুপাঠ্য গ্রন্থরচনা সার্থক সাহিত্যিকের লক্ষণ হয়, তাহলে বিদ্যাসাগরের ব্যাপারটা মেনে নিতে হবে। তবে অনুবাদ বা পাঠ্যপুস্তক রচনাকে আমরা উচ্চাঙ্গের সাহিত্যপ্রতিভার লক্ষণ বলে মনে করি না। আর অনুবাদ ও পাঠ্যপুস্তক রচনা ছাড়া বিদ্যাসাগর করেছেনটা কি? সংস্কৃত সাহিত্য সম্পর্কে তাঁর ক্ষুদ্র নিবন্ধটি বা বিধবাবিবাহ সংক্রান্ত পুস্তিকাগুলি সম্পর্কে আলাদাভাবে উল্লেখের প্রয়োজন নেই। শিশুদের জন্য লিখিত পাঠ্যপুস্তকগুলিকে বাদ দিলে তাঁর অনূদিত বইয়ের সংখ্যা পাঁচটি—হিন্দি থেকে 'বেতালপঞ্চবিংশতি', সংস্কৃত থেকে 'শকুন্তলা', 'সীতার বনবাস' আর 'মহাভারতের উপক্রমণিকা', ইংরেজি থেকে 'ভ্রান্তিবিলাস'। এগুলি সম্পর্কে এটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে চমৎকার এইসব অনুবাদগুলি বাংলায় এ-জাতীয় যে-কোনো অনুবাদের তুলনায় ভালো। অন্য বইগুলির মতো 'সীতার বনবাসে'ও মৌলিকতার পরিমাণ সামান্য। এর প্রথম অধ্যায়টি ভবভূতির মহৎসৃষ্টি 'উত্তররামচরিত' থেকে নেওয়া। পরবর্তী তিনটি অধ্যায় রামায়ণ থেকে—যা ভবভূতিরও প্রেরণার উৎস। বাল্মীকির কাব্যের স্বচ্ছন্দমসৃণ এই গদ্যরূপান্তরটি কিন্তু প্রাণের স্পর্শশূন্য। দৃশ্যগুলির নির্বাচন প্রশংসনীয় এবং অতিপ্রাকৃত ঘটনা বর্জনের ফলে তা অনেকখানিই বস্তুনিষ্ঠ। গদ্যলেখক হিসাবে যে দলের তিনি প্রতিনিধি, তাঁদের মতোই তাঁর ভাষাও শব্দাড়ম্বরপূর্ণ ও পুনরুক্তিবহুল।'[৬৯]

'ক্যালকাটা রিভিউ'-এ প্রকাশিত বাংলা সাহিত্য বিষয়ক এই প্রবন্ধটির গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে অবশ্য সমকালেই প্রশ্ন উঠেছিল। প্রবন্ধটি সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে 'হিন্দু পেট্রিয়ট' লেখে ঃ

'A more imperfect and inaccurate account of Bengali Literature we have not seen···The Reviewer has also dealt authors whom he has condescended to notice in the most unjust and flippant way, barring of course the fortunate few, who stand in his grace.'[৭০]

এই মূল্যায়ন কতখানি অসম্পূর্ণ ও অযৌক্তিক তা বোঝাবার জন্য বিদ্যাসাগর সম্পর্কে তাঁর মন্তব্যকে তুলে ধরেন সমালোচক।

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধটি নিয়ে যখন পত্রপত্রিকায় লেখালিখি চলছে, তখনই বিদ্যাসাগর নতুন করে বহুবিবাহ বিরোধী আন্দোলনে জড়িয়ে পড়লেন। এই প্রথার বিরুদ্ধে একাধিক বইও লিখলেন তিনি। এইসব বাদ-প্রতিবাদকে কেন্দ্র করে সমাজ যখন সরগরম, এইরকম এক সময় ১৮৭২-এর এপ্রিল মাসে বঙ্কিমচন্দ্রের সম্পাদনায় প্রকাশিত হল 'বঙ্গদর্শন'। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'বঙ্কিমের বঙ্গদর্শন আসিয়া বাঙালির হৃদয় একেবারে লুট করিয়া লইল।' ১২৮০-র বৈশাখ মাসে 'বঙ্গদর্শন' দ্বিতীয় বৎসরে পড়লে কেশবচন্দ্র সেন 'সুলভ সমাচারে' লিখলেন, 'ইহার গুণেই সকলে মোহিত আছেন। ইহা যে কেবল দেশীয় ভাষার স্রোতকে ফিরাইয়া দিবে তাহা নহে, কিন্তু

কৃতবিদ্য সভ্যমণ্ডলীর নীতির আদর্শকেও দিন দিন উন্নত করিয়া তুলিবে।'[৭১] 'বঙ্গদর্শনে'র দ্বিতীয় বর্ষের প্রথম সংখ্যাতেই 'তুলনায় সমালোচন' নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হল। লেখাটিতে ভারতচন্দ্র রায় ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে খোলাখুলি আক্রমণ করা হয়। ভারতচন্দ্রের বিরুদ্ধে অভিযোগ তিনি অশ্লীল লেখক আর বিদ্যাসাগর ? প্রবন্ধকারের ভাষাতেই শোনা যাক—

'বিদ্যাসাগর মহাশয় টাকশাল ও তাঁহার গ্রন্থগুলি দু আনি, সিকি, আধুলি ও টাকা ব্যতীত আর কিছুই নহে। সাগরী টাকশালে রূপা ব্যতীত সোনার সম্পর্ক নাই, টঙ্কযন্ত্রাধ্যক্ষ বিদ্যাসাগর অন্যস্থানে রূপা ক্রয় করিয়া নিজে খাদ মিশাইয়া ব্যবসা করিতেছেন। খণ্ড রূপা যেমন একটু পরিষ্কার করিয়া, চারিদিকে গোলাকার করিয়া কিরণ দিয়া, উপরে Queen Victoria ছাপিয়া দিলেই মুদ্রা হয়, সেইরূপ অন্যের রূপা একটু বাঙ্গালা রসান চড়াইয়া চতুষ্কোণ করিয়া চারিদিক ছাঁটিয়া উপরে 'শ্রী ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রণীত' ছাপিয়া দিলেই সাগরিক গ্রন্থ হয়। বর্ণপরিচয় দু আনি, ক্ষুদ্র বালকের জন্য প্রয়োজনীয়, শীঘ্র নষ্ট হয় বা হারাইয়া যায়। এইরূপ তাঁহার কোন গ্রন্থ সিকি, কোন গ্রন্থ আধুলি ও কোন গ্রন্থ টাকা। তিনি প্রথম এক খোট্টা মহাজনের নিকট রূপা লইয়া মুদ্রাযন্ত্র বসান, সেই খোট্টার রূপায় টাকা প্রস্তুত করান; সে টাকার নাম 'বেতালপঁচিশ'; সেবার চেম্বরস বলে একজন বিলাতি মহাজনের নিকট রূপা লইয়া 'জীবনচরিত' নাম দিয়া, একটু কম খাদ মিশাইয়া ক হাজার আধুলি প্রস্তুত করাইয়া অনেক লাভ করিলেন। একজন বৃদ্ধ পশ্চিমে পণ্ডিত অধিক পরিমাণে বেশ খাঁটি রূপা রাখিয়া যান; তাহাই লইয়া আসিয়া আপনার নিজের খাদ কতকগুলা দিয়া তাহাই 'সীতার বনবাস' নামে টাকা করিয়া বিক্রয় করিলেন। এখনও ব্যবসা ছাড়েন নাই, আজি চারি বৎসর হইল সেক্ষপিয়রের 'ধোঁকার মজা' বলিয়া খানিক রূপা ছিল তাহাতেই আপনার সেই মোহর দিয়া 'ভ্রান্তিবিলাস' নাম দিয়া বিক্রয় করিলেন। এইরূপে উপদেষ্টা প্রমাণ করিলেন যে বিদ্যাসাগর টঙ্কযন্ত্রমাত্র।'[৭২]

'বঙ্গদর্শনে' এই লেখাটি প্রকাশিত হওয়ামাত্র বিদ্যাসাগর-অনুরাগীর দল কার্যত ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত লেখাটি বঙ্কিমচন্দ্রের বলে ধরে নিয়ে বঙ্কিমচন্দ্রকে সরাসরি আক্রমণ করলেন তাঁরা। মনোমোহন বসু সম্পাদিত 'মধ্যস্থ' পত্রিকায় ১১ জ্যৈষ্ঠ, ১২৮০-তে একজন লিখলেন :

'বঙ্গদর্শন অনেকের প্রিয়দর্শন; সম্প্রতি তাঁর কলমের কাদাঁনি দেখে আদার ব্যাপারী হয়ে জাহাজের খবর লওয়াতে বাংলা বাজারে অনেকেরি অপ্রিয়দর্শন হয়ে উঠেছেন। আজকাল এঁর এতদূর দৌড়, যে মহাকবি ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের কবিতায় দোষারোপ করেছেন! এবং বর্তমান বঙ্গভাষার বিধাতাপুরুষ, যাঁর শ্রীচরণ প্রসাদে অনেকেই কলম ধর্তে শিখেছেন, সেই শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়কে মেকি লেখক বলিয়া অবলীলাক্রমে ঠাট্টা কর্তে কোমর বেঁধেছেন।'[৭৩]

বিদ্যাসাগরের প্রতি 'বঙ্গদর্শনে'র মনোভাবকে কটাক্ষ করে লেখা প্যারীমোহন কবিরত্নের একটি গানও এইসঙ্গে প্রকাশিত হয়। গানটি এইরকম—

'রাগিণী—একা বাহাদুর।
তাল—গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল।

'বঙ্গদর্শনের দর্শনবিদ্যা চমৎকার ;
এ দোষ দর্শনে রোষ হয় না কার ?
অন্ধ যে জন, নাইকো লোচন,
সমালোচন কেন তার ? ১
পদে পদে দেখতে পাই,
কর্ম কর্তা বোধ নাই,
ভাব রসের মা গোঁসাই
কেন লেখার ছল ধরে ?
রাধাকৃষ্ণ বলতে শিখে
দুটো একটা গল্প লিখে,
ধরাটাকে সরাসম জ্ঞান করে—
শুনে হাসি পায় বাঁচিনে লজ্জায়,
কালে কানু পণ্ডিত হবে
এ কারখানা সেই প্রকার। ২
এ আস্পর্ধা কব কারে
গোষ্পদ বলে না যারে,
ডাগর সাগরে খোঁচা
দিতে ভয় হল না তার।
হতেন যদি কূপ কি ডোবা
তা হলেও তো পেতো শোভা,
নদনদী মধ্যে খুঁজে পাওয়া ভার।
মরি আপশোষে, কোন সাহসে
কি জিনিষ বেরুলো দেশে,
কিসের এত অহঙ্কার ?'

এত কথা বলার পর প্যারীমোহনের সিদ্ধান্ত 'সাগর—বই লিখতে কে জানে ?' এর পরের সংখ্যা 'মধ্যস্থ'তে 'সমালোচনের সমালোচন' নামে আর একটি লেখা প্রকাশিত হয়। এতে 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত লেখাটিকে বিদ্রূপ করে বলা হয় ঃ

'ভারতচন্দ্রের চেয়ে বিদ্যাসাগরের লেখা অবশ্যই ভাল হতে পারে, কারণ ইনি তো ইংরাজী জানেন। তবু বঙ্গদর্শন বিদ্যাসাগরকে কেন ছোট করছেন, তা বুঝতে পাল্লেম না। কারণ স্পষ্ট বলতে কি, আপনাদের সকলের চেয়ে যাঁরা বঙ্গদর্শনে লেখেন তাঁরা ইংরাজী বেশি জানেন। বিদ্যাসাগরকে তাঁরা ছোট বলছেন, অবশ্যই তার কোন বিশেষ কারণ থাকবে।'[৭৪]

ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের পথ না নিয়ে এইকালের আর একটি উল্লেখযোগ্য পত্রিকা বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে বিদ্যাসাগরের অবদান ও সেই সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রদের দৃষ্টিভঙ্গির আলোচনা করতে গিয়ে লিখল ঃ

'পণ্ডিতবর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয়দিগের সময়ের পূর্বপর্যন্ত বাংলা সাহিত্যের দুগ্ধ পোষ্যাবস্থা। তাহার পর এই দুই মহাত্মা বাঙ্গালা-সাহিত্য গঠন বিষয়ে প্রচুর পরিমাণে সাহায্য করিয়াছেন। বাবু বঙ্কিমচন্দ্রের মতাবলম্বী লোকেরা যাহাই বলুন না কেন, আমরা বাঙ্গালা সাহিত্যের সে ইতিহাসকে কখনই সম্পূর্ণ ও অপক্ষপাতী বলিতে পারি না, যাহা বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়বাবুর কার্যের গুরুত্ব অস্বীকার করে। বঙ্কিমবাবুর দল বলেন, 'বিদ্যাসাগর প্রভৃতির সৃষ্টি করিবার ক্ষমতা নাই।' তাঁহারা পরান্নভোজী প্রভু হইয়া অনেক উপহাস ও বিদ্রূপ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, কিন্তু আমাদের বিবেচনায় তাঁহারা অতিরিক্ত সীমায় যাইতেছেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের যে উদ্ভাবনী শক্তি আছে তাহা তাঁহার বিধবাবিবাহ ও বহুবিবাহ গ্রন্থে প্রচারিত। পূর্বকালের লোকদিগের অনুসরণ করিয়াছেন, এই অপরাধে তাঁহাকে লক্ষ্যের মধ্যে না আনা অতিশয় ন্যায়বিগর্হিত কার্য্য। তবে তাঁহার ভাষা স্থানেস্থানে অস্বাভাবিক এবং তাহার মধ্যে নিরর্থক সংস্কৃত শব্দের ব্যবহার অনেক, তাহাও আমরা স্বীকার করি। কিন্তু তিনি যে বাঙ্গালাভাষার জন্মদাতা তাহা কে অস্বীকার করিবে?'[৭৫]

বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার যে দেশের লোকের রুচি ফিরিয়েছেন এবং নীতির আদর্শ উন্নত করেছেন তাও বলতে লেখক দ্বিধা করেননি। তবে ভাষাশিল্পী হিসাবে বঙ্কিমচন্দ্র যে বিদ্যাসাগরের চেয়ে উঁচুদরের, তা স্বীকার করতে তিনি কুণ্ঠাবোধ করেন নি। তাঁর মতে 'বঙ্কিমবাবুর ভাষার অনেক দোষ আছে, কিন্তু তাহার বিশেষ গুণ এই যে, তাহা জীবন্ত, সতেজ এবং যথাযথ ভাবব্যঞ্জক। বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রভৃতির ভাষাতে তাহার অভাব।' 'ভারত সংস্কারকে'র মতো নিরপেক্ষভাবে বিদ্যাসাগরের লেখার দোষগুণ বিচার না করে 'জ্ঞানাঙ্কুর'-বিদ্যাসাগরের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে বলে, 'বিদ্যাসাগর মহাশয়কে বাঙ্গালাভাষার পিতা বলিতে হইবে, তিনিই বাঙ্গালাকে বাঙ্গালা করিয়াছেন। তাঁহার পুস্তক পড়িয়া বাঙ্গালীতে বাঙ্গালা শিখে। তিনি অনুবাদক বলিয়াই বিশেষ খ্যাত। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ন্যায় মূল গ্রন্থের ভাব রাখিয়া অনুবাদক্ষম ব্যক্তি বোধহয় আর বাঙ্গালীর মধ্যে কেহ নাই। বাঙ্গালা শকুন্তলা পাঠ করিলে কালিদাসের শকুন্তলার ঔৎকর্ষ অনেক অনুভূত হয়।'[৭৬] শুধু বিদ্যাসাগরের প্রশংসাই যথেষ্ট মনে না করে, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় 'জ্ঞানাঙ্কুরে'র পৃষ্ঠায় বিদ্যাসাগরের প্রতিপক্ষদের আক্রমণ করলেন। ১২৮০-র বৈশাখ সংখ্যা 'জ্ঞানাঙ্কুরে' প্রকাশিত 'বিদ্যাবিড়ম্বনা' নামক একটি প্রবন্ধে তিনি বললেন, 'পরের দোষগুণ বিচার করিতে হইলেই ভ্রমে পতিত হইতে হয়। এই কারণেই অনেক প্রধান ব্যক্তির মুখ হইতে ব্যক্তিবিশেষের অথবা পুস্তকবিশেষের অন্যায়

নিন্দা অথবা অন্যায় প্রশংসা শ্রুত হওয়া যায়। বিদ্যাসাগর মহাশয় বিদ্যাবলে আমাদের দেশের পুজ্য, অথচ ঈশ্বর গুপ্ত লিখিয়াছিলেন 'সাগর ডাগর বটে কিন্তু রত্নহীন।' 'বঙ্গদর্শন' তাহার রসগ্রাহিতার অস্তিত্বেই সন্দেহ করেন।' কিছুদিন পরে 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত 'তুলনায় সমালোচন' প্রবন্ধটিকে চন্দ্রশেখর 'জ্ঞানাঙ্কুরে' আক্রমণ করলেন। করার সময় কমলাকান্তি ঢং-এ সমালোচকদের কুকুরের সঙ্গে তুলনা করে তিনি বললেন ঃ

'আমাদের দেশে যাহারা সমালোচক বলিয়া খ্যাত, তাহাদের অনেকের সঙ্গে আমি কুকুরের সাদৃশ্য দেখি। ইহারা সাহিত্যের দ্বারে প্রহরী—কাহাকেও প্রবেশ করিতে দেখিলেই অমনি ঘেউ ঘেউ করিয়া কামড়াইতে আসে। ভদ্রাভদ্র চিনিতে পারে না।··· ভারতচন্দ্রের মধুর কবিত্ব রসাস্বাদনে তুমি পুলকিত হইলে, কুকুর তাঁহার অশ্লীলতা লইয়া আমোদ করিল।···পাঠকবর্গ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অসাধারণ বিদ্যা ও আশ্চর্য্য রচনাশক্তি দেখিয়া পুলকিত হয়েন; সমালোচক আত্মগরিমারূপ নেশার ঝোঁকে কেবল 'টাকশাল আর সিকি দুয়ানি আধুলি' দেখেন।'[৭৭]

চন্দ্রশেখরের লেখাটি প্রকাশের বছরখানেক পরে 'মধ্যস্থ' পত্রিকায় 'জনৈক উচিতবক্তা' আবার নতুন করে 'তুলনায় সমালোচন' প্রবন্ধটিকে এবং সেই সূত্রে এর লেখক বলে বঙ্কিমচন্দ্রকে ধরে নিয়ে লেখেন ঃ

বর্তমান লেখকদের কথা ভাবলে হাসতেও হয়, কাঁদতেও হয়। 'কাব্য লিখুন, নাটক লিখুন, নবন্যাস লিখুন, যিনি যাহাই লিখুন না কেন, ব্রিটিস ভাণ্ডার হইতে রত্ন অপহরণ না করিলে কাহারও এক কলম লিখিবার সাধ্য নাই।···তাঁহারা যাঁর ধনে মানুষ, তাহাকেই অবজ্ঞা প্রকাশ করিয়া থাকেন। তাঁহাদের ইচ্ছা আপনাদের পেট ভরিলেই হইল; তোমারই খাইব আর তোমারই ঘাড় ভাঙ্গিব। বিদ্যাসাগর মহাশয় হইতেই বাঙ্গালা ভাষার সৃষ্টি, তাঁহারই প্রথম ভাগ পড়িয়া বঙ্কিমবাবু মানুষ, এখন কিনা তিনি সেই বিদ্যাসাগরেরই ঘাড় ভাঙিতে চান। একি কম আস্পর্ধা ও অহঙ্কারের কথা। শুনিলে রক্ত গরম হইয়া উঠে। অজ্ঞান বঙ্কিমবাবুর ইহা বিবেচনা করা উচিত ছিল যে, চামচিকা কখন পক্ষীরাজ গরুড়ের সমযোগ্য নহে, হিমাদ্রি কখন সামান্য মলয় হিল্লোলে বিচলিত হয়েন না, খদ্যোতিকার ক্ষীণালোকে পূর্ণশশী মলিন হয়েন না। কিন্তু হায়! অহঙ্কারে উন্মত্ত হইয়া বঙ্কিমবাবু জ্ঞানশূন্য! এক্ষণে তাঁর বিচারশক্তি কোথায়? নহিলে তিনি 'ঢাকের কাছে ট্যামাটেমির বাদ্য' আরম্ভ করিলেন কেন? নিতান্ত বাতুলের কার্য্য।'[৭৮]

বঙ্কিমচন্দ্রকে 'উচিতবক্তা' এতখানি খোলাখুলি আক্রমণ করায় 'মধ্যস্থ' সম্পাদক একটু ক্ষুণ্ন হয়েছিলেন। 'উচিতবক্তা'র লেখাটির শেষে 'মধ্যস্থ' সম্পাদক তাই সবিনয়ে একটি প্রশ্ন রাখলেন, 'বিদ্যাসাগর বিষয়ক বঙ্গদর্শনের লিপি যে বঙ্কিমবাবুর লেখা, ইহা উচিত বক্তা কিরূপে জানিলেন?'

প্রশ্নটি খুবই সঙ্গত। কারণ 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত লেখাটিতে লেখক হিসাবে

'শ্রীঅঃ'-এই নামটি ছিল। এই 'শ্রীঅঃ' অক্ষয়চন্দ্র সরকার। এই সময়ে অক্ষয়চন্দ্র সাহিত্যসমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত না হওয়ায়, সকলেই লেখাটিকে বঙ্কিমচন্দ্রের বলে ধরে নেন এবং নির্বিচারে তাঁকেই আক্রমণ করতে থাকেন। 'তুলনায় সমালোচন' বঙ্কিমচন্দ্রের কলম দিয়ে না বেরোলেও, এ ধরনের একটি প্রবন্ধ লিখতে সম্ভবত অক্ষয়চন্দ্রকে তিনি উৎসাহিত করেছিলেন।

'উচিতবক্তা'র এই লেখাটি সমকালে কিছু বিতর্কের সৃষ্টি করে। পরের সংখ্যা 'মধ্যস্থে' 'জনৈক কেঁড়েল শিষ্য' 'উচিতবক্তা'র পত্রের উত্তর দিতে গিয়ে বর্তমান লেখকদের সবাই 'ব্রিটিশ ভাণ্ডার থেকে রত্ন' অপহরণকারী একথা মানতে রাজি হলেন না। বিদ্যাসাগর হতেই বাংলাভাষার সৃষ্টি—'উচিতবক্তা'র এই মন্তব্যের প্রতিবাদ জানিয়ে তিনি লিখলেন, 'বিদ্যাসাগর মহাশয় হইতেই বাঙ্গালাভাষার সৃষ্টি। একথাটাও বলা যুক্তিসঙ্গত হয় নাই। বিদ্যাসাগর মহাশয় হইতে বাঙ্গালা ভাষার অঙ্গসৌষ্ঠব ও শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে, ইহা আপামর সকলেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবে, কিন্তু উচিতবক্তার ন্যায় 'সৃষ্টি' বলিতে কেহই অগ্রসর হইবে না।' বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে উচিতবক্তার মন্তব্যের প্রতিবাদ করে তিনি লিখলেন, 'তিনি আর এক স্থলে লিখিয়াছেন 'তাঁহার প্রথমভাগ পড়িয়া বঙ্কিমবাবু মানুষ, এখন কিনা তিনি সেই বিদ্যাসাগরের ঘাড় ভাঙ্গিতে চান।' ইত্যাদি। এক্ষণে আমার জিজ্ঞাস্য এই, বঙ্কিমবাবু কেবল একাকী বঙ্গদর্শনে লিখেন না—অনেক লেখকেরই প্রস্তাব উহাতে প্রকাশিত হয়। অতএব উচিত বক্তা কিরূপে নিশ্চয় জানিলেন যে, বিদ্যাসাগর বিষয়ক প্রস্তাব বঙ্কিমবাবুই লিখিয়াছেন। সুতরাং সহসা একজন ভদ্রলোকের নিন্দা করা উচিতবক্তার উচিত হয় নাই।'[৭৯]

এই লেখাটি প্রকাশিত হবার বেশ কিছুদিন পর কেঁড়েল শিষ্যের পত্রের উত্তর দিলেন 'উচিতবক্তা'। কেঁড়েল শিষ্য তাঁর লেখা সম্পর্কে তিনটি আপত্তি তুলেছিলেন, এর দুটির তিনি উত্তর দিলেন, তৃতীয়টি সম্পর্কে উচ্চবাচ্য করলেন না। উচিতবক্তার লেখা সম্পর্কে কেঁড়েল শিষ্যের তৃতীয় আপত্তিটি ছিল, বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত বিদ্যাসাগর বিষয়ক প্রস্তাবটির লেখক বঙ্কিমচন্দ্র তা তিনি কিভাবে জানলেন? ভালোভাবে না জেনে কোনো ভদ্রলোকের নিন্দা করা ঠিক নয়। উচিতবক্তা বিদ্যাসাগরকে বাংলা ভাষার স্রষ্টা বলায় কেঁড়েল শিষ্য আপত্তি জানিয়েছিলেন। এই আপত্তিকে গ্রাহ্য না করে 'উচিতবক্তা' আবার জোরালো ভাষায় বিদ্যাসাগরকে বাংলা ভাষার স্রষ্টার মর্যাদা দিয়ে বললেন ঃ

'বিদ্যাসাগর হইতে বাঙ্গালা ভাষার সৃষ্টি পূর্বেও বলিয়াছি—এখনও বলিব। ভাষা কাহার সৃষ্টি কে বলিতে পারে? তবে আদৌ যাহাকে বিশুদ্ধ বাঙ্গালা বলি, তাহার সৃষ্টিকর্তা যে বিদ্যাসাগর মহাশয় তৎপক্ষে বিন্দুমাত্র সংশয় নাই। বিদ্যাসাগর মহাশয় একজন প্রধান লেখক বলিয়া আমি তাঁহাকে মান্য করি না—তাঁহার অসাধারণ বিদ্যাবুদ্ধি, বিবেচনা, বিচারশক্তি ও দেশহিতৈষিতার জন্য এত মান্য করিয়া থাকি।'

উচিতবক্তার এই পত্রোত্তর সম্পর্কে একটি জিনিস লক্ষণীয়। তাঁর উত্তরটি প্রকাশিত হয়েছিল 'মধ্যস্থে' নয়, 'সাধারণী'তে। আর এই 'সাধারণী'র সম্পাদক ছিলেন 'তুলনায় সমালোচন'-এর লেখক অক্ষয়চন্দ্র সরকার! 'মধ্যস্থ' সম্পাদক কি উচিতবক্তার উত্তরটি ছাপতে অস্বীকার করেন? এবং সেই অস্বীকার কি বঙ্কিমচন্দ্রকে অকারণে আক্রমণ করার জন্য? অক্ষয়চন্দ্র সরকার কেন যে এই লেখাটিকে তাঁর পত্রিকায় স্থান দিয়েছিলেন বলা কঠিন। লেখক বিদ্যাসাগর সম্পর্কে অক্ষয়চন্দ্রের দৃষ্টিভঙ্গি কি পরিবর্তিত হয়েছিল?

'বঙ্গদর্শনে' বিদ্যাসাগর সম্পর্কে মন্তব্য নিয়ে এত উত্তাপের সৃষ্টি হলেও, বঙ্কিমচন্দ্র কিন্তু বিদ্যাসাগর সম্পর্কে তাঁর ধারণা থেকে একটুও সরে আসেননি। বিদ্যাসাগর যে মূলত একজন অনুবাদক তা ১২৮১-র শ্রাবণ মাসের 'বঙ্গদর্শনে' যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণের 'আর্যদর্শন' পত্রিকার সমালোচনা সূত্রে বঙ্কিমচন্দ্র আবার ঘোষণা করলেন। তাঁর মতে 'বর্তমান বাঙ্গালাসাহিত্যে অনুবাদ ও অনুকরণ উভয়ই লক্ষিত হইতেছে। বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রভৃতি পণ্ডিতেরা অনুবাদ করেন, মধুসূদন দত্ত, দীনবন্ধু মিত্র প্রভৃতি সুকবিরা অনুকরণ করেন।' একথা লেখার কয়েকদিনের মধ্যে 'বঙ্গদর্শনে'র বক্তব্যকে আক্রমণ করলেন ফরাসডাঙ্গার 'শ্রীহঃ' নামক জনৈক বিদ্যাসাগর-ভক্ত! 'এডুকেশন গেজেটে' বিদ্যাসাগরের প্রশস্তিপূর্ণ এক চিঠিতে তিনি লিখলেন:

'বঙ্গদর্শন সময় পাইলেই বিদ্যাসাগর মহাশয়কে দুই এক ঠোশ মারেন, শ্রাবণ মাসের বঙ্গদর্শন তাহাই করিয়াছেন। যিনি যাহা বলুন, বিদ্যাসাগর মহাশয় যে কেবল অনুবাদক একথা আমরা কখনই স্বীকার করিতে পারি না, তাঁহার রচিত প্রত্যেক পুস্তকেই স্ববুদ্ধিমূলক সারগর্ভ অভিনব অনেক বিষয়ের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অনুবাদ প্রকৃত অনুবাদ নহে, দেশকালপাত্র ভেদে যে সমস্ত পরিবর্তন আবশ্যক সে সমুদয়ই তাহাতে বিদ্যমান; এমনকি যিনি মূল না পড়িয়াছেন তিনি কখনই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের রচনাকে অনুবাদ বলিতে পারেন না, ইহা সামান্য ক্ষমতার পরিচয় নহে। কিন্তু এই বলিয়াই যে বিদ্যাসাগর মহাশয় অনুবাদক নহেন, তাহা বলিতেছি না, তিনি অনুবাদক আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি। কিন্তু তাঁহার রচনার মধ্যে এমন অনেক স্ববুদ্ধিমূলক ভাব দেখা যায়, যাহাতে তাঁহাকে একজন স্বাধীন লেখক বলিতে কাহারো সঙ্কোচ হইতে পারে না। বিধবাবিবাহ ও বহুবিবাহ প্রচলিত ও রহিত করিবার নিমিত্ত তিনি যে কয়েকখানি পুস্তক রচনা করিয়াছেন, তাহা তাঁহার ভাবব্যূহের স্বাধীনতার সম্যক পরিচয় প্রদান করিতেছে। ইহা দেখিয়াও বঙ্গদর্শন বঙ্গভূমে অবতীর্ণ হইয়া অবধিই সময় পাইলেই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিপক্ষে দুই এক কথা কহিয়া লয়েন। ইহা দ্বারা সহজেই উপলব্ধি হয় যে, উচ্চমুণ্ডকে হেঁট-মুণ্ড করিয়া নিজমুণ্ডকে উন্নত করিতে বঙ্গদর্শন অতিশয় ব্যস্ত। কিন্তু হিত করিতে বিপরীত ঘটিতেছে, ইহা বঙ্গদর্শনের স্বপ্নের অগোচর। যাঁহার নিঃস্বার্থ দেশ-হিতৈষিতা বঙ্গদেশকে চিরঋণে বন্ধ রাখিয়াছে, যাঁহাকে বঙ্গভাষার জন্মদাতা ও পরিপোষ্টা বলিলে অত্যুক্তি হয় না, সেই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিপক্ষে কোন কথা

কহিলে, পাঠকদিগের বঙ্গদর্শনের প্রতি হতাদরতা জন্মিবে। ইহা সম্পাদক মহাশয় কি একবারও ভাবেন না? বিদ্যাসাগর মহাশয় যদি অন্য কোন পুস্তক রচনা না করিতেন, কেবল দুইভাগ বর্ণপরিচয়ই তাঁহাকে বঙ্গসমাজের পূজ্য ও ভক্তির আধার করিত। যিনি উত্তররামচরিত ও শকুন্তলার প্রত্যেক দুর্বোধ ও ভাবপূর্ণ স্থলেই প্রাঞ্জল ও বিশদ টিপ্পনী প্রদান করিয়াছেন, সেই বিদ্যাসাগর মহাশয় বঙ্গদর্শন সম্পাদকের নিকট রসবোধশূন্য, ইহা শুনিয়া হাস্য সম্বরণ করা দুষ্কর। যাহা হউক, যাঁহার নিকট বঙ্গদেশের প্রত্যেকেই কোন না কোন বিষয়ে কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ সেই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিপক্ষে কোন কথা শুনিলে আমাদের বড় কষ্ট হয়।...আমরা জিজ্ঞাসা করি সম্পাদক মহাশয় কি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট কোন বিষয়ে ঋণী নহেন? বঙ্গদেশ যাঁহার নিকট বাধ্য, সম্পাদক মহাশয় বোধহয় তাঁহার নিকট কোন বিষয়ে বাধ্য বিবেচনা করেন না। তাহা না হইলে প্রয়োজনাভাবেও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিপক্ষে লেখনী সঞ্চালন করিবেন কেন? সে কথা দূরে থাকুক, নীতিশাস্ত্রে কহে 'ন ব্রূয়াৎ সত্যমপ্রিয়ং' নিদান ইহার অনুরোধেও সম্পাদক মহাশয়ের ক্ষান্ত থাকা কর্তব্য ছিল।'[৮০]

চিঠিটিতে অনেক কথা থাকলেও, বিদ্যাসাগর যে একজন অনুবাদক এই সত্যটি পত্রলেখক অস্বীকার করতে পারেননি। আর পারেননি বলেই শেষপর্যন্ত তাঁকে নীতিশাস্ত্রের দ্বারস্থ হতে হয়েছে। তবে শুধু বঙ্কিমচন্দ্র কেন, বিদ্যাসাগর যে মূলত একজন অনুবাদক ও পাঠ্যপুস্তক রচয়িতা একথা বলার মতো লোকের অভাব সেযুগে ছিল না। ১২৮১-র জ্যৈষ্ঠ মাসের 'তমোলুক পত্রিকা'য় বাংলা সাহিত্য পর্যালোচনা প্রসঙ্গে মন্তব্য করা হয় 'আমরা উৎকৃষ্ট বঙ্গভাষা রচিত সাহিত্যাদির বিষয় চিন্তা করিলে কেবল বাবু অক্ষয়কুমার ও পণ্ডিতবর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরে আসিয়া আমাদিগের সেই চিন্ত্যমান বিষয় শেষ করিয়া দেন। ইহাঁরা উভয়ে বঙ্গসাহিত্য সমাজের যতদূর পুষ্টিলাভ প্রদর্শন করিয়াছেন, এরূপ কয়জন করিয়াছেন বা করিতেছেন? যদিও ইহাদিগের গ্রন্থ অনুবাদমাত্র, তথাপি সেই অনুবাদিত গ্রন্থাবলী দ্বারা বিদ্যালয়সমূহের কত মহোপকার সাধিত হইয়াছে।'[৮১]

সাহিত্যস্রষ্টা বিদ্যাসাগর সম্পর্কে 'তমোলুক পত্রিকা'র অনুরূপ বক্তব্যই আমরা শুনলাম রমেশচন্দ্র দত্তের কাছে। তাঁর মতে বিদ্যাসাগরের 'সীতার বনবাস', 'বেতাল পঞ্চবিংশতি,' 'কথামালা', 'বোধোদয়,' 'চরিতাবলী', 'বাংলার ইতিহাস' এ-সবই স্বাধীন অনুবাদ অথবা ইংরেজি ও সংস্কৃত গ্রন্থ থেকে সংকলন হলেও স্কুলপাঠ্য গ্রন্থ হিসাবে উল্লেখযোগ্য। যে বাংলা গদ্যের তিনি প্রচুর পুষ্টিসাধন ও সৌন্দর্যবর্ধন করেছেন, এগুলি তার সেরা নিদর্শন। রামমোহন রায়ের পর অক্ষয়কুমার দত্ত এবং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর হলেন এমন দুই মহান লেখক যাঁরা বাংলা গদ্যকে গড়ে তুলেছেন। কিন্তু 'Neither of these two writer has written anything original or given any evidence of creative intellect or great power of mind. All that they have written are compilations and translations from English

and Sanskrit, but yet Bengal will not soon forget those who have enriched the Bengali prose, striven for social reforms, and done more than any other writers for the spread of knowledge all over the country.'[৮২]

প্রসঙ্গত স্মরণীয়, বিদ্যাসাগরের মৃত্যুর পর রমেশচন্দ্র যে প্রবন্ধটি লেখেন (ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, নব্যভারত, ভাদ্র, ১২৯৮) তাতেও বিদ্যাসাগরকে 'নির্মল সুমার্জিত বাংলা গদ্যের' স্রষ্টার মর্যাদা দেবার পাশাপাশি তাঁর লেখাগুলি যে 'সংস্কৃত ভাষার অমূল্যভাণ্ডার' হতে গৃহীত, তার উল্লেখ করতে ভোলেননি।

তবে অনুবাদক হিসাবে তাঁর দক্ষতা সম্পর্কে বিশেষ কোনো প্রশ্ন সেযুগে ওঠেনি। অনুবাদ করার সময় খুঁটিনাটি প্রতিটি বিষয়ের দিকে তাঁর সজাগ দৃষ্টি থাকত। যে কারণে একবার এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি তাঁকে আয়ুর্বেদ অনুবাদ করতে অনুরোধ জানালে তিনি তাঁকে বলেন, 'আমায় এ পর্যন্ত কেহ জুয়াচোর বলিবার অবসর পায় নাই, কিন্তু তোমার এই প্রস্তাবে হস্তক্ষেপ করিলে, আমার সে উপাধিটি সহজেই লাভ হইবে!' সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিটি বিস্মিত হইয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বলেন, আয়ুর্বেদে যে সকল গাছগাছড়ার নাম আছে, ভারতবর্ষের, একান্তপক্ষে বাঙ্গালার বিভিন্ন প্রদেশে সেগুলির যে স্থানীয় নাম আছে, সেগুলি দিতে না পারিলে, আয়ুর্বেদ অনুবাদ করাই বৃথা। অনুবাদে কোনও ভেষজের সংস্কৃত নামটি অবিকল রাখিয়া গেলে, একপ্রকার জুয়াচুরি করা হয় বৈকি।'[৮৩] বিদ্যাসাগরের মতো সতর্ক অনুবাদকের মুখেই এমন কথা শোভা পায়।

বিদ্যাসাগরের মধ্যে মৌলিক সৃষ্টিক্ষমতার অভাবের যে অভিযোগ বঙ্কিমচন্দ্র, রমেশচন্দ্রের মুখে আমরা শুনলাম, অনেকটা যেন তারই জবাব দিতে এগিয়ে এলেন বিদ্যাসাগরের প্রিয় ছাত্র রামগতি ন্যায়রত্ন। অতি ঘনিষ্ঠ এই ছাত্রটির পুস্তকের প্রকাশক ছিলেন বিদ্যাসাগর। ছাত্রের বই চালু করার জন্য লিখিতভাবে তদবির করতেও বিদ্যাসাগর কুণ্ঠিত হননি। এই রামগতি যখন বাংলা সাহিত্যের রীতিমতো এক ইতিহাস রচনা করলেন, তখন বিদ্যাসাগরের কথা বলতে গিয়ে তিনি বললেন:

সরল, মধুর ও ওজস্বিনী সবরকম রচনাতেই বিদ্যাসাগর সিদ্ধহস্ত। যেসব বই তিনি লিখেছেন 'তাহার অধিকাংশই কোন না কোন পুস্তকের অনুবাদ, মূলগ্রন্থ তাহাদের মধ্যে অল্পই আছে, একথা অযথার্থ নহে। কিন্তু এস্থলে ইহাও বিবেচনা করিতে হইবে যে, বিদ্যাসাগরের রচনাপ্রণালীর প্রাদুর্ভাবের সময়ই বাঙ্গালা ভাষার পক্ষে অন্ধকারাবস্থা হইতে আলোকে প্রবিষ্ট হইবার প্রায় প্রথম উদ্যমকাল; ঐরূপকালে সকল ভাষাতেই মূলগ্রন্থ অপেক্ষা অনুবাদগ্রন্থই অধিক হইয়া থাকে, ইহা এক সাধারণ নিয়ম। বিদ্যাসাগর সে নিয়মের অনধীন হইতে পারেন নাই—সুতরাং তাঁহাকে মূলগ্রন্থ অপেক্ষা অনুবাদগ্রন্থই অধিক করিতে হইয়াছে। কিন্তু যিনি উপক্রমণিকা, কৌমুদী, বিধবা-বিবাহ সংক্রান্ত ১ম ও ২য় পুস্তক, সংস্কৃতভাষা ও সংস্কৃতসাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব, সীতার

বনবাস ও বহুবিবাহবিচার রচনা করিয়াছেন, তাঁহাকে মূল রচনা করিবার শক্তিবিহীন বলা নিতান্ত ধৃষ্টতার কার্য হয়।'[৮৪] বিদ্যাসাগরের পক্ষ সমর্থনকালে উৎসাহের আতিশয্যে রামগতি 'সীতার বনবাস'কেও মৌলিক রচনা বলতে দ্বিধা করেননি!

এর কয়েকবছর পরে রাজনারায়ণ বসু বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে 'জাতীয় সভা'য় যে বক্তৃতা দেন, তাতে বিদ্যাসাগর সম্পর্কে রামগতির উক্তিরই প্রতিধ্বনি করেন তিনি। করার কারণ একাধিক। প্রথমত, রাজনারায়ণের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ আর দ্বিতীয়ত এই গ্রন্থরচনাকালে তিনি রামগতির দ্বারা রীতিমতো প্রভাবিত হয়েছিলেন। বইয়ের ভূমিকায় তিনি রামগতির কাছে ঋণ স্বীকারও করেছেন। আধুনিক বাংলা ভাষাকে কয়েকটি যুগে ভাগ করেছেন তিনি—রামমোহনের কাল, তত্ত্ববোধিনীর কাল, বিদ্যাসাগরের কাল, মধুসূদন ও বঙ্কিমের কাল। তাঁর মতে বিদ্যাসাগর প্রণীত গ্রন্থগুলি দ্বারাই 'বঙ্গভাষার বর্ত্তমান উন্নতির প্রথম সূত্রপাত।' বিদ্যাসাগরের বিরুদ্ধে মৌলিকতার অভাবের অভিযোগ সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য ঃ

'অনেকে মনে করেন, বিদ্যাসাগরের উদ্ভাবনী শক্তি নাই, তিনি যাহা লিখিয়াছেন তাহা অনুবাদ মাত্র, কিন্তু যিনি তাঁহার রচিত সংস্কৃত সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব এবং বিধবাবিবাহ বিচার গ্রন্থ পাঠ করিয়াছেন, তিনি বিদ্যাসাগরের অসাধারণ স্বকপোল রচনাশক্তি নাই, এমন কখনই বলিতে পারিবেন না।...তাঁহার প্রণীত সীতার বনবাসে ভবভূতির উত্তরচরিত ও বাল্মীকির রামায়ণের কোন কোন অংশ গৃহীত হইয়াছে সত্য। কিন্তু উহাতে তাঁহার নিজেরও অনেক মনোহর রচনা আছে। উহা তাঁহার একপ্রকার স্বকপোলরচিত গ্রন্থ বলিলে হয়। বিদ্যাসাগর বঙ্গভাষার অনেক পরিমাণে নির্মাণ ও পরিমার্জন কার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন। বঙ্গভাষা তাঁহার নিকট অশেষ কৃতজ্ঞতা ঋণে বদ্ধ আছে।'[৮৫]

রাজনারায়ণ এসব লেখার বছরখানেক পরে গঙ্গাচরণ সরকার ঢাকা কলেজ হলে ১২৮৬-র আষাঢ় মাসে 'বঙ্গসাহিত্য ও বঙ্গভাষা' সম্পর্কে এক বক্তৃতা করেন। বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ১৮৪৭-এর আগে বাংলা গদ্যে সেরকম গভীরতা, শ্রুতিমধুরতা বা লালিত্য ছিল না। এইরকম সময়ে আবির্ভাব হল দুই মহৎ ব্যক্তির—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার দত্তের। 'ফলত এই দুই মহাত্মা বিশেষত বিদ্যাসাগর মহাশয় হইতেই বঙ্গভাষার ঔৎকর্ষ ও উন্নতি। ইঁহারা অতিযত্নের সহিত ইহার সংস্করণ করিয়াছেন, বহুল প্রয়োজনীয় এবং শোভাকর শব্দ দ্বারা ইহার পুষ্টিসাধন করিয়াছেন। একরূপ নূতন গাঁথনিতে ইহার অঙ্গসৌষ্ঠব এবং দেহকান্তি বৃদ্ধি করিয়াছেন, ইহাকে একরূপ অতি সুদৃশ চলনে চলিতে শিখাইয়াছেন এবং ইহার কণ্ঠে মধুধারা ঢালিয়া দিয়াছেন। অতএব ইঁহাদের নিকট বঙ্গভাষা চিরবাধিত থাকিবেন।'[৮৬]

প্রসঙ্গত স্মরণীয়, এই গঙ্গাচরণ সরকার 'তুলনায় সমালোচন'-এর লেখক অক্ষয়চন্দ্র সরকারের পিতা। বিদ্যাসাগরের সাহিত্যকৃতি সম্পর্কে পিতাপুত্রের মতানৈক্য মনে রাখার মতো।

এই বাদানুবাদের মাঝখানে বিদ্যাসাগর আবার সাহিত্যজগতে প্রবেশ করলেন—তবে এবার আর স্বনামে নয়, বেনামে। ব্যঙ্গের তীক্ষ্ণ ছুরিতে প্রতিপক্ষের মুখোস খুলে দেবার জন্য লিখলেন 'ব্রজবিলাস'। এই বইটি সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে ১২৯১ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ সংখ্যা 'প্রবাহ' মন্তব্য করল : বইটির লেখক কে তা জানার উপায় নেই, তিনি 'উপযুক্ত ভাইপো' বলে আত্মপরিচয় দিয়েছেন। 'এই উপযুক্ত ভাইপো বহুবিবাহ উপলক্ষে শ্রীযুক্ত তারানাথ তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের সহিত বিবাদমল্ল হইয়া বারদ্বয় দেখা দিয়াছিলেন। সুতরাং বঙ্গীয় সাহিত্যক্ষেত্রে তিনি নূতন লোক নহেন।…এই পুস্তকে যেসকল শাস্ত্রীয় বিচার ও তর্ক উপস্থিত হইয়াছে তৎসমস্ত তত্ত্বদ্বিষয়ে চূড়ান্ত বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। গ্রন্থখানি তীব্র ব্যঙ্গ ও স্থানে স্থানে অনাবশ্যক কটুকথায় কলঙ্কিত। এরূপভাবে উতোর কাটাকাটি গ্রন্থকারের অগৌরবের বিষয়।…বর্তমান গ্রন্থলেখক যে অসাধারণ পণ্ডিত তাহার সন্দেহ নাই। তাঁহার যুক্তি সর্বত্রই সারবান, ভাষা নির্দোষ ও লিখনভঙ্গী সুপক্ব। গ্রন্থ আমূল অসাধারণ পরিহাস রসিকতায় পরিপূরিত।'[৮৭]

'ব্রজবিলাস' সম্পর্কে এই মন্তব্য প্রকাশিত হবার অল্পদিনের মধ্যেই প্রকাশিত হল কৈলাসচন্দ্র ঘোষের 'বাঙ্গালা সাহিত্য'। এই গ্রন্থে বিদ্যাসাগরের সাহিত্যকৃতিত্ব বিশ্লেষণের কোনো চেষ্টা লেখক করেননি, বিদ্যাসাগর সম্পর্কে আলোচনার সময় আবেগতাড়িত হয়ে তিনি মন্তব্য করেছেন 'গদ্য রচনার বিষয় দেখিতে গেলে রামমোহনের পর শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের পবিত্র নাম আমাদের স্মৃতিপটে সমুদিত হয় ; ইহাঁর নিকট আধুনিক বাঙ্গালা ভাষা যে পরিমাণে ঋণী, এত অন্য কাহারও নিকট নহে।'[৮৮] কৈলাসচন্দ্রের বিদ্যাসাগর সম্পর্কে ভক্তি-গদগদ হবার কারণ আছে। কৈলাসচন্দ্র ছিলেন সেকালের বিখ্যাত ঔপন্যাসিক তারকনাথ বিশ্বাসের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তারকনাথের বাবা দিগম্বর বিশ্বাসের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত মধুর। বর্ধমানে গেলেই বিদ্যাসাগর দিগম্বর বিশ্বাসের বাড়িতে যেতেন এবং নিজের হাতে রান্না করে সবাইকে খাওয়াতেন। এর ফলে নিতান্ত অল্পবয়সেই তারকনাথ হয়ে ওঠেন ঘোরতর বিদ্যাসাগর-ভক্ত। তারকনাথের এই বিদ্যাসাগর-ভক্তিই সংক্রামিত হয়েছিল কৈলাসচন্দ্রে এবং তারই বহিঃপ্রকাশ বিদ্যাসাগর সম্পর্কে বিশ্লেষণবিমুখ ভক্তিনম্র মন্তব্যে।

কৈলাসচন্দ্রের বই বেরোনোর কয়েকবছরের মধ্যে বিদ্যাসাগরের মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যু উপলক্ষে রচিত শোক-প্রবন্ধে 'তত্ত্ববোধিনী' তাঁকে 'বঙ্গভাষার পিতা' বলতে ইতস্তত করেনি। শুধু 'তত্ত্ববোধিনী'ই নয়, গুণগ্রাহীরা যে তাঁকে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের জনক বলে মনে করে—একথা 'ইংলিশম্যান' তাঁর শোকসংবাদে জানাতে ভোলেনি।[৮৯] এইকালে রচিত একটি শোক কবিতায় স্পষ্টই বলা হয় :

'বঙ্গভাষা, হায় ! তুই হলি আজি পিতৃহীনা।
লালন পালন তোর কে করিবে পিতা বিনা ?'[৯০]

বিদ্যাসাগরের গুণমুগ্ধ দীনবন্ধু মিত্র তাঁর ‘সুরধুনী কাব্যে’ বিদ্যাসাগরের রচনাবৈশিষ্ট্যের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন ঃ ‘অমিয়া-লহরী যুত রচনানিচয়, ললিত-মালতীমালা-কোমলতাময়’, ১৮৭২-এ প্রকাশিত ‘দ্বাদশ কবিতা’ বইটি বিদ্যাসাগরকে উৎসর্গ করতে গিয়ে তিনি বলেন, ‘আপনি বর্তমান বঙ্গভাষার জনক, বঙ্গভাষা আপনার তনয়া।’ তবে সেকালে সকলে এ মত বিশ্বাস করতেন না—তা বলাই বাহুল্য। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর উক্তি প্রসঙ্গত স্মরণীয়। একবার একটি সাক্ষাৎকারে বাংলা ভাষা সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ‘বিদ্যাসাগর মহাশয়কে বাংলা ভাষার জন্মদাতা বলা হয়। আমার মনে হয় উনি খাঁটি বাংলাভাষার গলা টিপে মারতেই চেয়েছিলেন।... বিদ্যাসাগর মহাশয় museum এর বাংলা লিখলেন চিত্রশালিকা। এ শব্দ সংস্কৃতেও নেই, বাংলায়ও কেউ ব্যবহার করে না। লোকে বলে—আজব ঘর, না হয় আরও ছোট করে যাদুঘর বলতে ক্ষতি কি? তেমনি observatory-র অনুবাদ পরিপ্রেক্ষিকা। কেন মানমন্দির, না হয় চলতি তারাঘর বললে কি মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যায়? আমরা বাঙ্গালী, বাংলা আমাদের মাতৃভাষা। তার শব্দমালা, ব্যাকরণ সবই খাঁটি বাঙ্গালীর জীবন দিয়েই গড়ে নিলেই ভালো হয়।’[৯১] আর বিদ্যাসাগর তা না করায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী গভীর ক্ষোভ প্রকাশ করেন।

মৃত্যুর কয়েকমাস আগে বিদ্যাসাগর আত্মজীবনী রচনার কাজে হাত দেন। এই সংবাদ জানাতে গিয়ে সেকালের একটি পত্রিকা মন্তব্য করে ‘বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নাম বর্তমানে যেরূপ আবালবনিতা মধ্যে জাগরূক আছে, তাহাতে তাঁহার প্রকৃত জীবনী তাঁহার দ্বারা প্রচারিত হওয়া নিতান্ত প্রয়োজনীয়। দেশের যেরূপ অবস্থা তাহাতে ভয় হয় পাছে রাজা রামমোহন রায়কে এক্ষণে যেরূপ কেহ ব্রাহ্ম, কেহ খ্রীষ্টান বলিয়া ঘোষণা করিতেছেন, বিদ্যাসাগর মহাশয় নিজের জীবনী না লিখিলে তাঁহার সম্বন্ধেও ঐরূপ নানা কথা রটিবার সম্ভাবনা।’[৯২] জীবনচরিত লেখার কাজ সমাপ্ত হবার আগেই তাঁর মৃত্যু হয়। মৃত্যুর অল্পদিন পরে এই অসমাপ্ত আত্মচরিতখানি ১২৯৮-এর কার্তিক মাসের ‘সাহিত্য’ পত্রিকায় প্রকাশিত হলে, এটি পড়ে ১২৯৮-এর অগ্রহায়ণ সংখ্যা ‘সাধনা’তে রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করেন, এই বই সম্পূর্ণ হলে ‘আপনার কথা কেমন করে লিখিতে হয়’ বাঙালি তা শিখতে পারত। লেখাটিতে ‘সংযত সহৃদয়তা’ ও ‘নিরলঙ্কার সত্যের’ প্রকাশ দেখে রবীন্দ্রনাথ মুগ্ধ হন। এর কয়েকমাস পরে ১২৯৯-এর বৈশাখ সংখ্যা ‘সাহিত্যে’ বিদ্যাসাগরের আর একটি অপ্রকাশিত রচনা ‘প্রভাবতী সম্ভাষণে’র সঙ্গে পাঠকদের পরিচয় ঘটে। বন্ধু রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিশুকন্যা প্রভাবতীর অকালমৃত্যুতে একান্ত ব্যথিত হয়ে বিদ্যাসাগর এই প্রবন্ধটি রচনা করেন। রচনাটি নিতান্ত ব্যক্তিগত। বিদ্যাসাগরের প্রচলিত রচনারীতির সঙ্গে এর মিল বড় কম। ১২৯৯-এর জ্যৈষ্ঠ মাসের ‘সাধনা’য় সাময়িক সাহিত্য সমালোচনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করেন, ‘স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয় রচিত এই প্রবন্ধটি পাঠ করিলে হৃদয় করুণরসে আর্দ্র না হইয়া থাকিতে পারে না।’ বিদ্যাসাগরের সাহিত্যকৃতি সম্পর্কে

রবীন্দ্রনাথের এই সসম্ভ্রম মনোভাবের চূড়ান্ত প্রকাশ ঘটল ১৩০২-এর ১৩ শ্রাবণ কলকাতার এমারেল্ড থিয়েটারে অনুষ্ঠিত এক স্মরণসভায়। এই স্মরণসভায় 'বিদ্যাসাগর চরিত' নামে যে দীর্ঘ প্রবন্ধটি তিনি পাঠ করেন, তা এই মাসের 'সাধনা'য় প্রকাশিত হয়। এতে রবীন্দ্রনাথ বিদ্যাসাগরকে 'বাংলাভাষার প্রথম যথার্থ শিল্পী'র মর্যাদায় ভূষিত করেন।

সমকালে বিদ্যাসাগর-অনুরাগীরা তাঁর আশ্চর্য রচনাশক্তি, ভাষার শ্রুতিমধুরতা ও লালিত্য সম্পর্কে যেসব কথা বলেছিলেন —তা আমরা দেখে এসেছি। জীবিতকালেই বিদ্যাসাগর 'বাংলাভাষার জন্মদাতা' বা 'পিতা'র সম্মান পেয়েছিলেন—তাও আমরা দেখেছি। গদ্যের শরীর নির্মাণ করার কৃতিত্বও তাঁকে দেওয়া হয়েছিল।[৯৭] একইকালে তাঁর লেখায় মৌলিকতার অভাব, আড়ষ্ট ভাষাভঙ্গি, প্রাণহীন গদ্যরীতি, পুনরুক্তি করার প্রবণতার দিকে সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন বেশকিছু সমালোচক। বোঝা যাচ্ছে, বিদ্যাসাগরের সাহিত্যকৃতিত্ব সম্পর্কে সমকালে যথেষ্ট মতভেদ ছিল। স্মরণসভার ভাবগম্ভীর পরিবেশে গদ্যসাহিত্যে বিদ্যাসাগরের কৃতিত্ব আলোচনার সময় রবীন্দ্রনাথ সেই বিতর্কের মধ্যে প্রবেশ করলেন না। সমালোচনাকে তিনি পূজা বলে মনে করতেন। সেই কারণে বিদ্যাসাগরের গদ্যরচনার ইতিবাচক দিকগুলিই তিনি তুলে ধরলেন। বিদ্যাসাগরের গদ্যরচনার যেসব গুণের কথা তিনি বললেন, সেগুলি প্রায় সবই আগে বলা হয়েছিল—কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মতো এত সুন্দর করে কেউ তা বলতে পারেননি। এমারেল্ড থিয়েটারের এই সভায় অননুকরণীয় ভাষায় সাহিত্যিক বিদ্যাসাগরের কৃতিত্বের যে পরিমাপ তিনি করলেন, তা পরবর্তীকালের লেখকদের অতিমাত্রায় প্রভাবিত করল। রবীন্দ্রনাথের বিদ্যাসাগর প্রশস্তি প্রকাশিত হবার পর, বিদ্যাসাগরের গদ্যরচনার নেতিবাচক দিকগুলি বাঙালির মন থেকে প্রায় মুছে গেল। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র দত্ত, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, অক্ষয়চন্দ্র সরকার, কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, হরপ্রসাদ শাস্ত্রীরা লেখক বিদ্যাসাগর সম্পর্কে যেসব কথা বলে আসছিলেন, তা স্থান পেল ইতিহাসের পৃষ্ঠায়।

His exertions in the cause of Hindu widows, the noble courage with which he a pandit and a professor, first advocated their cause, the patient research and indefatigable industry with which he sought to maintain it, his large hearted benevolence, and his labours in the cause of vernacular education—all these things combine to place him in the front rank of the benefactors of his country. His claims to the respect and gratitude of his countrymen are many and great, but high literary excellence is certainly not among them. He has a great literary reputation ; so had Iswar Chandra Gupta : but both reputations are undeserved, and that of Vidyasagar scarcely less than that of Gupta. If successful translations from other language constitute any claim to a high place as an author, we admit them in Vidyasagar's case ; and if the compilation of very good primers for infants can in any way strengthen his claim, his claim is stong. But we deny that either translating or primer-making evinces a high order of genius ; and beyond translating or primer making Vidyasagar has done nothing. His brief discourse on Sanskrit literature deserves, and his widow marriage pamphlets claim, no notice here. If we exclude the school books for children, his translations are five in number : the Betal Panchabinsati from the Hindi ; Sakuntala, Sitar Banabas and the introduction to the Mahabharat from the Sanskrit : and the Bhrantibilas or Comedy of Errors from the English. Of these it is enough to say that they are excellent translations or adaptations, better probably than anything else of the same kind in Bengali. The Sitar Banabas is as little original as the others. The first chapter is taken from the Uttar Ramcharita, Bhavabhuti's noble work ; and the remaining three from the Ramayana itself, from which Bhavabhuti drew his inspiration. It is in fact a reproduction in smooth and flowing but somewhat nerveless language, of scenes

selected from Valmiki's poem. The scenes are well chosen, and expulsion of the supernatural element gives them a more realistic tone, but Vidyasagar is not free from the tautology and bombast which always disfigure the writers of the school to which he belongs ;' *Bengali Literature*, The Calcutta Review, April, 1871

মানুষ বিদ্যাসাগর ঃ সমকালের চোখে

ফ্রান্সের ভার্সাই শহরে মধুসূদন যখন দারুণ অভাব-অনটনের মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন, তখন তাঁর মনে পড়ল বাংলাদেশের একটি মানুষের কথা। মানুষটির নাম ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। নিজের দুঃখের কথা জানিয়ে একের পর এক চিঠি লিখলেন তাঁকে। আর লিখবেন নাই বা কেন, মানুষটি তো শুধু বিদ্যারই সাগর নন, করুণারও সাগর। এইসব চিঠিতে শুধু যে নিজের কথাই বললেন তাই নয়, বিদ্যাসাগর সম্পর্কেও টুকরো টুকরো নানা কথা লিখলেন। আর সেইসব কথার মধ্য দিয়ে ফুটে উঠল পরদুঃখকাতর, হৃদয়বান, আত্মমর্যাদাসচেতন একটি মানুষের ছবি। মধুসূদনের কাছে কখনও তিনি বাঙালি চরিত্রের সেরা নিদর্শন, কখনও আবার প্রকৃতির এক মহান সন্তান। একটি চিঠিতে লিখলেন : এমন একজনের কাছে আমি আবেদন জানাচ্ছি, যাঁর জ্ঞান আর মনীষা প্রাচীনকালের ঋষিদের মতো, উৎসাহ-উদ্দীপনা ইংরেজের মতো, আর হৃদয়টি বাঙালি মায়ের মতো। এত সংক্ষেপে, সুন্দর করে মানুষ বিদ্যাসাগরের ছবি আর কেউ আঁকতে পেরেছেন বলে মনে হয় না। সেকালের বাঙালি মায়েদের মতো কারণে-অকারণে অশ্রু বিসর্জন করা ছিল বিদ্যাসাগর চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। কেউ নিজের দুঃখের কথা বিদ্যাসাগরকে জানাতে এসে সবিস্ময়ে দেখতেন, তাঁর দুঃখের কথা শুনে শ্রোতার দু'চোখ বেয়ে জল পড়ছে। রজনীকান্ত গুপ্ত জানিয়েছেন, কারো দুঃখ দেখলে বা অসহনীয় কষ্টের কথা শুনলে 'তাঁহার উজ্জ্বল চক্ষু দুইটি উজ্জ্বলতর হইত, এবং তাহা হইতে মুক্তাফলসদৃশ অশ্রুবিন্দু পতিত হইয়া, গণ্ডদেশ প্লাবিত হইত।'[১] রোদনপ্রবণতা যে তাঁর 'চরিত্রের একটা বিশেষ লক্ষণ' তা রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীও স্বীকার করেছেন। বিদ্যাসাগরের ঔদার্য মধুসূদনের মতো আরো অনেককে বিপদ থেকে রক্ষা করেছিল। সেকথা স্মরণ করেই নবীনচন্দ্র সেন তাঁকে 'নরদেব' ও 'নরনারায়ণ' বলতে ইতস্তত করেননি। 'বিপন্নের বেলাভূমি' এই মানুষটি নবীনচন্দ্রের মতে মরুময় সংসারে দয়ার সাগর, দুর্গতকে উদ্ধার করতে তিনি সদা তৎপর। ডান হাতে যা তিনি দান করেন, বাঁ হাত তা জানতে পারে না।[২] নবীনচন্দ্রের মতে বিদ্যাসাগরের জীবন নিষ্কাম তত্ত্বের প্রকৃষ্ট নিদর্শন।

বিদ্যাসাগরের এই নিষ্কাম করুণাধারায় বিশেষভাবে সিক্ত বাঙালি মেয়েরা। বাঙালি হিন্দু ঘরের মেয়েদের দুঃখদুর্দশার সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল নিবিড়, তাই তাঁর প্রতিটি সংস্কার আন্দোলনের পেছনেই ছিল নারীর দুঃখমোচনের আকাঙ্ক্ষা। এই আকাঙ্ক্ষাকে বাস্তবে রূপ দিতে গিয়ে অনেক অপবাদ, অনেক গঞ্জনাই তাঁকে সহ্য করতে হয়েছে। তাঁদের পাশে দাঁড়াতে গিয়ে একদিকে ব্যয় করেছেন অজস্র অর্থ, অন্যদিকে আত্মীয় পরিজনের সঙ্গে সৃষ্টি হয়েছে তিক্ততার সম্পর্ক—তবু এদেশের মেয়েদের

কল্যাণকামনা থেকে কেউ তাঁকে বিরত করতে পারেনি। পারেনি বলেই সমকালের মানুষজনের কাছে তিনি পরিচিত হয়ে উঠেছিলেন 'অবলাবান্ধব', 'বঙ্গীয় স্ত্রীজাতির পিতৃস্থানীয়', 'female's friend', 'liberator of the female's' ইত্যাদি নামে। নারীজাতির প্রতি তাঁর এই বিশেষ সহানুভূতির কথা স্মরণ করে 'বামাবোধিনী' লেখে : 'বঙ্গের পরমবন্ধু দয়ারসাগর বিদ্যাসাগরের বিয়োগে বাঙ্গালীজাতি বন্ধুহীন হইয়া হাহাকার করিতেছেন, কিন্তু বঙ্গনারীগণ পিতৃহীন হইয়াছে।' তাঁর মৃত্যুর পর মেয়েরা আলাদা সভা করে তাঁর উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। বেথুন কলেজে এমনি এক সভায় প্রায় তিনশো মহিলা উপস্থিত ছিলেন। সভাপতির ভাষণে কামিনী সেন (রায়) বলেন :

৩২০ সং।] বামাবোধিনী পত্রিকা। ১৩১

স্বর্গীয় বিদ্যাসাগরের স্মরণার্থ মহিলা সভা।

গত ৮ই আগষ্ট শনিবার বেলা ২॥০ ঘটিকার সময় বেথুন কলেজ গৃহে পরলোকগত পূজ্যপাদ মহাত্মা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্মরণার্থে মহিলাগণের একটি সমিতি আহূত হয়। উহাতে প্রায় তিন শত রমণী সমবেত হইয়াছিলেন। যদিও এই সভাটি ব্রাহ্ম-মহিলাদিগের উদ্যোগ ও যত্নে সংঘটিত হইয়াছিল, তথাপি বহুসংখ্যক হিন্দু-মহিলা আগ্রহ সহকারে ইহাতে যোগ দিয়াছিলেন এবং কতিপয় খৃষ্টীয় মহিলাও উপস্থিত ছিলেন।

কুমারী চন্দ্রমুখী বসুর প্রস্তাবে এবং সর্ব্ব সম্মতিক্রমে কুমারী কামিনী সেন সভাপতি মনোনীত হন এবং তিনি এই কয়েকটি কথা বলিয়া সভার কার্য্য আরম্ভ করেন :—

আমাদের দেশের গৌরব, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিয়োগে আমাদের দেশে যে স্থান শূন্য হইয়াছে তাহা কখনও পূর্ণ হইবার নহে। তাঁহার গুণের কথা আমাদের দেশে, আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই অবগত আছেন, উপস্থিত মহিলাগণের মধ্যে অনেকে হয় ত সাক্ষাৎভাবে তাঁহার সহিত পরিচিত ছিলেন। তাঁহার ঋষিতুল্য চরিত্র, অলোকসামান্য মনীষা, গভীর শাস্ত্রজ্ঞান, তাঁহার অশ্রুতপূর্ব্ব পরদুঃখকাতরতা, তাঁহার আশ্চর্য্য দানশীলতা, তাঁহার স্থিরপ্রতিজ্ঞা এবং তাঁহার নির্ভীকতা—আর কত গুণের কথা বলিব? একাধারে এত গুণের সমবায় বর্ত্তমান সময়ে আর দেখা যায় না। তাঁহার বিয়োগে বঙ্গসমাজ—সমগ্র ভারতবর্ষ এক প্রকারে নয়—বহু প্রকারে ক্ষতিগ্রস্ত। সমগ্র দেশ তাঁহার নিকট ঋণী, কিন্তু স্ত্রীশিক্ষাপ্রচারে সাহায্য করিয়া, বালবিধবাদিগের পুনঃসংস্কার বিধি প্রণয়ন করিয়া, বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ প্রভৃতি কদা-

বিদ্যাসাগরের মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করছেন বাঙালি মেয়েরা

'সমগ্র দেশ তাঁহার নিকট ঋণী, কিন্তু স্ত্রীশিক্ষাপ্রসারে সাহায্য করিয়া, বালবিধবাদিগের পুনঃসংস্কার বিধি প্রণয়ন করিয়া, বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ প্রভৃতি কদাচারের বিরুদ্ধে আজীবন সংগ্রাম করিয়া তিনি ভারতবাসীকে অপরিশোধ্য ঋণে আবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুতে আমরা সর্বপ্রধান হিতাকাঙ্ক্ষী ও হিতকারী হৃদয়বান সুহৃদের স্নেহ হইতে বঞ্চিত হইয়াছি। চিরদিন অন্তরে বাহিরে তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা আমাদের একান্ত কর্ত্তব্য।'[৩]

বিদ্যাসাগর চরিত্রে এই করুণাধারার পাশাপাশি ছিল গভীর আত্মমর্যাদাবোধ। প্রখর আত্মমর্যাদাবোধ লোকচক্ষে বিদ্যাসাগরের মর্যাদা বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছিল। হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষ কার সাহেবের দুর্ব্যবহারের মৌখিক কোনো প্রতিবাদ তিনি করেননি, শুধু তাঁর ব্যবহার তাঁকেই ফিরিয়ে দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন, কোন্‌টা করা উচিত, আর কোন্‌টা নয়। এই প্রখর আত্মমর্যাদাবোধ থেকেই শিবনাথ শাস্ত্রীকে তিনি বলেছিলেন, 'ভারতবর্ষে এমন রাজা নাই যাহার নাকে এই চটিজুতা শুদ্ধ পাখানা তুলিয়া টক করিয়া লাথি মারিতে না পারি।' এই অসাধারণ আত্মমর্যাদাবোধই তাঁকে প্রাণিত করেছিল বর্ধমানের মহারানীর দান প্রত্যাখ্যান করতে। ১৮৫৪-য় বর্ধমানের মহারানী তুলাদান করে কলকাতার প্রধান পণ্ডিতদের কাছে বিদায় প্রেরণ করেন। বিদ্যাসাগর ছাড়া সকলেই তা গ্রহণ করেন। বিদ্যাসাগর এই দান গ্রহণ করতে অস্বীকার করে বলেন, 'আমি গবর্ণমেণ্টের স্থানে তিনশত টাকা মাসিক বেতন পাইতেছি, তাহাই আমার যথেষ্ট হইয়াছে আর অন্যপ্রকারে উপার্জন করিতে বাসনা নাই।' তাঁর এই আচরণের সমালোচনা করে 'সম্বাদ ভাস্কর'-এ একটি চিঠি প্রকাশিত হয়ঃ

'বিদ্যাসাগর গবর্ণমেণ্টের অধিক প্রিয়পাত্র হইলেও বর্ধমানেশ্বরীর দান অবজ্ঞা করিয়া ফিরিয়া দেওয়া অতি অসঙ্গত কার্য্য হইয়াছে আমি বোধ করি যদি ঐ দান বিদ্যাসাগর ভট্টাচার্য্য মহাশয় আপন সম্ভ্রমসূচক জ্ঞান করিয়াও গ্রহণ করিতেন তবে তাঁহার নামের উপযুক্ত কার্য্য করা হইত, হায়, আমারদিগের বাঙ্গালি লোকের কুস্বভাব বিদ্যাপ্রভাবেও দূর হইতেছে না অন্য দেশীয় লোকেরা বিদ্যায় বিদ্বান হইলেও বহুসংখ্যক ধনোপার্জন আপনারদিগের নম্রতা শীলতা সভ্যতা পরিত্যাগ করিতে পারেন না কিন্তু বিদ্যাসাগর বিদ্যাসাগরের বিন্দুমাত্র স্পর্শ করিয়াই ও তিনশত টাকা মাসিক বেতন প্রাপ্ত হওয়াতেই অহঙ্কারে একেবারে চক্ষুঃকর্ণ উভয়েন্দ্রিয় হারাইয়াছেন তিনি যে গবর্ণমেণ্টের চাকর হইয়া যাঁহার দান অবজ্ঞা করিয়া হতাদর করিলেন বোধ করি সেই গবর্ণমেণ্টও এ বিষয়ে তাঁহাকে অবিদ্যাসাগর কহিবেন, যাহা হউক, তিনি মহারাজ্ঞীর দান গ্রহণ না করিলেও অতি পবিত্ররূপে বিখ্যাত হইতে পারিবেন না, যে হেতুক তাঁহার গুপ্ত বিদ্যাতত্ত্বও অনেকে প্রাপ্ত হইয়াছেন।'[৪]

তা 'প্রাপ্ত' হলেও, সেকালের অধিকাংশ মানুষই তাঁর আত্মমর্যাদা সম্পর্কে ছিলেন সচেতন। সেই কারণে 'সখা'-সম্পাদক লিখেছিলেন, 'তিনি কখনও আত্মমর্যাদা ভুলেন নাই; কখনও সামান্য স্বার্থের অনুরোধে অপমান সহ্য করেন নাই।' এমন

একজন মানুষকে বাঙালিসমাজ যে গভীর সম্ভ্রমের চোখে দেখবে—সে তো জানা কথাই।

বিদ্যাসাগর সম্পর্কে বাঙালিসমাজের এই শ্রদ্ধা, এই সম্ভ্রম কি শুধু তাঁর দান-ধ্যান, পরদুঃখকাতরতা, 'কায়মনোবাক্যে সাধুকার্যের অনুষ্ঠান', প্রখর আত্মমর্যাদাবোধ, চারিত্রিক স্বাতন্ত্র্য থেকেই গড়ে উঠেছিল, নাকি এর আর কোনো কারণ ছিল? কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের মতে 'সাহেবদের কাছে বিদ্যাসাগরের খুব প্রতিপত্তি ছিল বলিয়া তাঁহার স্বদেশবাসীর নিকট তিনি অত খাতির পাইয়াছিলেন।'[৫] কৃষ্ণকমলের এই কথার পরোক্ষ স্বীকৃতি মেলে রজনীকান্ত গুপ্তের লেখায়। তিনি জানিয়েছেন, 'বাঙ্গালার লেফটেনেণ্ট গবর্ণর হইতে উচ্চশ্রেণীর রাজপুরুষগণের সহিত তাঁহার সবিশেষ পরিচয় ছিল। সকলেই তাঁহার আদর করিতেন, সকলেই তাঁহার প্রতি সম্মান দেখাইতেন।'[৬] বিডন, হ্যালিডে, গ্রাণ্ট, মোয়াট, মার্শাল প্রভৃতির সঙ্গে তাঁর হৃদ্য সম্পর্কের কথা অতি পরিচিত। একদিকে ব্যক্তিগত দয়াদাক্ষিণ্য ও অন্যদিকে সাহেবদের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক—এই দুয়ের যোগফলে সেকালের মানুষের কাছে তিনি হয়ে উঠেছিলেন অতি শ্রদ্ধা ও সমাদরের পাত্র।

মানুষ হিসাবে তিনি ছিলেন যেমন দয়ালু, তেমনি গম্ভীর। তাঁর ছাত্র হরিশ্চন্দ্র কবিরত্ন (গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্নের পুত্র) জানিয়েছেন, বিদ্যাসাগর মহাশয় 'অতীব গম্ভীর প্রকৃতি লোক ছিলেন।...আমরা ভয়ে তাঁহার সম্মুখে যাইতে পারিতাম না।' সংস্কৃত কলেজে অধ্যক্ষ থাকাকালীন তিনি নিয়ম-শৃঙ্খলার দিকে কঠোর দৃষ্টি রাখতেন। প্রতিদিন সাড়ে দশটার ঘণ্টা পড়লে তিনি প্রত্যেক ক্লাসে শিক্ষক এসেছেন কিনা দেখে যেতেন। টিফিনের পরও একবার ঘুরে ঘুরে দেখতেন, সব ক্লাসে শিক্ষকরা গেছেন কিনা। কলেজের কোনো ছাত্র ঝগড়া-মারামারি করলে তাকে তিনি কলেজ থেকে দূর করে দিতেন। 'এমনকি নিজের পুত্রকেও মন্দ ব্যবহার হেতু কলেজ হইতে তাড়াইয়া দিয়াছিলেন।'[৭] নিয়ম-শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য তাঁর এই কঠোরতা দেখে ঐ কলেজের একজন অধ্যাপক বলেছিলেন, 'যদিও বিদ্যাসাগর আমার ছাত্র, তথাপি তাহার সঙ্গে কথাবার্তা কহিতে আমার ভয় হয়।'[৮]

অবশ্য ঘনিষ্ঠ মহলে তাঁর এই গাম্ভীর্যের আবরণ খসে পড়ত, নানা সরস কথায় আসর জমিয়ে তুলতেন তিনি। এমনকি কলেজ ছুটির পর ছাত্রদের সঙ্গে বন্ধুর মতো মিশতে কোনো সঙ্কোচবোধ করতেন না। ছাত্রদের জন্য তাঁর দরজা সবসময় ছিল খোলা, তিনি তাদের পদ ও ধাতু জিজ্ঞাসা করতেন। যে যটা শুদ্ধ উত্তর দিতে পারত, তিনি তাকে ততগুলো সন্দেশ খাওয়াতেন। তাদের আপদে বিপদে যেমন ছুটে যেতেন, তেমনি বিভিন্ন নাটক অভিনয়েও উৎসাহ দিতেন। সংস্কৃত কলেজে অধ্যক্ষ থাকাকালীন নিকটবর্তী বিশ্বাস বাড়ি থেকে অলঙ্কার ও বস্ত্র এনে তিনি নিজের হাতে ছেলেদের সাজাতেন। কলেজের একটি ঘরে ছেলেদের রিহার্সাল দেবার অনুমতিও দিয়েছিলেন তিনি। আসলে অভিনয় সম্পর্কে আগ্রহ তাঁর বরাবরই ছিল। রামনারায়ণ তর্করত্নের

'রত্নাবলী' ও 'কুলীন কুলসর্বস্ব' নাটকের অভিনয় তিনি আগ্রহ নিয়ে দেখতে গিয়েছিলেন। দীনবন্ধুর 'নীলদর্পণ'-এর অভিনয় দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন তিনি। উমেশচন্দ্র মিত্রের 'বিধবাবিবাহ' নাটকের অভিনয় দেখে তিনি অশ্রু সংবরণ করতে পারেননি। তবে ১৮৭৩-এ বঙ্গ রঙ্গমঞ্চে অভিনেত্রীর আগমন ঘটলে, তিনি ক্ষুব্ধ হয়ে থিয়েটারের সঙ্গে সমস্ত সংস্রব ত্যাগ করেন।

ধর্ম বিষয়ে তিনি ছিলেন উদাসীন। সেকালের বিশিষ্ট ধর্মীয় পুরুষদের সম্পর্কে সাধারণ সৌজন্যের অতিরিক্ত কোনো আসক্তি তিনি প্রকাশ করেননি। দর্শন সম্পর্কে শশধর তর্কচূড়ামণির ধারণাকে একবার তিনি কটাক্ষ করেন। বিদ্যাসাগরের নামডাক শুনে রামকৃষ্ণ পরমহংস তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে তাঁকে দক্ষিণেশ্বরে যাবার আমন্ত্রণ জানালেও, সেখানে যাবার কোনো তাগিদ তিনি অনুভব করেননি। যে-কারণে রামকৃষ্ণ ক্ষোভের সঙ্গে শ্রীম-কে বলেন, 'বিদ্যাসাগর সত্য কথা কয় না কেন? ...সেদিন বললে এখানে আসবে, কিন্তু এলো না।' ধর্মবিষয়ে বিদ্যাসাগরের উদাসীনতার নানা কাহিনী জীবনীগ্রন্থগুলিতে পাই। তবে প্রথমজীবনে ধর্মবিষয়ে তিনি যতখানি উদাসীন ছিলেন, শেষজীবনে ততখানি ছিলেন কিনা সন্দেহ। প্রথম জীবনে সন্ধ্যাবন্দনা ভুলে যাওয়ায় তাঁর পিতা তাঁকে 'বিলক্ষণ প্রহার' পর্যন্ত করেন। শেষজীবনে অবশ্য তিনি নিষ্ঠার সঙ্গে সন্ধ্যাবন্দনাদি করতেন।[৯] এমনকি কোনো-কোনো হিন্দু ধর্মরক্ষা সমিতির সঙ্গেও যোগাযোগ রেখে চলতেন।

চললেও, ধর্ম নিয়ে কোনোদিনই মাতামাতি করেননি তিনি। জীবনপ্রান্তে পেঁছেও এ-সম্পর্কে তিনি ছিলেন অনেকটাই নির্বিকার। এর চমৎকার দৃষ্টান্ত মেলে 'শ্লোক-মঞ্জরী' থেকে। বাল্যকালে গঙ্গাধর তর্কবাগীশের কাছে যেসব সরস কবিতা তিনি শুনেছিলেন, সেগুলি ১৮৯০-এ 'সংস্কৃত শ্লোকমঞ্জরী' নাম দিয়ে প্রকাশ করেন। এই সংগ্রহের মধ্যে ঈশ্বর বা পরমার্থ বিষয়ক একটি কবিতাও স্থান পায়নি। বইটির সমালোচনা করতে গিয়ে 'এডুকেশন গেজেট' তাই বলে 'বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এই সংগ্রহের মধ্যে দেববিষয়ক বা পরমার্থ বিষয়ক কবিতা নাই বলিলেই হয়। হয় তাঁহার গুরুদেব সে সকল শিষ্যকে বলেন নাই, অথবা শিষ্যের স্মরণ নাই।'[১০] ঈশ্বর বিষয়ে কিছুটা উদাসীন হলেও, হিন্দু শাস্ত্র সম্পর্কে তাঁর আগ্রহের কোনো অভাব ছিল না। তাঁর এই স্ববিরোধী মনোভাব সমকালেই সমালোচিত হয়।

চেহারার দিক দিয়ে তিনি সুপুরুষ ছিলেন না। নবীনচন্দ্র সেন স্পষ্টই লিখেছেন, 'বঙ্গের তিনজন বড়লোকই—বিদ্যাসাগর, কৃষ্ণদাস ও প্যারীচরণ—তিনটি কুরূপের আদর্শ।' বিদ্যাসাগরের নামডাক শুনে দূর দূরান্তর থেকে তাঁকে দেখতে এসে মানুষজন হতাশ হত। তাঁর সাজপোশাকও ছিল অতি সাধারণ—পরনে ধুতি-চাদর, আর পায়ে তালতলার চটি। এই পোশাকে ছিল তাঁর সর্বত্র যাতায়াত। দেশি পোশাকের জন্য দু'এক জায়গায় তাঁকে অস্বস্তিকর অবস্থায় পড়তে হয়েছে—তবু সাজ বদলাননি তিনি। ১৮৭৪-এর জানুয়ারি মাসে কাশীর কবি হরিশ্চন্দ্রকে নিয়ে

কলকাতা মিউজিয়ামে যান তিনি, যাদুঘরের দ্বাররক্ষক বিদ্যাসাগরকে চটি খুলে ভেতরে ঢুকতে বলেন। তা করতে অস্বীকার করে বিদ্যাসাগর ফিরে আসেন। বিষয়টি নিয়ে সেকালে প্রচুর হইচই হয়। 'এডুকেশন গেজেট' লেখে :

'পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সহিত এসিয়াটিক সোসাইটির জুতা লইয়া গোল হইয়াছে। বিদ্যাসাগর মহাশয় দেশী জুতা পায়ে দিয়া উক্ত সোসাইটিতে প্রবেশ করিতে অনুমত হন না। এতদ্দ্বারা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কিছু ক্ষতি হইবে না। কিন্তু বিদ্যালোচনাই যে সোসাইটির কার্য্য, সে সোসাইটির মধ্যে এমন কুসংস্কার কেন?'[১১] এই ঘটনার অল্পদিন পরে বিদ্যাসাগরী চটির মাহাত্ম্যকীর্তন করে অক্ষয়চন্দ্র সরকার 'সাধারণী'তে একটি শ্লেষাত্মক রচনা লেখেন। সত্যেন্দ্রনাথ দত্তও 'সাগর তর্পণ'-এ বিদ্যাসাগরী চটির জয়গান করেন। চটির প্রতি বিদ্যাসাগরের বিশেষ অনুরাগের কথা রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীও বলেছেন।

ধুতি চাদর পরিহিত খর্বকায় এই মানুষটি ছিলেন বাঙালিসমাজে অতি পরিচিত। সরকারি খেতাবকে তিনি তুচ্ছজ্ঞান করতেন। ১৮৮০-তে সরকার অযাচিতভাবে তাঁকে C I E উপাধিতে ভূষিত করেন। তিনি রাজদ্বারে নতুন উপাধি পেয়েছেন শুনে পল্লীগ্রামের এক অধ্যাপক তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসেন। বিদ্যাসাগরকে তিনি জিজ্ঞাসা করেন, 'নূতন উপাধিটা কি?

বিদ্যাসাগর—সি· আই· ই

অধ্যাপক—তাহাতে কি হইল?

বিদ্যাসাগর—ছাই।

অধ্যাপক—সাধু, সাধু! রাজার মুখে সকলই শোভা পায়।'[১২]

এই উপাধি গ্রহণ করতে তিনি রাজভবনে যাননি, তাঁকে এটি দিতে এসে লাটভবনের লোকেরা কিছু বকশিসের কথা বললে, তিনি বিনাদ্বিধায় তাদের পদকটি বিক্রি করে পয়সা ভাগ করে নিতে বলেন। রক্ষণশীল ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ও বিদ্যাসাগরের এই মনোভাবের প্রশংসা না করে পারেননি। সরকারি কোনো খেতাব তাঁর মর্যাদা বাড়াতে পারবে—একথা সেকালে কেউ বিশ্বাসই করত না। করত না বলেই, বিদ্যাসাগরকে নতুন করে সরকারি খেতাব দেওয়া হচ্ছে শুনে সেকালের একটি সংবাদপত্র লেখে :

'জুবিলি উপলক্ষে পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়কে গবর্ণমেণ্ট 'মহোমহোপাধ্যায়' খেতাব দিতে চাহিয়াছিলেন, তিনি তাহা গ্রহণ করেন নাই। কথাটা সত্য কিনা আমরা জানি না। যাহা হউক ভারতের বিদ্যাসাগরকে খেতাবে খাট হইতে দেখিলে আমাদের দুঃখ রাখিবার স্থান থাকিত না। বিদ্যাসাগরের বিদ্যাসাগরত্ব ভুবনবিখ্যাত। গবর্ণমেণ্টের 'মহোমহোপাধ্যায়' কি তার কাছে লাগে? বাঙ্গালার ছেলে বুড়ো বিদ্যাসাগরকে না জানে কে? বিদ্যাসাগরের নাম কোথায় নাই, তাঁতির মাকুতে—কাপড়ের পাড়েও আছে।'[১৩]

বিদ্যাসাগরের রাজসম্মান প্রত্যাখ্যানের এই ঘটনা 'সোমপ্রকাশ' সম্পাদককে ইংলন্ডের প্রধানমন্ত্রী গ্ল্যাডস্টোনের কথা মনে করিয়ে দেয় ঃ

'পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে জুবিলি উপলক্ষে 'মহোমহোপাধ্যায়' উপাধি দিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট অনুরোধ করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি তাহা লইতে অস্বীকার করিয়াছেন। ইহাতে তাহার মনস্বিতার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। এইরূপ আমাদের মহারাণী ভিক্টোরিয়ার প্রধানমন্ত্রী গ্ল্যাডস্টোন সাহেবকে উপাধি দিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি তাহা লইতে অস্বীকার করিয়াছিলেন। আমাদের বিবেচনায় মিঃ গ্ল্যাডস্টোন ও পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এক প্রকৃতির লোক।'[১৪]

বিদ্যাসাগরের সঙ্গে সেকালের আর এক বিরাট ব্যক্তিত্ব মাৎসিনীর সাদৃশ্যও 'নব্যভারত'-সম্পাদকের চোখে পড়েছিল।

বিদ্যাসাগর চরিত্রের বিশেষ কয়েকটি বৈশিষ্ট্য সেকালের বিশিষ্ট কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের চোখে ধরা পড়ে। বিদ্যাসাগরের কথা বলতে গিয়ে 'হুতোম প্যাঁচার গান'-এ তিনি লেখেন ঃ

'উৎসাহে গ্যাসের শিখা, দার্ঢ্যে শালকড়ি,
কাঙ্গাল বিধবাবন্ধু, অনাথের নড়ি।
প্রতিজ্ঞায় পরশুরাম, দাতাকর্ণ দানে
স্বাতন্ত্র্যে সেকুল কাঁটা, পারিজাত ঘ্রাণে।
ইংরেজির ঘিয়ে ভাজা সংস্কৃত ডিস,
টোল স্কুলের অধ্যাপক দুয়েরই ফিনিস।'[১৫]

হেমচন্দ্রের কবিতাটির তির্যকভঙ্গি সহজেই চোখে পড়ে। এর কিছুদিন পরে লিখিত অন্য একটি প্রবন্ধে অজ্ঞাতনামা এক লেখক বিদ্যাসাগরের চরিত্রবৈশিষ্ট্যগুলি সোজাসুজি তুলে ধরার চেষ্টা করেন। বিদ্যাসাগর চরিত্রের বিশেষ যে কয়েকটি দিক প্রবন্ধলেখকের চোখে পড়ে, সেগুলি হল—লোভহীনতা, ভোগস্পৃহাশূন্যতা, একাগ্রতা, আত্মনির্ভরতা, আত্মমর্যাদা, দানশীলতা, স্নেহ-ভালোবাসা ও মনুষ্যত্ব।[১৬] বিদ্যাসাগর চরিত্রের প্রধান সম্পদ যে তাঁর 'অজেয় পৌরুষ অক্ষয় মনুষ্যত্ব' একথা রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে আমরা শুনেছি। বিদ্যাসাগর চরিত আলোচনাকালে বিষয়টির দিকে রবীন্দ্রনাথ সুধীজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তবে বিদ্যাসাগরের এই মনুষ্যত্বের কথা রবীন্দ্রনাথের অনেক আগেই সেকালের কিশোর পত্রিকা 'সখা'র সম্পাদক বলেছিলেন। ১৮৮৫-র অক্টোবরে 'সখা'য় প্রকাশিত বিদ্যাসাগর সম্পর্কিত একটি লেখায় তিনি বলেন, 'ইঁহার ভিতরে যে মনুষ্যত্ব আছে, যে অসাধারণ মহত্ত্ব আছে, আমাদের ভাষায় এমন কোন শব্দ নাই যে, তাহা দ্বারা আমরা তোমাদিগকে ভাঙ্গিয়া বলি।'[১৭] বিদ্যাসাগরের কীর্তিকাহিনীর সঙ্গে অতি ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত শিবনাথ শাস্ত্রীও মনে করতেন, এই মনুষ্যত্বের প্রভাবেই বিদ্যাসাগর 'স্বদেশ ও স্বজাতির অনেক উপরে উঠিয়াছিলেন। যেমন ক্ষুদ্রকায় বনজ গুল্মসকলের মধ্যে

দীর্ঘদেহ শালবৃক্ষ দণ্ডায়মান থাকে, তেমনই সেই পুরুষসিংহ নিজ মহৎ মনুষ্যত্বে স্বসমকালীন জনগণকে বহু নিম্নে ফেলিয়া ঊর্ধ্ব শিরা হইয়া দণ্ডায়মান ছিলেন।'

'পুরুষসিংহ' বিদ্যাসাগরের মহত্ত্ব সম্পর্কে শুধু বাঙালিরাই উচ্ছ্বসিত ছিলেন না, অবাঙালিরাও তাঁর প্রশংসায় ছিলেন পঞ্চমুখ। বিধবাবিবাহ আন্দোলন বাংলায় তেমন সফল না হলেও, বোম্বেতে উল্লেখযোগ্য সাফল্য পায়। বোম্বেবাসীরা বিষয়টির এত অনুরাগী হয়ে ওঠেন যে 'তাঁহারা সময়ের অবস্থা জানিয়া বিধবাবিবাহ যুক্তিসঙ্গত জ্ঞানে বিদ্যাসাগর প্রণীত রচনাসমূহ গুজরটী ও মারাঠি ভাষায় অনুবাদ'[১৮] করতে আরম্ভ করেন। বিষ্ণু পরশুরাম শাস্ত্রীর অনুবাদের সূত্রে উনিশ শতকের ষাটের দশকেই বিদ্যাসাগর হয়ে ওঠেন মারাঠিসমাজের অতি পরিচিতজন। সেইকারণে ১৮৭৩-এর গোড়ার দিকে এক মারাঠি ভদ্রলোক কলকাতায় এসে বিদ্যাসাগরের সঙ্গে দেখা করেন। বিদ্যাসাগরকে দেখে এবং তাঁর সঙ্গে কথা বলে তিনি মুগ্ধ হন। তাঁর মুগ্ধতার বিবরণ 'জ্ঞানপ্রকাশ' নামক একটি মারাঠি কাগজে প্রকাশিত হয়। লেখাটির ইংরেজি অনুবাদ লন্ডনের 'জার্নাল অফ দি ন্যাশনাল ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন' প্রকাশ করে। সেখান থেকে 'হিন্দু পেট্রিয়ট' এটি পুনর্মুদ্রিত করে। এতে ঐ মারাঠি ভদ্রলোক বলেন:

এরকম একটি মানুষ দুর্লভ। ব্যক্তিগত জীবনে সারল্যের প্রতিমূর্তি তিনি—আমাদের মতো মাথা তাঁর কামানো, পায়ে হিন্দুস্তানী জুতো আর পরনে ধুতি-চাদর। প্রকৃত পণ্ডিত তিনি, সংস্কারপ্রয়াস অব্যাহত রাখার জন্য সারাদিন তিনি সংস্কৃত পুঁথিপত্র ঘাঁটেন, ধর্মের ব্যাপারে তিনি উদাসীন। দৃঢ়চেতা, সাহসী সংস্কারক তিনি, প্রকৃত অর্থেই একজন দেশপ্রেমিক। দানের ব্যাপারে তিনি লাগামছাড়া, যদিও এর ফল তিনি সম্প্রতি অনুভব করতে শুরু করেছেন। তাঁর কথার সঙ্গে কাজের কোনো অমিল নেই। আমাদের সঙ্গে তিনি তাঁর কন্যা ও পুত্রবধূর পরিচয় করিয়ে দেন, তাঁর পুত্র যে বিধবাবিবাহ করেছে তাও জানাতে তিনি ভোলেননি। বড় মেয়ের তিনি ১৬ বছর বয়সে বিয়ে দিয়েছেন, তাঁর মেজ মেয়ের ১৪ বছর বয়স হলেও, এখনও তিনি তাঁর বিয়ে দেননি। দুর্ভাগ্যের বিষয়, তাঁর সংস্কারপ্রয়াস সম্পর্কে বাঙালিরা খুব সহানুভূতিশীল নয়। সবকিছুই এখন তাঁকে একা সামলাতে হচ্ছে বলে তিনি তিক্তকণ্ঠে আমাদের কাছে অভিযোগ করেন। তাঁর অনেক বন্ধু বিধবাবিবাহ আন্দোলনকে অর্থসাহায্য করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, কিন্তু অধিকাংশই তাঁদের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেননি। বর্তমানে তিনি কুলীন ব্রাহ্মণদের মধ্যে প্রচলিত বহুবিবাহ প্রথার বিরুদ্ধে সংগ্রামে রত। দলমতনির্বিশেষে কলকাতার মানুষ তাঁকে খুব শ্রদ্ধার চোখে দেখে। যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর তো তাঁকে কলকাতার বাঙালিসমাজের অভিভাবক বলেই মনে করেন। পিতামাতার প্রতি তাঁর ভক্তিশ্রদ্ধা দৃষ্টান্তস্বরূপ। পুস্তকপ্রেম তাঁর চরিত্রের আর এক উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। তাঁর দানশীলতার কাহিনী প্রবাদবাক্যের মতো কলকাতার লোকের মুখে মুখে। দেশের

কাজ করতে গিয়ে ঋণজালে জড়িয়ে পড়ায় বন্ধুরা মাঝেমাঝেই তাঁকে দানের পরিমাণ একটু কমাতে বলেন—কিন্তু এর চিন্তামাত্রই তাঁর হৃদয় বিদীর্ণ হয়। তাঁর সান্নিধ্যে যাঁরাই এসেছেন, তাঁরাই তাঁর চরিত্রের নির্ভীকতা দেখে অভিভূত হয়েছেন। এমন একজন মানুষের দর্শন পেয়ে মুগ্ধ, অভিভূত ঐ মারাঠি ভদ্রলোক লিখলেন :

'He bears the aspect of a venerable Rishi of olden times, and is a true descendant of theirs in learning, in industry, in simplicity of habit (for he does not put even a shirt) and above all in nobility on mind and heart. On that India had a few sons like him, and her tears would be wiped in no long time ! It is a blessing to see the great man.'[১৯]

এই সর্বভারতীয় পরিচিতির জন্যই বিদ্যাসাগরের মৃত্যুর অল্পদিন পরে তাঁর মহিমা কীর্তন করে মহাত্মা গান্ধি গুজরাটিতে একটি প্রবন্ধ লেখেন। এই প্রবন্ধটির ইংরেজি অনুবাদ ১৬ সেপ্টেম্বর, ১৯০৫-এ 'ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়ান' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। মহাত্মা গান্ধির মতে বাঙালি চরিত্রের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। জন্মসূত্রে একজন হিন্দু-ব্রাহ্মণ হলেও, ব্রাহ্মণ-শূদ্র, হিন্দু-মুসলমান সকলেরই প্রতি ছিল তাঁর সমদৃষ্টি। তিনি শুধু বিদ্যারই সাগর নন, করুণারও সাগর। মধুসূদন বিদ্যাসাগরের জীবিতকালে একটি চিঠিতে তাঁর সম্পর্কে যে কথা লিখেছিলেন, মহাত্মা গান্ধির লেখায় যেন তারই প্রতিধ্বনি শুনলাম আমরা।

এই হলেন বিদ্যাসাগর। কিন্তু মনে রাখতে হবে, সমকালে একদিকে যেমন অজস্রধারায় তাঁর ওপর সাধুবাদ বর্ষিত হয়েছে, দানধ্যান ও অন্যান্য নানা কাজের মধ্য দিয়ে তিনি পরিণত হয়েছেন প্রবাদপুরুষে, অন্যদিকে তাঁর কিছুকিছু 'কাজকর্ম' নিয়ে সমকালে প্রশ্ন উঠেছে। অনেকসময় সেসব প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর খুঁজে পাওয়া মুশকিল।

ব্যাপারটার শুরু উনিশ শতকের পঞ্চাশের দশকে। সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হবার পর বিভিন্ন পাঠ্যপুস্তক নির্বাচনের ব্যাপারে সরকার বিদ্যাসাগরের মতামত গ্রহণ করতে আরম্ভ করেন। নিজে একজন পাঠ্যপুস্তক রচয়িতা ও একটি প্রকাশনালয়ের মালিক হওয়া সত্ত্বেও তিনি বিনাদ্বিধায় অন্য প্রকাশনালয়ের পাঠ্যপুস্তক সম্পর্কে মতামত প্রকাশে দ্বিধা করলেন না। নিজে একটি স্কুলপাঠ্য ইতিহাসগ্রন্থের লেখক হওয়া সত্ত্বেও সমকালে প্রকাশিত অন্য একটি ছাত্রপাঠ্য ইতিহাসগ্রন্থ ('সারাবলি', নবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৮৫১) সম্পর্কে বিরূপ মত প্রকাশ করতে তিনি ইতস্তত করলেন না। এই ধরনের মতামত প্রকাশের কালে অনেকসময় তিনি কাঙ্ক্ষিত নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে পারছেন না বলে সমকালে অভিযোগ ওঠে। ব্যাপারটা নিয়ে প্রথম প্রথম গুঞ্জন চলতে থাকে, ব্যাপারটার বহিঃপ্রকাশ ঘটে বিদ্যাসাগর সেকালের দুই

খ্যাতনামা ব্যক্তির বই বাতিল করলে। রংপুর কুন্ডীগ্রামের জমিদার কালীচন্দ্র রায়-চৌধুরী শুধু বিভিন্ন সমাজ-সংস্কার কর্মে উৎসাহী এক জমিদারই ছিলেন না, লেখক হিসাবেও সেকালে তাঁর কিছু নামডাক ছিল। পূর্ববাংলায় প্রথম প্রেস স্থাপনের কৃতিত্ব তাঁরই। 'রঙ্গপুর বার্তাবহ' নামে একটি পত্রিকারও প্রাণপুরুষ ছিলেন তিনি। ১৮৫২-য় কলকাতার চৈতন্যচন্দ্রোদয় প্রেস থেকে তাঁর 'স্বভাবদর্পণ'-এর প্রথম ভাগ প্রকাশিত হয়। বালকদের নীতিজ্ঞান ও ধর্মজ্ঞান শিক্ষা দেবার জন্য ইংরেজি বই অবলম্বনে তিনি এই বইটি রচনা করেন। এটিকে পাঠ্যতালিকাভুক্ত করা যায় কিনা সে সম্পর্কে মতামত দেবার জন্য বইটি বিদ্যাসাগরকে পাঠানো হয়। বিদ্যাসাগর বইটির ভাষা, প্রকাশভঙ্গি ও বিষয়বস্তু সম্পর্কে আপত্তি জানিয়ে এটিকে পাঠ্যপুস্তক করার বিরুদ্ধে মতপ্রকাশ করেন। বইটির ভাষা সম্পর্কে বিদ্যাসাগরের আপত্তি কিছুটা বিভ্রান্তিকর। 'পরমেশ্বর তোমাকে যে এক বুদ্ধিবৃত্তি প্রদান করিয়াছেন তদ্দ্বারা দুরন্ত পশুরাজাকে তোমার পদাবনত করিতে পার'[২০]—১৮৫২ সালে রচিত এই গদ্যরীতিকে দুরূহ বলা যায় কিনা সন্দেহের বিষয়। আসলে বইটির বিষয়বস্তু ঈশ্বর সম্পর্কে অনাগ্রহী বিদ্যাসাগরের পছন্দ হবার কথা নয় এবং সেই কারণেই তিনি সম্ভবত এটিকে বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তক হিসাবে মনোনীত করতে কুণ্ঠাবোধ করেন। ব্যাপারটায় কিছু লোক অসন্তুষ্ট হন। প্রতিক্রিয়া আরো ব্যাপক রূপ নেয়, বিদ্যাসাগর যখন সেকালের আর এক নামকরা সংস্কৃত পণ্ডিত মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশের দুটি বইকে পাঠ্যপুস্তক হিসাবে অনুমোদন করতে অসম্মত হন। মুক্তারাম বিদ্যাসাগরের বিশেষ পরিচিত। সংস্কৃত কলেজে একই সঙ্গে পড়াশোনা করেছিলেন তাঁরা। সংস্কৃত কলেজে পড়া শেষ করে মুক্তারাম কিছুদিন হিন্দু কলেজে এবং পরে কলকাতা মাদ্রাসায় শিক্ষকতা করেন। চাকরিজীবনের শুরু থেকেই তিনি বিভিন্ন ছাত্রপাঠ্য গ্রন্থ রচনা করতে থাকেন। সাহিত্যিক হিসাবে তিনি সেযুগে রীতিমতো খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। ১৮৫৫-য় 'ক্যালকাটা খ্রিশ্চান অবজার্ভার'-এ প্রকাশিত বাংলা সাহিত্য সম্পর্কিত একটি লেখায় তাঁর বিশেষ প্রশংসা করা হয়। ১৮৫২-য় চার্লস ল্যামের 'টেলস ফ্রম শেক্সপিয়র' অবলম্বনে তিনি 'অপূর্বোপাখ্যান' রচনা করেন। এর পরের বছর 'সংবাদ পূর্ণোচন্দ্রোদয়' প্রেস থেকে প্রকাশিত হয় 'আরবীয়োপাখ্যান'-এর প্রথম খণ্ড। দুটি বইকেই স্কুলপাঠ্য করতে চেয়েছিলেন মুক্তারাম। বইদুটি বিদ্যালয়ের ছাত্রদের উপযোগী কিনা সে বিষয়ে সরকার বিদ্যাসাগরের মতামত জানতে চান। বিদ্যাসাগর দুটি বইকেই বালকপাঠের অনুপযোগী বলে ঘোষণা করেন। 'আরবীয়োপাখ্যান'-এর প্রথম খণ্ডের ভাষা দুর্বোধ্য না হলেও 'মধ্যে মধ্যে ভাষার অপবিত্রতা রূপ দোষ' 'সম্বাদ ভাস্কর'-এর সমালোচকের চোখে পড়েছিল।[২১] বইটির কোনো কোনো গল্প রীতিমতো অশ্লীল (যেমন নরসুন্দরের দ্বিতীয় ভাইয়ের কাহিনী)। এইসব কারণেই সম্ভবত বিদ্যাসাগর বইটিকে বালকপাঠের উপযুক্ত মনে করেননি। কিন্তু শেক্সপিয়রের কাহিনী অবলম্বনে রচিত 'অপূর্বোপাখ্যান' সম্পর্কে তাঁর আপত্তির কারণ বোঝা মুশকিল।

মুশকিল বলেই বিদ্যাসাগরের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জানিয়ে 'কস্যচিৎ যথার্থবাদিনঃ' নামান্তরালে জনৈক ব্যক্তি 'সম্বাদ ভাস্কর'-এ একটি চিঠিতে ক্ষোভপ্রকাশ করে লিখলেন :

'বিদ্যাসাগর ভট্টাচার্য্য মহাশয় গবর্ণমেন্টের প্রিয়পাত্র হইয়াছেন তদ্ধেতু মনুষ্যকে মনুষ্য জ্ঞান করেন না একথা সর্বত্র রাষ্ট্র হইয়াছে তিনি ব্যতীত সংসারে বিদ্বান কেহ নাই ইহাই জ্ঞান করিয়া থাকেন ইহা অত্যাশ্চর্য্য বলিতে হইবেক অতএব আমি তাঁহাকে জানাই সাগর থাকিলেই মহাসাগর থাকে ইহা যেন তিনি স্মরণ করিয়া থাকেন। সম্পাদক মহাশয় পণ্ডিতবর শ্রীযুত মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের প্রণীত আরবীয়োপাখ্যান ও সেক্সপিয়র এই উভয় গ্রন্থ উত্তম হইলেও বিদ্যাসাগরের চক্রান্তে তাহা যদিচ সরকারি বিদ্যালয়ে আদরণীয় হইল না তথাপি তাহা পড়িয়া থাকিল না সকল বিদ্বান সমাজে সমাদৃত হইয়াছে এবঙ রঙ্গপুরস্থ কুণ্ড্যাধিপতি শ্রীযুক্ত বাবু কালীচন্দ্র রায়চৌধুরী মহাশয় স্বভাবদর্পণ নামে এক পুস্তক প্রস্তুত করিয়া সরকারি পাঠশালার ছাত্রগণের পাঠার্থে পাঠাইয়াছিলেন তাহাও বিদ্যাসাগর চক্রান্ত করিয়া গবর্ণমেণ্টকে গ্রহণ করিতে দেন নাই এসকল পুস্তকে কি কি দোষার্পণ করেন শুনিতে পাইলে উত্তর দিতে পারি বিদ্যাসাগর বালকবোধের কারণ যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রস্তাব লেখেন তাহা ভিন্ন যেসকল গ্রন্থ শক্ত আশয়ে রচিত হইয়াছে যাহার ভাব পণ্ডিতেরাও সহজে প্রাপ্ত হন না তাহা কি বিদ্যাসাগরের মতে গ্রন্থ বলিয়া গণ্য হইতে পারে না কেবল অশ্বোধাবতি গোঃ শব্দায়তে ইহাই কি ছাত্রগণের পাঠ্য হইয়াছে আপনকার কাগজে বিদ্যাসাগরের বিদ্যাপ্রকাশ দেখিয়া আমারও তুষাশ্রিত পুরাতন অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়াছে তৎপ্রযুক্ত এই পত্রখানী মহাশয়ের সন্নিধানে প্রেরণ করিতেছি।'[২২]

'আরবীয়োপাখ্যান' বিদ্যাসাগর বাতিল করলেও, বইটি সেকালে জনপ্রিয় হয়েছিল। ১৮৫৫-র মধ্যে বইটির ১৫০০ কপি বিক্রি হয়ে যায়।[২৩] মুক্তারামের বই কি বিদ্যাসাগর 'literary jealousy'-র জন্য বাতিল করেছিলেন? কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য জোর দিয়ে বলেছেন 'তাঁহার এই 'literary jealousy' সম্বন্ধে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।' এই ঈর্ষাকাতরতার জন্যই কি তিনি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, নবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্যামাচরণ সরকার প্রভৃতি সকলেরই লেখার খুঁত ধরতে ব্যস্ত ছিলেন? এই ব্যস্ততা মাঝে মাঝে কিরকম অশোভনভাবে আত্মপ্রকাশ করত, বিদ্যাসাগরের একজন অতি স্নেহভাজন ব্যক্তি সে সম্পর্কে একটি কাহিনী আমাদের শুনিয়েছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের 'মৃণালিনী'তে একটি গান আছে—'কণ্টকে গঠিল বিধি, মৃণাল অধমে'। মৃণালে কাঁটা থাকে না, থাকে নালে। ব্যাপারটা নিয়ে বঙ্কিমকে খোঁচা দেবার সুযোগ ছাড়লেন না তিনি। পূর্ণচন্দ্র দে উদ্ভটসাগরকে বিদ্যাসাগর খুব স্নেহ করতেন। একদিন তাঁকে বললেন, 'পূর্ণ', মৃণালের গায়ে কণ্টক হয় না এবং মৃণাল যে নাল হইতে পৃথক বস্তু, তাহার সম্বন্ধে তুই একটা প্রবন্ধ লিখিতে পারিস। বঙ্কিমের মৃণালিনী গ্রন্থের গানটা লইয়া তুই সমালোচনা লিখিতে আরম্ভ কর।'[২৪] প্রবন্ধটি লিখে আনলে তিনি

সেটি দেখে দেন এবং পূর্ণচন্দ্রকে এ-বিষয়ে বেশকিছু তথ্য দিয়ে সাহায্য করেন। সমকালীন অধিকাংশ লেখককে (ব্যতিক্রম হরচন্দ্র ঘোষ ও অক্ষয়কুমার দত্ত) তিনি তাচ্ছিল্যের চোখে দেখতেন। নতুন লেখকরা তাঁকে তাঁদের বই উপহার দিলে তিনি তা খুলেও দেখতেন না। এ সম্পর্কে সমকালীন একটি পত্রিকা মন্তব্য করে : 'অধুনা যাঁহারা বাঙ্গালাভাষায় গ্রন্থ রচনা করেন, তাঁহাদিগের কোনো গ্রন্থ মুদ্রিত হইলেই প্রায় সর্বাগ্রে বিদ্যাসাগর মহাশয়কে একখানি গ্রন্থ উপহার দিয়া থাকেন। কিন্তু লোকে বলে বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহাদিগের রচিত কোন গ্রন্থের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন না।'[২৫] তবে যাঁদের তিনি পছন্দ করতেন, সেইসব লেখকদের বইয়ের কোনো দোষ তাঁর চোখে পড়ত না। হরচন্দ্র ঘোষের কথাই ধরা যাক। শেক্সপিয়রের 'মার্চেন্ট অফ ভেনিস' অবলম্বনে ১৮৫৩-য় তিনি রচনা করেন 'ভানুমতী চিত্তবিলাস'। সরকার বিদ্যাসাগরকে এটির গুণাগুণ যাচাই করতে দেন। হরচন্দ্রের ভাষা অত্যন্ত গুরুগম্ভীর, তার ওপর ভারতচন্দ্রের অনুসরণে নায়ক-নায়িকার মিলনের যে বর্ণনা তিনি দিয়েছেন তা আর যাই হোক, অল্পবয়স্ক ছাত্রদের উপযোগী নয়—

'বসন হইল শেষ, গণিকার হইল বেশ
রতিদেশ হইল দীপ্যমান।
হের যুগ পয়োধর, তোমার প্রখর কর
নখাঘাতে করিল বিক্ষত।
ঝর ঝর ঝরে ঘাম, থর থর কাঁপে ঠাম,
দরদর ডরে অঙ্গ কত।'[২৬]

বইটিতে এই ধরনের অলজ্জ কামলীলার বর্ণনা থাকা সত্ত্বেও, বিদ্যাসাগর এটিকে স্কুল-কলেজের ছাত্রদের উপযোগী মনে করেছেন।

মুক্তারামের বইটি বাতিল করার পেছনে আর একটি সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যায় না। মুক্তারামের বইয়ের প্রকাশক ছিল সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয় প্রেস। এরাও প্রচুর পাঠ্যপুস্তক ছাপত। এদের প্রকাশিত কোনো বইকে ছাড়পত্র দেওয়া মানেই সংস্কৃত প্রেসকে প্রতিদ্বন্দ্বিতার মুখে ফেলা। মনে রাখব, বিদ্যাসাগরের চরিত্রবৈশিষ্ট্য সম্পর্কে কৃষ্ণকমলের সেই বিখ্যাত উক্তি, (বিদ্যাসাগর) **'can not bear a brother near the throne.'**

মুক্তারামের বই বাতিল করা নিয়ে বাদানুবাদের জের পুরোপুরি মিটতে না মিটতে, ১৮৫৭-য় কালিদাস মৈত্রের একটি ভুগোল বই বাতিল করাকে কেন্দ্র করে বিদ্যাসাগরকে রীতিমতো অস্বস্তিকর অবস্থায় পড়তে হয়। ১৮৫৭-র গোড়ার দিকে শ্রীরামপুরের তমোহর প্রেসের মালিক শ্রীনাথ দে কালিদাস মৈত্রের লেখা 'বাষ্পীয় কল ও ভারতবর্ষীয় রেলওয়ে', 'ইলেকট্রিক টেলিগ্রাফ' ও' ভুগোল-বিজ্ঞাপক' এই তিনটি বই পাঠ্যতালিকাভুক্ত করার জন্য সরকারের কাছে পাঠান। বইগুলি সম্পর্কে বিদ্যাসাগরের মতামত জানতে চান সরকার। বিদ্যাসাগর জানান, তিনটি বই-ই এত অশুদ্ধ ও জড়তাগ্রস্ত ভাষায়

লেখা যে এগুলিকে কোনোভাবেই স্কুলপাঠ্য করা যায় না। বইগুলি আসলে ছাত্রদের জন্য নয়, সাধারণ পাঠকদের মুখ চেয়ে লেখা। ভূগোল বইটি সম্পর্কে এর অতিরিক্ত একটি আপত্তি জানিয়ে তিনি বললেন ঃ

'There is in addition another serious objection to this book, in several places it reflects on the notions on this subject as inculcated in the Religious Books of the Hindoos. I cannot, therefore recommend its adoption, as a class book.'[২৭]

সত্যই কালিদাস মৈত্র তাঁর ভূগোল বইতে শাস্ত্রকারদের অনেক উক্তিকে গ্রহণযোগ্য মনে করেননি। ভূমিকায় তিনি বলেন, 'যাঁহারা পূর্বসংস্কার অনুসারে পৃথিবী অচলা জ্ঞান করিয়া থাকেন তাঁহারদিগের সেই সংস্কার নিতান্তই এই প্রথম খণ্ড পাঠে বিলোপ হইবেক।' অনন্ত নাগ মাথার ওপর পৃথিবীকে ধারণ করে আছেন এবং সেই অনন্তকে কূর্ম পৃষ্ঠে বহন করছেন—এসব মতও তিনি তাঁর বইতে খণ্ডন করেন। ব্যাপারটা বিদ্যাসাগরের ভালো লাগেনি বলেই তিনি এ সম্পর্কে আপত্তি জানান। শাস্ত্রবিরোধী মতের অজুহাতে বিদ্যাসাগরের মতো একজন মানুষ একটি পাঠ্য বইকে বাতিল করে দিচ্ছেন, ব্যাপারটা সেকালে অনেকের কাছে বিস্ময়কর বলে মনে হয়েছিল।[২৮] বইটির প্রকাশক শ্রীনাথ দে সরকারকে তার সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার অনুরোধ সম্বলিত পত্রে বিদ্যাসাগরের এই ধরনের মনোভাবকে কটাক্ষ করে লিখলেন ঃ

'The only argument against the book is by Pundit Ishwar Chandra Bidyasagar. He says it is contrary to the Shastras. Is it desired that the School Geography should be in consonance with the Shastras ; should speak of six seas of milk, place Benares in the centre of the earth, and put the earth itself on a tortise back.'[২৯]

শুধু প্রকাশক শ্রীনাথ দে-ই নন, সেকালের বিখ্যাত দৈনিক 'ইংলিশম্যান'ও বিদ্যাসাগরের মনোভাবের তীব্র সমালোচনা করে। ঘটনাটি সম্পর্কে ৪ মার্চ, ১৮৫৮-য় 'ফ্রেন্ড অব ইন্ডিয়া' মন্তব্য করে, বিদ্যাসাগরের মতো একজন মানুষ শাস্ত্রবিরোধী মত প্রকাশিত হয়েছে বলে একটি বই বাতিল করছেন—এটা ভাবা যায় না। ব্যাপারটিতে বিচলিত হয়ে বিদ্যাসাগর 'ইংলিশম্যান' সম্পাদককে একটি চিঠি পাঠিয়ে আত্মপক্ষ সমর্থন করে বললেন, শাস্ত্রবিরোধী মতপ্রকাশের জন্য নয়, বিতর্কিত নানা কথা থাকার জন্যই বইটিকে তিনি ছাত্রপাঠ্য হিসাবে সুপারিশ করেননি। তাছাড়া সাহিত্যগুণ বলতে যা বোঝায়, বইটিতে তা একেবারেই নেই।[৩০] চিঠিটি প্রকাশিত হবার কয়েকদিনের মধ্যেই 'ইংলিশম্যান'-এর এক প্রতিনিধি জানালেন, বিতর্কিত মতপ্রকাশের জন্য নয়, সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত কারণেই বিদ্যাসাগর বইটি বাতিল করেছেন। ভূগোল বইটির লেখক বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ পুস্তকের প্রতিবাদ করে একটি পুস্তিকা লেখেন। আর সেই আক্রোশেই বিদ্যাসাগর তাঁর বইটি বাতিল করে দেন।

অভিযোগটিকে একেবারে অমূলক বলা যায় না। 'বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব'-এর বিরোধিতা করে শ্রীরামপুরের কালিদাস মৈত্র 'পৌর্ণভব খণ্ডনং' লিখেছিলেন। কালিদাস মৈত্রের মতগুলি কেন গ্রহণযোগ্য নয়, তা নিয়ে বিধবাবিবাহ—দ্বিতীয় পুস্তকে বিদ্যাসাগর আলোচনাও করেন। তা করার পরও বিধবাবিবাহ বিষয়ে কালিদাস মৈত্রের মনোভাব বদলায়নি। তাই তিনি তাঁর 'বাষ্পীয় কল ও ভারতবর্ষীয় রেলওয়ে' বইটিতে কলকাতার কথা বলতে গিয়ে লেখেন, '১৮৫৫ সনে হিন্দু বিধবাদিগের বিবাহ হওয়া উচিত বলিয়া একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক প্রকাশ হইয়াছে। কিন্তু এটি কিন্তুর বিষয়।' বিধবাবিবাহ সম্পর্কে কালিদাস মৈত্রের এই ধরনের মতামতের জের হিসাবেই কি বিদ্যাসাগর তাঁর বইগুলি বাতিল করে দিয়েছিলেন? বইগুলির ভাষা সম্পর্কে বিদ্যাসাগরের অভিযোগ মেনে নেওয়া কঠিন। একটু উদাহরণ দেওয়া যাক। শ্রীরামপুরের বিবরণ দিতে গিয়ে কালিদাস মৈত্র লেখেন, 'এই মহাত্মারা ১৮১৮ সনে এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা ব্যয় করিয়া শ্রীরামপুরে শ্রীরামপুর কালেজ' নামক বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন।…এই বিদ্যালয়ে চল্লিশ হাজার

জিওগ্রাফি

বা

ভূগোল-বিজ্ঞাপক।

(চারিখণ্ডে বিভক্ত)

---

১ খণ্ড।

শ্রীযুত বাবু শ্রীনাথ দে চতুর্ধুরিণের

অনুমত্যনুসারে

শ্রীরামপুর নিবাসি শ্রীকালিদাস মৈত্র প্রণীত।

শ্রীরামপুরের "তমোহর" যন্ত্রালয়ে

[illegible] স্টর্ন সাহেবকর্তৃক মুদ্রিত হইল।

সন ১২৬৩ সাল

ভূমিকা।

শ্রীরামপুরনিবাসি বিদ্যোৎসাহি শ্রীমান বাবু শ্রীনাথ দে চতুর্ধুরিন্ মহাশয়ের এইরূপ সংকল্প যে ইংরাজি বিজ্ঞান কাণ্ড ও সাহিত্যহইতে নানা বিষয় প্রচলিত বঙ্গীয় ভাষায় সঙ্কলন করত পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন। তন্মধ্যে "বাষ্পীয় কল ও ভারতবর্ষীয় রেলওয়ে" নামক এক খণ্ড পুস্তক ও "ইলেকট্রিক টেলিগ্রাফ বা তড়িৎ বার্ত্তাবহ প্রকরণ" নামক আর এক খণ্ড পুস্তক বাঙ্গলা ভাষায় প্রকাশ হইয়াছে। সম্প্রতি এই ভূগোল-বিজ্ঞাপক-নামক পুস্তক এক খণ্ড প্রকাশ হইল। এই পুস্তক চারি খণ্ডে সম্পূর্ণ হইবেক। ঐ চারি খণ্ডে ভূগোলসম্বন্ধীয় যাবতীয় প্রয়োজনীয় বিষয় প্রকাশ করা যাইবেক। প্রত্যেক খণ্ডে বিষয় বিশেষের বিশেষ বিবরণ লিখিত হইবে।

এই প্রথম খণ্ড ভূগোল-বিবরণে কেবল পৃথিবীর আকার প্রকার ও গতির বিষয় বিলক্ষণমতে সাধ্যানুসারে লিখিত হইয়াছে। যাঁহারা পূর্ব্ব সংস্কার অনুসারে পৃথিবী অচলা জ্ঞান করিয়া থাকেন তাঁহারদিগের সেই সংস্কার নিতান্তই এই প্রথম খণ্ড পাঠে বিলোপ হইবেক অনুমান হইতেছে ইতি।

শ্রীরামপুর।
১৮৫৭ সাল ২ জানুআরি। শ্রীকালিদাস শর্ম্মণঃ।

যে বইটি সম্পর্কে বিদ্যাসাগরের কিছু মন্তব্যকে কেন্দ্র করে একসময় প্রতিবাদের ঝড় উঠেছিল, সেই বইটির আখ্যাপত্র ও ভূমিকা

খণ্ড নানাজাতীয় পুস্তক ছিল, অনবধানতাপ্রযুক্ত অধিকাংশ নষ্ট হইয়া গিয়াছে।' এই গদ্যরীতিকে বিদ্যাসাগর বললেও 'inaccurate and clumsy' বলে মেনে নেওয়া কঠিন। ভূগোল বইটি সম্পর্কে বিদ্যাসাগরের বিরূপতার আর একটি কারণও উড়িয়ে দেওয়া যায় না। বিদ্যাসাগর সংস্কৃত প্রেস থেকে 'ভূগোল বিবরণ' নামে একটি বই প্রকাশ করেছিলেন। এটি খুব ভালো চলত। কালিদাসের ভূগোল বইটিকে পাঠ্যপুস্তক হিসাবে ছাড়পত্র দিলে 'ভূগোল বিবরণ'-এর বাজার সঙ্কুচিত হয়ে পড়বে – বিদ্যাসাগর কি তাই মনে করেছিলেন? যাই হোক 'ইংলিশম্যান'-এর প্রতিনিধির অভিযোগের কোনো জবাব কিন্তু বিদ্যাসাগর দিতে পারেননি।

'ইংলিশম্যান'-এর প্রতিনিধির এই অভিযোগ সত্য হোক বা না হোক, এই সময়ই পাঠ্যবইয়ের দাম বাড়িয়ে মাত্রাতিরিক্ত লাভ করার একটি অভিযোগ তাঁর সম্পর্কে শোনা যেতে থাকে। এই অভিযোগ কতখানি যুক্তিযুক্ত তা বোঝার জন্য একটু পূর্বকথা জানা দরকার। সংস্কৃত কলেজে অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি হিসাবে কাজ করার সময় বিদ্যাসাগর ও মদনমোহন তর্কালঙ্কারের যৌথ উদ্যোগে একটি কাঠের প্রেস ও টাইপ কেনা হয়। প্রেসটির নাম দেওয়া হয় সংস্কৃত প্রেস। বিদ্যাসাগর ও মদনমোহন ছিলেন এই প্রেসের সমান অংশের অধিকারী। প্রেসটি কেনার জন্য নীলমাধব মুখোপাধ্যায়ের কাছ থেকে ৬০০ টাকা ধার নেওয়া হয়। অল্পদিনের মধ্যেই মদনমোহন সম্পাদিত 'অন্নদামঙ্গল' বিক্রি করে এই ঋণ শোধ করা হয়। সংস্কৃত প্রেসের সঙ্গে বই বিক্রির জন্য খোলা হয় সংস্কৃত প্রেস ডিপোজিটরি। এখানে নিজেদের ও অন্য লেখকদের বই বিক্রির জন্য জমা থাকত। উনিশ শতকের প্রথমার্ধেই পাঠ্যপুস্তক রচয়িতা হিসাবে বিদ্যাসাগরের নাম ছড়িয়ে পড়ে, দিন দিন তাঁর খ্যাতি ও বইয়ের চাহিদা বাড়তে থাকে। বিদ্যাসাগরের সব বই সংস্কৃত প্রেস থেকে বেরোত। শুধু তাই নয়, একালের অন্যান্য বিশিষ্ট লেখকদের বইগুলিও এখান থেকে প্রকাশিত হতে লাগল। ফলে পাঠ্যপুস্তক প্রকাশের ক্ষেত্রে সংস্কৃত প্রেস ক্রমেই অপ্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠতে থাকে, তার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় সরকারি সাহায্যপুষ্ট স্কুল বুক সোসাইটি পিছিয়ে পড়তে থাকে। সুলভ মূল্যে ছাত্রপাঠ্য বিভিন্ন বই প্রস্তুত ও প্রকাশই সোসাইটির একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল না, দুঃস্থ ছাত্রদের জন্য বিনামূল্যে এইসব বই তাঁরা বিদ্যাকেন্দ্রগুলিকে সরবরাহও করতেন।

একদিকে ব্যবসা যখন জমে উঠছে, অন্যদিকে তখন মদনমোহনের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের সম্পর্কও হয়ে উঠেছে তিক্ত থেকে তিক্ততর। বিদ্যাসাগর দেখলেন, এইরকম তিক্ততা নিয়ে দুজনের একত্রে ব্যবসা চালানো মুশকিল। তাই তিনি শ্যামাচরণ দে-কে দিয়ে তর্কালঙ্কারের কাছে প্রস্তাব পাঠালেন, হয় তিনি বিদ্যাসাগরকে তাঁর প্রাপ্য বুঝিয়ে দিয়ে প্রেসের পুরো অংশ কিনে নিন, অথবা তাঁর অংশ বিদ্যাসাগরকে বেচে দিন। মদনমোহন নিজের অংশ বিদ্যাসাগরকে বিক্রি করে দিতে রাজি হলেন। তারানাথ তর্কবাচস্পতি, শ্যামাচরণ দে ও রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়ে গঠিত একটি সালিশি

কমিটি কার কি পাওনা—তাও ঠিক করে দিলেন। কিন্তু ব্যাপারটির চূড়ান্ত ফয়সলা হবার আগেই মদনমোহনের মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যুর অল্পদিন পরে সমস্ত পাওনা-গণ্ডা বুঝিয়ে দিয়ে মদনমোহনের স্ত্রীর কাছ থেকে বিদ্যাসাগর প্রেসের বাকি অর্ধাংশ কিনে নিলেন। ফলে এইসময় থেকে সংস্কৃত প্রেসের মালিকানা পুরোপুরি বিদ্যাসাগরের হাতে চলে এল। আসার পর ব্যবসার সম্প্রসারণ ঘটল, বাংলা পাঠ্যপুস্তক প্রকাশনার ক্ষেত্রে তাঁর কারবার প্রায় একচেটিয়া হয়ে দাঁড়াল।

সংস্কৃত প্রেসের বইয়ের দাম এমনিতেই ছিল একটু বেশি (উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, বিদ্যাসাগর মার্শম্যানের 'হিস্ট্রি অব বেঙ্গল'-এর যে অনুবাদ প্রকাশ করেন, তার পেপার ব্যাক সংস্করণের দামই ছিল দু'টাকা, অথচ ১৮৫৩-য় স্কুল বুক সোসাইটি থেকে মার্শম্যানের 'হিস্ট্রি অব বেঙ্গল'-এর যে অনুবাদটি প্রকাশিত হয়, তার বাঁধাই সংস্করণের দাম মাত্র ১২ আনা), বাজারে এইসব বইয়ের বিপুল চাহিদা লক্ষ্য করে বিদ্যাসাগর এই দাম আরো বাড়িয়ে দিলেন। ব্যাপারটা শিক্ষাবিস্তারে আগ্রহী মানুষদের চোখ এড়াল না। এইসময়ই সরকার বিভিন্ন ধরনের বাংলা স্কুলের উন্নতির জন্য কি কি ব্যবস্থা নেওয়া দরকার, তা খতিয়ে দেখার জন্য একটি কমিটি গঠন করলেন। এই কমিটির সদস্যারা হলেন উড্রো, লং, চ্যাপমান, হ্যান্ড, রজার্স, হজসন প্রাট ও বিদ্যাসাগরের ঘনিষ্ঠ বন্ধু প্যারীচরণ সরকার। কয়েকটি বৈঠকে মিলিত হবার পর কমিটির সম্পাদক রজার্স ৪ নভেম্বর, ১৮৫৬-য় বিদ্যাসাগরকে একটি চিঠিতে জানালেন: 'The Committee are of opinion···that the price of the Books published under your direction has all along been higher than was desireable and it is therefore with great regret that they learn from the accompanying letter from the Secretary to the School Book Society, that you have lately raised the prices of those Books still higher.' তাই কমিটির পক্ষ থেকে বিদ্যাসাগরকে বাংলা স্কুলের পাঠ্য-বইগুলির দাম কমানোর অনুরোধ করা হল।

এ ধরনের চিঠি পেয়ে বিরক্ত হলেন বিদ্যাসাগর। কমিটিকে তিনি জানিয়ে দিলেন, তাঁর নিজের এবং অন্যদের যেসব বই তিনি প্রকাশ করেছেন, তার দাম অনেক বিবেচনা করেই স্থির করা হয়েছে। এই দাম বেশিও নয়, অন্যায্যও নয়। তাই বইয়ের দাম কমানোর কোনো ব্যবস্থা করা সম্ভব নয়, তবে কমিটি ইচ্ছা করলে তাঁর বইগুলি বাদ দিয়ে অন্য পুস্তক প্রকাশের ব্যবস্থা করতে পারেন।

বিদ্যাসাগরের চিঠি পেয়ে কমিটি রীতিমতো চিন্তায় পড়ে গেলেন। রাতারাতি লোক লাগিয়ে বই লিখিয়ে প্রকাশ করা তো মুখের কথা নয়। আর প্রকাশ করা গেলেও, তার মান বিদ্যাসাগরের বইয়ের কাছাকাছি যেতে পারবে না। তাই সরকারের তরফ থেকে বিদ্যাসাগরকে অনুরোধ করা হল, সংস্কৃত প্রেসের কিছু বইয়ের স্বত্ব যদি তিনি স্কুল বুক সোসাইটির হাতে তুলে দেন, তাহলে সরকারের পক্ষে সুলভমূল্যে পুস্তক

প্রকাশ করে জনশিক্ষা বিস্তারের কাজ ত্বরান্বিত করা সম্ভব হবে। বিদ্যাসাগর কিন্তু স্পষ্টভাষায় জানিয়ে দিলেন, সংস্কৃত প্রেসের কোনো বইয়ের স্বত্বই স্কুল বুক সোসাইটির হাতে তুলে দেওয়া সম্ভব নয়। তবে বইয়ের দাম কমানো সম্পর্কে অনেক ভেবেচিন্তে একটি প্রস্তাব তিনি সরকারের বিবেচনার জন্য পাঠালেন। তিনি জানালেন, বাংলা স্কুলগুলিতে দু'বছরে যত বই লাগে তা যদি একসঙ্গে ছাপান যায়, তাহলে লাভ না কমিয়েও দাম কমানো যায়। তবে এ কাজ করার জন্য প্রচুর টাকা প্রয়োজন। এই টাকাটা সরকার যদি তাঁকে অগ্রিম দেন, তাহলে অনায়াসেই ব্যাপারটা কার্যকর হতে পারে। এই চিঠির সঙ্গে সংস্কৃত প্রেসের ১৫টি বই (বর্ণপরিচয় ১ম ভাগ, বর্ণপরিচয় ২য় ভাগ, শিশুশিক্ষা ৩য় ভাগ, বোধোদয়, নীতিবোধ, বাংলার ইতিহাস, চারুপাঠ ১ম ভাগ, চারুপাঠ ২য় ভাগ, ভুগোল বিবরণ, নীতিসার ১ম ভাগ, নীতিসার ২য় ভাগ, পাটিগণিত, পদার্থবিদ্যা ১ম ভাগ, ব্যহ্যবস্তু ১ম ভাগ ও বাহ্যবস্তু ২য় ভাগ) প্রকাশের জন্য অগ্রিম কত টাকা প্রয়োজন এবং টাকা পেলে কোন্ বইয়ের দাম কত কমানো হবে (যেমন চারুপাঠ ১ম ভাগের দাম ৬ আনার জায়গায় হবে ৪ আনা) তারও একটা হিসাব তিনি সরকারের কাছে পেশ করলেন।[৩১] বিদ্যাসাগরের এই প্রস্তাব সম্পর্কে স্কুল পরিদর্শকদের মতামত জানতে চাইলেন সরকার। রবিনসন ও রোয়ার বিদ্যাসাগরের প্রস্তাবের অনুকূলে মত দিলেন, লজ বিরোধিতা করলেন। উড্রো বললেন, প্রস্তাবটি মন্দ নয়, তবে বিদ্যাসাগর যে ১৫টি বই প্রকাশের জন্য অগ্রিম চেয়েছেন, তার মধ্যে ৮টির জন্য অর্থ মঞ্জুর করলেই যথেষ্ট। উড্রোর মতটিই সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য মনে হওয়ায় সরকার ৩০. ৩. ১৮৫৮-য় বিদ্যাসাগরকে 'বর্ণপরিচয়' ১ম ভাগ, 'বর্ণপরিচয়' ২য় ভাগ, 'শিশুশিক্ষা' ৩য় ভাগ, 'বোধোদয়', 'নীতিবোধ', 'বাংলার ইতিহাস', 'ভুগোল বিবরণ' ও 'পাটিগণিত'—এই ৮টি বই প্রকাশ করার জন্য অগ্রিম অর্থবরাদ্দ হিসাবে ৭,১৫৬ টাকা ১২ আনা মঞ্জুর করলেন। অগ্রিম এই অর্থ নিয়ে বিদ্যাসাগর বইগুলি ছাপলেন এবং পূর্ব প্রতিশ্রুতি মতো দামও কিছুটা কমিয়ে দিলেন। বইগুলি বিক্রি হবার সঙ্গে সঙ্গে সরকারি ঋণ বিদ্যাসাগর পরিশোধ করে দিলেন। ফলে পরের বছর পুস্তক প্রকাশের জন্য আবার ৮,২০৩ টাকা ২ আনা অগ্রিম হিসাবে সরকারের কাছ থেকে পেতে তাঁর কোনো অসুবিধা হল না।

এইকালেই স্কুলপাঠ্য পুস্তক বেচে বিদ্যাসাগরের অধিক লাভ করার প্রবণতাকে রীতিমতো কটাক্ষ করলেন উড্রো। ১৮৫৮ সালের রিপোর্টে তিনি বললেন: গত পাঁচ বছরে বাংলা বইয়ের বিক্রি অনেক বেড়ে গেছে এবং ক্রমেই তা আরো বেড়ে চলেছে। গত বছর ধর্মগ্রন্থ বাদে ৫,৯০,০০০ কপি বাংলা বই ছাপা হয়েছে। বোঝাই যাচ্ছে, পুস্তক রচনা ও প্রকাশ এখন অত্যন্ত লাভজনক এক ব্যবসা। এই কারণেই সাম্প্রতিক কালে বাঙালি গ্রন্থকাররা তাঁদের গ্রন্থস্বত্ব সম্পর্কে হয়ে উঠেছেন অতি সচেতন। সংস্কৃত প্রেস তো খোলাখুলি সরকারকে জানিয়ে দিয়েছে তাদের প্রকাশিত কোনো বইয়ের কপিরাইট তারা সরকারকে বিক্রি করতে আগ্রহী নয়। সাম্প্রতিককালে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

তদনুসারে কার্য্য করিতেন। কেহই তাঁহাকে তাহা হইতে বিচলিত বা পশ্চাৎপদ করিতে পারিতেন না।'[৪১] এজন্য প্রয়োজন হলে অতি ঘনিষ্ঠ বন্ধুর সঙ্গে দুর্ব্যবহার করতেও কুণ্ঠিত হতেন না। একটা ঘটনার কথা বলি—

মদনমোহন তর্কালঙ্কার একবার কঠিন রোগাক্রান্ত হয়ে পড়লে বিদ্যাসাগর তাঁকে দেখতে যান। বিদ্যাসাগরকে দেখে নিজের অসহায় অবস্থার কথা চিন্তা করে তর্কালঙ্কারের স্ত্রী কাঁদতে কাঁদতে স্বামীকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'আপনি ত চললেন। আমার অবস্থা কি হবে?' বিদ্যাসাগর বন্ধুপত্নীর দুঃখে দুঃখিত হয়ে বললেন, 'মদন! তোমার শিশুশিক্ষা (৩ ভাগ) বইখানা আমাকে দাও। আমি তোমার ব্রাহ্মণীকে ৫০ টাকা করে মাসোহারা দেব।' মদনমোহন হৃষ্টচিত্তে বললেন, 'ভাই ঈশ্বর, আমার ব্রাহ্মণী রইলেন। তুমিই এর ভরণপোষণ কর।' বিদ্যাসাগর সেদিনই একখানি 'শিশুশিক্ষা' এনে ছাপতে আরম্ভ করলেন। বইও ছাপা হল, ওদিকে মদনমোহনও সুস্থ হয়ে উঠলেন। মদনমোহনের প্রভাতবর্ণনায় ছিল 'মধুকর মধুলোভে আসিয়া জুটিল', বিদ্যাসাগর তা কেটে করলেন 'পরিমল লোভে অলি আসিয়া জুটিল।' দেখে অবাক হয়ে মদনমোহন বন্ধুকে বললেন, 'ঈশ্বর আমার পাঠ বিশুদ্ধ ছিল, তুমি তা কেটে অশুদ্ধ করলে কেন? তুমি 'অমরকোষে'র মাথা খেয়েছ। মনে পড়ে নাকি 'বিমর্দ্দোত্থে পরিমলো গন্ধে জনমনোহরে'। ঘর্ষণজনিত সুগন্ধকেই পরিমল বলে। পরিমল শব্দের অর্থ মধু কোথায় পেয়েছ?' একথা শুনে ক্রোধে অন্ধ হয়ে বিদ্যাসাগর বললেন, 'মদন! তুমি যখন এই বইখানা আমাকে দিয়েছ, তখন আমার যা ইচ্ছা তাই করতে পারি।' বিদ্যাসাগরের মুখে এরকম অসঙ্গত কথা শুনে 'স্নিগ্ধমতি' মদনমোহন অবাক হয়ে গেলেন। ঘটনাটি সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বিদ্যাসাগরের একান্ত স্নেহভাজন পূর্ণচন্দ্র দে উদ্ভটসাগর লিখেছেন, 'মদনমোহন মহাশয়ের পাঠ বিশুদ্ধ ও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পাঠ অশুদ্ধ। ঘর্ষণজনিত সুগন্ধের নাম 'পরিমল'। 'মধু' অর্থে পরিমল শব্দের ব্যবহার সংস্কৃত মহাকাব্যে দেখিতে পাওয়া যায় না। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মধু অর্থে পরিমল শব্দের ব্যবহার ততটা যুক্তিসঙ্গত হয় নাই।…এখন শিশুশিক্ষার বয়স ৮০ বৎসর। প্রায় ৫৪ বৎসর হইতে এই দুষ্ট পাঠ চলিয়া আসিতেছে।'[৪২]

'শিশুশিক্ষা'র গ্রন্থস্বত্ব যদি এইভাবে বিদ্যাসাগরের হাতে এসে থাকে, তাহলে বলার কিছু নেই। তবে 'শিশুশিক্ষা'র গ্রন্থস্বত্ব নিয়ে একসময় রীতিমতো বাদানুবাদের সৃষ্টি হয়েছিল। এই পুস্তকের স্বত্ব আসলে মদনমোহনের কন্যাদের প্রাপ্য—এই মর্মে ১৮৭১-এ মদনমোহনের ছোট মেয়ে মালতীমালার স্বামী যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ বিদ্যাসাগরকে উকিলের চিঠি দেন। বিষয়টি নিষ্পত্তি হয়ে যাবার অনেকদিন পরও, 'যোগেন্দ্রনাথ বাবুর আরোপিত দোষের উল্লেখ' করে 'অনেক মহাত্মা' বিদ্যাসাগরকে 'নরকে নিক্ষিপ্ত' করার চেষ্টা করলে তিনি ব্যথিত হন। যোগেন্দ্রনাথের অভিযোগগুলি যে নিতান্ত অসঙ্গত তা দেখানোর জন্য 'কতিপয় আত্মীয়ের অনুরোধ পরতন্ত্র' হয়ে

বিদ্যাসাগর ১৮৮৮-তে 'নিষ্কৃতিলাভপ্রয়াস' রচনা করেন। 'নিষ্কৃতিলাভপ্রয়াস' অবশ্য সকলকে সন্তুষ্ট করতে পারেনি। তাই বিদ্যাসাগরের বক্তব্যগুলি যে ঠিক নয়, তা দেখাতে ১৮৯০-এ যোগেন্দ্রনাথ রচনা করেন 'নিষ্কৃতিলাভপ্রয়াস বিফল'। এই বইটি বিদ্যাসাগরের জীবিতকালে প্রকাশিত হলেও, বিদ্যাসাগর তার কোনো জবাব দিতে পারেননি। এই বইটি দেখার সুযোগ আমাদের হয়নি, তাই যোগেন্দ্রনাথ কিভাবে বিদ্যাসাগরের বক্তব্যকে খণ্ডন করেছিলেন বলা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়।

আসলে বিদ্যাসাগর চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল তাঁর একগুঁয়েমি বা জেদ। এই একগুঁয়েমি বা জেদ তিনি পারিবারিক সূত্রে লাভ করেছিলেন। তাঁর পিতামহ রামজয় তর্কভূষণ অত্যন্ত জেদী ছিলেন, 'সকল বিষয়ে, স্বীয় অভিপ্রায়ের অনুবর্তী হইয়া চলিতেন, অনদীয় অভিপ্রায়ের অনুবর্তন তদীয় স্বভাব ও অভ্যাসের সম্পূর্ণ বিপরীত ছিল।' বিদ্যাসাগর তাঁর আদর্শ পুরুষ রামজয়ের এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যটি উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করে ছেলেবেলা থেকেই হয়ে ওঠেন অত্যন্ত জেদী ও একগুঁয়ে। যে কারণে তাঁর বাবা বলতেন, 'বাবাজি আমার ক্রমে এঁড়ে গরু অপেক্ষাও একগুঁইয়া হইয়া উঠিতেছেন।' পরবর্তীকালে জীবনে প্রতিষ্ঠা পাবার পথে তাঁকে অনেক বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। এইসব বাধা তিনি অতিক্রম করেছিলেন একক প্রয়াসে। এইসব কারণে যে-কোনো ব্যাপারেই তিনি নিজের মতকেই চূড়ান্ত বলে মনে করতেন। বিধবা-বিবাহ সম্পর্কে তাঁর মনোভাব প্রসঙ্গত স্মরণীয়। বিধবাবিবাহ প্রবর্তনকে তিনি তাঁর জীবনের 'সর্বপ্রধান সৎকর্ম' মনে করতেন, এ-কাজে সফল হবার জন্য সবকিছু করতে তিনি ছিলেন প্রস্তুত। অথচ নিজের জেদ বজায় রাখার জন্য দু'একটি 'শাস্ত্রসম্মত ও ন্যায়ানুগত' বিধবাবিবাহের বিপক্ষে দাঁড়াতেও তিনি কুণ্ঠাবোধ করেননি। মুচিরাম-মনোমোহিনীর বিবাহের ঘটনাটি প্রসঙ্গত স্মরণীয়। মুচিরাম বন্দ্যোপাধ্যায় নামে এক স্কুল শিক্ষক মনোমোহিনী নামে একটি বিধবাকে বিয়ে করতে মনস্থ করেন। এ বিয়ে বন্ধ করার জন্য ক্ষীরপাই-এর হালদাররা বিদ্যাসাগরের শরণ নেন। বিদ্যাসাগরকে তাঁরা বলেন, 'মুচিরাম আমাদের ভিক্ষাপুত্র, সে বিধবাবিবাহ করলে আমরা খুব দুঃখ পাবো।' বিদ্যাসাগর তাঁদের কথা দেন যে তিনি এই বিয়ের সংস্রবে থাকবেন না এবং এই বিয়েও হবে না। এই বিয়েতে বিদ্যাসাগরের ভাইরা উল্লেখযোগ্য এক ভূমিকা গ্রহণ করেন। হালদার বাবুদের সামনেই বিদ্যাসাগরের ছোট ভাই ঈশানচন্দ্র তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, 'শাস্ত্রানুসারে এই বিবাহ দেওয়া বিধেয় কিনা?' উত্তরে বিদ্যাসাগর বলেন, 'ইহা শাস্ত্রসম্মত ও ন্যায়ানুগত বলিয়া আমি স্বীকার করি।'[৪৩] স্বীকার করেও, নিজের জেদ বজায় রাখার জন্য তিনি এই বিষয়ের বিরোধিতা করতে থাকেন। বিদ্যাসাগরের আপত্তিকে গুরুত্ব না দিয়ে তাঁর ভাইরা এই বিবাহ দেন। 'বিধবাবিবাহ প্রবর্তক' বিদ্যাসাগর তাঁর ভাইরা 'শাস্ত্রসম্মত ও ন্যায়ানুগত' একটি বিধবাবিবাহে অংশ নেওয়ায় মর্মাহত হয়ে গ্রামের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছেদ করেন। বিদ্যাসাগরের এই আচরণ এটাই প্রমাণ করে যে নিজের জেদটাই ছিল তাঁর কাছে সবচেয়ে বড়। অন্যের

মতামতকে গুরুত্ব দেবার মতো মানসিকতা তাঁর ছিল না। কোনোরকম সমালোচনা তিনি সহ্য করতে পারতেন না। পরমত অসহিষ্ণুতা কোনো-কোনো ক্ষেত্রে তাঁর আচরণকে অকল্পনীয় কঠোর করে তুলত। মেট্রোপলিটান স্কুল সংক্রান্ত একটি ঘটনার কথা প্রসঙ্গত স্মরণ করতে পারি।

পড়াতে গিয়ে ছেলেদের মারধোর করা বিদ্যাসাগর একেবারেই পছন্দ করতেন না। তাঁর প্রতিষ্ঠিত মেট্রোপলিটান স্কুলে ছাত্রদের বেত মারা ছিল নিষিদ্ধ। একবার এই স্কুলের এক শিক্ষক ছাত্রদের গায়ে হাত তোলায় তিনি সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে কর্মচ্যুত করেন। ঐ স্কুলের কয়েকজন শিক্ষক তাঁর এই কাজের প্রতিবাদ জানালে, তাঁদেরও সঙ্গে সংগে পদচ্যুত করতে তিনি ইতস্তত করলেন না। 'সমাজদর্পণ' নামে সমকালীন একটি পত্রিকা বিদ্যাসাগরের এই ধরনের আচরণের সমালোচনা করে লেখে ঃ

'বিদ্যাসাগর যেরূপ কথায় কথায় কোপ করিয়া থাকেন, বিদ্যাসাগর যেরূপ অপরাধীর অনুসরণ করিয়া থাকেন, বিদ্যাসাগর যেরূপ কর্মচারীদিগকে ডিসমিস করিয়া থাকেন আমরা বাঙ্গালাদেশে সেরূপ আর কাহাকে দেখিতে পাই না···একজন কর্মচারী একজন বালককে প্রহার করিয়াছে বিদ্যাসাগর তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে পদচ্যুত করিলেন। আর ছয়জন শিক্ষক তাহার প্রতিবাদ করিতে সাহস করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকেও তৎক্ষণাৎ ডিসমিস করা হইল। কেহবা সপরিবারে বাস করিতেছিলেন, কেহ বা ঋণজালে জড়িত হইয়া বাস করিতেছিলেন। বিদ্যাসাগর কাহাকেই প্রস্তুত হইতে অবসর দিলেন না। সকলকেই এক মুহূর্তে ডিসমিস হইতে হয়।···একজন লোককে ডিসমিস করিতে হইলে গবর্ণমেণ্ট কত অনুসন্ধান, কত পরিশ্রম ও কত সময় ব্যয় স্বীকার করিয়া থাকেন, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কর্মচারীরা কর্তৃপক্ষের সম্মুখে ক্রন্দন করিয়াই কতবার পুনর্নিযুক্ত হইতে পারিয়াছে। কিন্তু বিদ্যাসাগরের অনুকম্পা নাই, পরামর্শ নাই। বিদ্যাসাগর যে অপরাধীর কিরূপ অনুসরণ করেন এবং কিরূপ প্রাকৃতজনের ন্যায় যে ক্রোধদ্বেষ প্রকাশ করিয়া ফেলেন তাহা বিদ্যাসাগরের সংসারে বাস করিয়াছেন ও বিদ্যাসাগর যে সকল সমাজে বিচরণ করেন, তাহাদের পরিচয় করিয়াছেন তাঁহারা ও বিদ্যাসাগরের বর্তমান পক্ষপাতী সোমপ্রকাশ মহাশয়ই অবগত আছেন।'[৪৮]

'সমাজদর্পণ'-এর সম্পাদক যশোদানন্দন সরকার পত্রিকার পরবর্তী একটি সংখ্যায় ভুদেব মুখোপাধ্যায়ের সংগে বিদ্যাসাগরের একটি তুলনামূলক আলোচনা প্রকাশ করেন। আলোচনাটিতে লেখকের বিদ্যাবত্তার পরিচয় পেয়ে অনেকে মুগ্ধ হন। এতে বিদ্যাসাগর সম্পর্কে অভিযোগ করে তিনি বলেন, 'বিদ্যাসাগর ধনলোভী না হলেও যশোলোভী, এ-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।' বিদ্যাসাগর সম্পর্কে এ ধরনের অভিযোগ শুধু 'সমাজদর্পণ'-সম্পাদকই করেননি, এর আগেও একাধিকজন এই অভিযোগে বিদ্যাসাগরকে অভিযুক্ত করেছিলেন, তার পরিচয় আমরা আগে পেয়েছি। বিদ্যাসাগর সম্পর্কে 'সমাজদর্পণ'-এর এই অভিযোগ পুরোপুরি মেনে নিতে না পেরে সেকালের বিশিষ্ট পত্রিকা 'ভারত সংস্কারক' লেখে ঃ

'বিদ্যাসাগর সাধারণের হিতকল্পে অনেক কার্য্য করিতেছেন, যশস্পৃহা হইতেও এ প্রকার কার্য্য উৎপন্ন হইতে না পারে, এমত নহে। কিন্তু বিদ্যাসাগর যে কেবল যশস্পৃহা দ্বারাই সৎকার্য্যে প্রবর্তমান কে বলিবে? আমরা তাঁহার বিষয়ে যতদূর জানি অনেক সময় দেখিয়াছি, তাঁহার স্বাভাবিক দয়াবৃত্তি এত প্রবল যে তাহা আপনা হইতে তাঁহাকে কার্য্যে প্রবর্তিত করে, তাহাতে তাঁহার লাভ হইবে কি ক্ষতি হইবে, নিন্দা হইবে কি প্রশংসা হইবে বিচার করিতে দেয় না। ইহা যদি নিঃস্বার্থভাব না হয়, নিঃস্বার্থভাব কি আমরা জানি না। তবে এরূপ দয়ার আতিশয্য দ্বারা সময় সময় যে ভ্রম, অবিবেচনা ও পক্ষপাত ঘটিতে পারে তাহা আমরা অসম্ভব মনে করি না।'[৪৫]

'সমাজদর্পণ'-এর লেখাটি পড়ে বিদ্যাসাগর যে কত ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন অল্পদিন পরে একটি ঘটনায় তা প্রকাশ পায়। 'সমাজদর্পণ'-সম্পাদক যশোদানন্দন সরকার 'বাঙ্গালা ব্যাকরণ সঞ্জীবনী' নামে একটি বই লেখেন। 'একজন স্নেহপাত্রের' অনুরোধে বিদ্যাসাগর বইটি সম্পর্কে কিছু প্রশংসাসূচক মন্তব্য করেন। বিদ্যাসাগরের মন্তব্যটি বিজ্ঞাপন হিসাবে যশোদানন্দন ব্যবহার করতে থাকেন। 'সমাজদর্পণ'-এ বিদ্যাসাগর বিষয়ক লেখাটি বেরোনোর কিছুদিন পরে বিদ্যাসাগর 'এডুকেশন গেজেট'-এ একটি চিঠি পাঠিয়ে বইটির সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক অস্বীকার করলেন। এতে তিনি লেখেন :

'শ্রীযুক্ত বাবু যশোদানন্দন সরকার 'বাঙ্গালা ব্যাকরণ সঞ্জীবনী' নামে এক পুস্তক প্রচার করিয়াছেন। একদিবস ঘটনাক্রমে ঐ পুস্তক আমার হস্তে আসিলে বিজ্ঞাপনস্থলে নিম্নলিখিত পংক্তিগুলি অবলোকন করিয়া যারপরনাই বিস্ময়াপন্ন হইয়াছি। "শ্রীযুক্ত পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় এই ব্যাকরণের আভিধানিক ব্যাকরণ ভাগ দেখিয়া এই অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন।" আমি যতদূর দেখিয়াছি, তাহাতে বলিতে পারি যে বিশুদ্ধ হইয়াছে, ইহা বাঙ্গালাভাষায় সাতিশয় আবশ্যক বলিয়া বোধ হয়। বোধহয়, এই ইহা প্রথম হইয়াছে।

'সম্পাদক মহাশয়। আমি কস্মিনকালেও ব্যাকরণ সঞ্জীবনী বিষয়ে কোনপ্রকার অভিপ্রায় প্রকাশ করি নাই। অভিপ্রায় প্রকাশ দূরে থাকুক, উল্লিখিত দিবসের পূর্বে কখনও ঐ পুস্তক দেখি নাই। এমন স্থলে কেমন করিয়া উপরিউদ্ধৃত অভিপ্রায় আমার অভিপ্রায় বলিয়া প্রচারিত হইয়াছে, বুঝিতে পারিতেছি না।'[৪৬]

ব্যাপারটা এভাবে জট পাকিয়ে যাওয়ায় 'এডুকেশন গেজেট'-এর সম্পাদক ভূদেব মুখোপাধ্যায় কলম ধরতে বাধ্য হলেন। 'এডুকেশন গেজেট'-এ প্রকাশিত একটি সম্পাদকীয়তে তিনি লিখলেন :

'আমরা শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় ও বাঙ্গালা ব্যাকরণ সঞ্জীবনী সম্বন্ধে যে সকল পত্র পাইয়াছি তাহা আর প্রকাশ করিবার আবশ্যকতা নাই। সোমপ্রকাশ সম্পাদক কহিয়াছেন যে, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের একজন স্নেহপাত্রের দোষে ঐরূপ গোলযোগ ঘটিয়াছে। যাহাই হউক, আমরা আর এই-বিষয়ের আন্দোলন করিতে ইচ্ছা করি না।'[৪৭] এ-বিষয়ে 'আন্দোলন' না করলেও, যশোদানন্দনের বইটির প্রশংসা করে

বেশ ক'লাইন লিখতে ভূদেব ইতস্তত করলেন না। তাঁর মতে 'সঞ্জীবনী ব্যাকরণ বাস্তবিকই উৎকৃষ্ট হইয়াছে।'

আসলে 'ভারত সংস্কারক'-এর কথাই ঠিক। দয়ার আতিশয্যবশত 'ভ্রম ও অবিবেচনা প্রসূত' নানা কাজের সঙ্গে তিনি জড়িয়ে পড়তেন। এজন্য তাঁকে বারেবারে স্বজন-বিচ্ছেদ, বন্ধুবিচ্ছেদের যন্ত্রণা সহ্য করতে হয়েছে। করতে করতে একটা পর্যায়ে এসে তিনি মানুষের ওপর বিশ্বাস প্রায় হারাতে বসেছিলেন। সহ্যের শেষসীমায় পেঁছে তিনি 'অসংযতবাক' হয়ে পড়েন। তাঁর মনে এমন ধারণার সৃষ্টি হয়েছিল যে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতরা অর্থলোভে সবকিছু করতে পারেন, ইংরেজিশিক্ষিতদের ব্যবহার দেখে তাঁদেরও তিনি ঘৃণার চোখে দেখতে থাকেন। এই যন্ত্রণা থেকে রেহাই পেতেই জনজীবনের কোলাহল থেকে দূরে সাঁওতালদের মধ্যে গিয়ে তিনি শান্তি পেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সেখানেও শান্তিতে দিন তিনি কাটাতে পারতেন না। চারপাশের মানুষজনের অপরিসীম দারিদ্র্য তাঁকে দুঃখ দিত। মৃত্যুর কিছুদিন আগে তাঁর এক অনুরাগী শরীর সারানোর জন্য কিছুদিন তাঁকে কার্মাটারে গিয়ে থাকার পরামর্শ দিলে তিনি বলেন: 'বাপু, সেখানে যাইলে থাকি ভাল বটে, কিন্তু আমার যদি অতুল ঐশ্বর্য থাকিত তাহা হইলে সেখানে গিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিতে পারিতাম, মনও ঠাণ্ডা থাকিত, শরীরও সুস্থ হইত। আমার সে অদৃষ্ট কৈ? আমার সে ক্ষমতা কৈ? আমি সেখানে গিয়া দিব্য অন্নব্যঞ্জন আহার করিব, আর আমার চারিপার্শ্বে অসংখ্য নরনারী বালকবালিকা অনাহারে মারা যাইতেছে দেখিব। এটা কি প্রাণে সয়?'[৪৮] সাধারণ মানুষের অসহায় অবস্থার উন্নতির জন্য তিনি একটি সভা স্থাপনের চেষ্টা করছেন বলে একসময় খবর রটে। এ-সম্পর্কে সমকালীন একটি পত্রিকা লেখে:

'আমরা শুনিয়া আহ্লাদের সহিত প্রকাশ করিতেছি, যে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কর্তৃক প্রজাসাধারণ সভা নামে (জমিদারদিগের ব্রিটিস ইণ্ডিয়ান এসোসিএসনের ন্যায়) এক সভা শীঘ্রই স্থাপিত হইবে। উক্ত সভার দ্বারা সাধারণের বিশেষ মঙ্গল হইবার সম্ভাবনা। ভরসা করি, এই জনরব সত্য হইবে।'[৪৯]

জনরব সত্য না হলেও, সেকালে অনেকে বিশ্বাস করতেন, 'বিদ্যাসাগর মহাশয় দেশের যে উপকার করিয়াছেন, দেশের সমগ্র জমিদারের শুভ কার্য্য একত্র করিলে তাহার সহিত তুলনা হয় না।'[৫০] রাজনৈতিক দলগুলি সাধারণ মানুষের কথা চিন্তা না করে নিজ নিজ স্বার্থ চরিতার্থ করতে থাকায় তিনি মর্মাহত হন। ক্ষোভের সঙ্গে তিনি বলেন, 'বাবুরা কংগ্রেস করিতেছেন, আন্দোলন করিতেছেন, বক্তৃতা করিতেছেন, ভারত উদ্ধার করিতেছেন। দেশের সহস্র সহস্র লোক অনাহারে প্রতিদিন মরিতেছে তাহার দিকে কেহই দেখিতেছেন না। রাজনীতি লইয়া কি হইবে? যে দেশের লোক দলে দলে না খাইয়া প্রত্যহ যমালয়ে যাইতেছে সে দেশে আবার রাজনীতি কি?'[৫১] তিনি মনে করতেন, 'এদেশের নিম্নশ্রেণীর গতি না ফিরিলে দেশের গতি ফিরিবে না। সাহেবেরা আমাদিগকে ঘৃণা করে বলিয়া আমরা কত আক্ষেপ করিয়া

থাকি, কিন্তু আমরা নিম্নশ্রেণীকে পশু অপেক্ষাও ঘৃণার চক্ষে দেখি। হায়, শিক্ষিত শ্রেণীর এতই অহঙ্কার, এতই অভিমান ; দেশের শক্তি যাহারা, আশাভরসাস্থল যাহারা, তাহাদিগকে মনুষ্যের শ্রেণীতে গণ্য করিতে কুণ্ঠিত হন।' অভিজাতদের নিম্নবর্গের প্রতি এই ধরনের অমানবিক আচরণ দেখে আক্ষেপ করে তিনি বলেন, 'হায় তাহাদিগকে আমরা পশুতুল্য জ্ঞান করি, মানুষের ন্যায় জ্ঞান করিলে হয়ত আমাদের দ্বারা তাহাদের কিছু উপকার হইত।'[৫২] দরিদ্রদের প্রতি অভিজাতদের এই অমানবিক ব্যবহার দেখে ও অন্যান্য নানা কারণে শেষজীবনে তিনি নিজেও অনেকটাই বদলে যান। জীবনের শেষদিকে তিনি শুধু যে 'বড় খিটখিটে' হয়েছিলেন তাই নয়, 'এমনকি ভিক্ষার্থী দেখিলেই তাঁহার ধৈর্য্যচ্যুতি হইত।'[৫৩]

তা হয়ত হত, কিন্তু তাই বলে দেশের মঙ্গলসাধনের ইচ্ছা এইসময়ও তাঁর মন থেকে পুরোপুরি লোপ পায়নি। শেষজীবনে যখন তিনি উৎকট পীড়ার অত্যাচার থেকে একটু মুক্ত হন, তখন তাঁর চিকিৎসক তাঁকে বেশি পরিশ্রম করতে নিষেধ করেন। একথা শুনে বিদ্যাসাগর বলেন ঃ

'আলস্যপরবশ হইয়া কাপুরুষের ন্যায় মরিব কেন ? আমি ইচ্ছা করি যে আমার জীর্ণদেহ, যাহা এতদিন এদেশের সেবা করিয়াছে, তাহা প্রিয় বঙ্গভূমির মঙ্গলসাধন করিতে করিতে কার্য্যক্ষেত্রের অনন্তশয্যায় শায়িত হউক, মৃত্যু যেন আসিয়া দেখিতে না পায় যে, পরমেশ্বর আমাকে যে শক্তি দিয়াছিলেন, আমি তাহার ব্যবহার হইতে নিবৃত্ত হইয়া আলস্যে কালযাপন করিতেছি।'[৫৪]

এই সংবাদ বেরোনোর মাসদুয়েকের মধ্যে বিদ্যাসাগরের মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যুসংবাদ ছড়িয়ে পড়লে বাঙালিসমাজে শোকের ছায়া নেমে আসে—স্কুল-কলেজ বন্ধ করে দেওয়া হয়, সরকারি অফিসে অর্ধদিবসের ছুটি ঘোষিত হয়। শেয়ার বাজারও বন্ধ হয়ে যায়। তাঁকে সম্মান দেখানোর জন্য মেট্রোপলিটান স্কুলের কিছু ছাত্র দশ দিন নগ্নপদে থাকার সিদ্ধান্ত নেয়। এই সিদ্ধান্তকে অবশ্য সেকালের বিশিষ্ট পত্রিকা 'রইস অ্যান্ড রায়ত' স্বাগত জানায়নি।[৫৫] পত্রপত্রিকাগুলি বিদ্যাসাগর-প্রশস্তিতে মেতে ওঠে। 'বামাবোধিনী'তে প্রকাশিত এক শোকোচ্ছ্বাসে মানকুমারী বসু বিদ্যাসাগরকে দেবতার আসনে বসিয়ে বললেন, 'দেবতার মৃত্যু নাই, আমাদের বিদ্যাসাগর মহাশয় মৃত্যুঞ্জয়।…ব্যাস, নারদ, মনু, অত্রি ব্যতীত আমাদের বিদ্যাসাগর মহাশয়ের আসনে বসিবার মত দেবতা কোথায় ?' 'নব্যভারত'-এর এক লেখক তাঁকে যিশু খ্রিস্ট ও চৈতন্যদেবের সঙ্গে একাসনে বসান। এসব দেখে সমকালীন একটি পত্রিকা প্রশ্ন রাখে ঃ

'May we ask if they did anything to cheer up the old man during his last years of bitter sadness ? It is no secret that Vidyasagar despaired of his countrymen and was utterly sick of their double facedness and hypocrisy.'[৫৬]

ক্ষোভের সঙ্গে পত্রিকাটি বলে, এখন যাঁরা তাঁর প্রশংসায় পঞ্চমুখ, বিদ্যাসাগরের জীবিতকালে তাঁরা যদি তাঁর কর্মপ্রয়াসকে সাহায্য করতেন, তাহলে তিনি অনেক বেশি খুশি হতেন।

তা হয়ত হতেন। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর দেশবাসী নতুন করে তাঁর মহত্ত্ব উপলব্ধি করতে শুরু করেন। বুঝতে পারেন, পাণ্ডিত্য নয়, ধনসম্পদ নয়, বিদ্যাসাগর চরিত্রের প্রকৃত গৌরব নিহিত আছে অন্য জায়গায়। এই অন্য জায়গাটি কি তা আমাদের জানালেন সমকালীন এক অজ্ঞাতনামা লেখক। বিদ্যাসাগর-প্রয়াণের পর তাঁর মহত্ত্বের কারণ বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে তিনি বললেন ঃ

'পাণ্ডিত্যই বল, আর ধনৈশ্বর্য্যই বল, আভিজাত্যই বল আর রূপযৌবনই বল, কিছুই কিছু নয়। কায়মনোবাক্যে একমাত্র সাধু কার্য্যের অনুষ্ঠানই লোকের শ্রদ্ধাভক্তি আকর্ষণের মূল। স্বর্গীয় মহাত্মা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ই তাহার জ্বলন্ত উদাহরণ।'[৫৭]

তথ্যসূত্র

১. 'ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর', 'সাহিত্য', শ্রাবণ, ১৩০০, পৃ. ৩১০
২. 'পূজনীয় প্রতিকৃতি সম্মুখে', নবীনচন্দ্র সেন, 'সাহিত্য', জ্যৈষ্ঠ, ১২৯৭, পৃ. ৮১-২
৩. 'বামাবোধিনী', ভাদ্র, ১২৯৮, পৃ. ১৩৭-৮
৪. 'সম্বাদ ভাস্কর', ২২. ৭. ১৮৫৪, পৃ. ১৭৫
৫. 'পুরাতন প্রসঙ্গ', বিপিনবিহারী গুপ্ত, অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত (কলকাতা, ১৯৮৯), পৃ. ৪৫
৬. 'ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর', 'সাহিত্য', শ্রাবণ, ১৩০০
৭. 'সেকালের সংস্কৃত কলেজ', হরিশ্চন্দ্র কবিরত্ন, 'প্রবাসী', ভাদ্র, ১৩৩২
৮. ঐ
৯. 'শ্রুতি-স্মৃতি', 'প্রথম ভাগ, মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় (কলকাতা, ১৩৩৪), পৃ. ৯৭
১০. 'এডুকেশন গেজেট', ৮. ৫. ১৮৯১
১১. ঐ, ৩. ৭. ১৮৭৪
১২. 'ইন্দ্রনাথ গ্রন্থাবলী', পৃ. ৪১৯
১৩. 'এডুকেশন গেজেট', ১৮. ৩. ১৮৮৭
১৪. 'সোমপ্রকাশ', ৪. ৪. ১৮৮৭
১৫. 'হুতোমপ্যাচার গান', 'নবজীবন', আশ্বিন, ১২৯১
১৬. 'সাহিত্যসেবক', ভাদ্র, ১৩০৪, পৃ. ২৬২
১৭. 'সখা', অক্টোবর, ১৮৮৫, পৃ. ১৫৪

১৮. 'রঙ্গপুর দিকপ্রকাশ', ১ শ্রাবণ, ১২৭৬
১৯. *The Hindoo Patriot*, 26. 5. 1873
২০. 'স্বভাবদর্পণ', কালীচন্দ্র রায়চৌধুরী (কলকাতা, ১৮৫২), পৃ. ৫
২১. 'সম্বাদ ভাস্কর', ৯. ২. ১৮৫৪
২২. ঐ, ২২. ৭. ১৮৫৪
২৩. *A Descriptive Catalogue of Bengali Works*, J. Long (Calcutta, 1855), p. 76
২৪. 'পঞ্চপুষ্প', ফাল্গুন, ১৩৩৬
২৫. 'কাঁচরাপাড়া প্রকাশিকা', ফাল্গুন, ১২৮০, পৃ. ১১
২৬. 'ভানুমতী চিত্তবিলাস', হরচন্দ্র ঘোষ (কলকাতা, ১৮৫৩), পৃ. ২১৩
২৭. *The Friend of India*, 4. 3. 1858
২৮. ঐ
২৯. *General (General) Pros. No. 31*, 28. 1. 1858
৩০. *The Hindoo Patriot*, 11. 3. 1858
৩১. 'প্রকাশক বিদ্যাসাগর', সুরেশপ্রসাদ নিয়োগী, 'গ্রন্থজগৎ', জানুয়ারি, ১৯৭১, পৃ. ২১ এই প্রসঙ্গে আরো দ্র. 'ব্যবসায়ী বিদ্যাসাগর', পরমেশ আচার্য, 'শারদীয় অনুষ্টুপ', ১৯৮৬, পৃ. ১৭৯-১৯৫
৩২. *General Report of Public Instruction, 1857-8* (Calcutta, 1858) Appendix A, p. 78
৩৩. ইন্দ্রমিত্রের 'করুণাসাগর বিদ্যাসাগর'-এ (২য় সংস্করণ, ১৯৯২) উদ্ধৃত, পৃ. ২০
৩৪. 'গীতাবলী', প্যারীমোহন কবিরত্ন (২য় সংস্করণ, ১২৯৩), পৃ. ৮২-৪
৩৫. *General Report on Public Instruction 1870-1* (Calcutta, 1871), Appendix B, pp 17-8
৩৬. 'প্রকাশক বিদ্যাসাগর', সুরেশপ্রসাদ নিয়োগী, 'গ্রন্থজগৎ', ফেব্রুয়ারি, ১৯৭১, পৃ. ১৩-৪
৩৭. 'His income from his Publications for several years ranged from Rs. 3000 to Rs. 4,500 a month.'—*Bengal Under the Liteutenant Governors, Vol II*, C. E. Buckland (Calcutta, 1902), p. 1035
৩৮. *Rev (Misc) Pros. No. 49*, March, 1869
৩৯. সুরেশপ্রসাদ নিয়োগীর পূর্বোক্ত প্রবন্ধ, পৃ. ১৪
৪০. 'মধ্যস্থ', ১১ শ্রাবণ, ১২৮০
৪১. 'সাহিত্যসেবক', ভাদ্র, ১৩০৪
৪২. 'বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্মৃতি,' পূর্ণচন্দ্র দে, 'প্রবর্তক', ফাল্গুন, ১৩৩৬, পৃ. ৯৮৩-৪

৪৩. 'বিদ্যাসাগর জীবনচরিত ও ভ্রমনিরাস', শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন, কুমুদকুমার ভট্টাচার্য সম্পাদিত (কলকাতা, ১৯৯২), পৃ. ১৪৮

৪৪. 'পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও সমাজদর্পণ সম্পাদক,' 'ভারত সংস্কারক', ২৬ ভাদ্র, ১২৮২

৪৫. ঐ

৪৬. 'এডুকেশন গেজেট', ১৯. ১. ১৮৭৭

৪৭. ঐ, ২৬. ১. ১৮৭৭

৪৮. 'বিদ্যাসাগর প্রবন্ধ', শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য (কলকাতা, ১৩০৫), পৃ. ৯১

৪৯. 'এডুকেশন গেজেট', ৩০. ৮. ১৮৭২

৫০. 'সঞ্জীবনী', ১৪ শ্রাবণ, ১২৯২, দ্র.'সাময়িকপত্রে সমাজচিত্র—সঞ্জীবনী,' কানাইলাল চট্টোপাধ্যায় সংকলিত (কলকাতা, ১৯৮৯), পৃ. ৩৯১

৫১. 'বিদ্যাসাগর প্রবন্ধ', শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য, পৃ. ৯২-৩

৫২. 'প্রেমাবতার মহাত্মা বিদ্যাসাগর', 'নব্যভারত', ভাদ্র, ১২৯৮

৫৩. 'বীরপূজা', যোগেন্দ্রনাথ শর্মা, 'নব্যভারত', ভাদ্র, ১২৯৮

৫৪. 'এডুকেশন গেজেট', ২৯. ৫. ১৮৯১

৫৫. *Reis and Rayyet*, 8. 8. 1891

৫৬. *The Indian Spectator*, 23. 8. 1891

৫৭. 'বিদ্যাসাগরের মহত্ত্ব', 'উগ্রক্ষত্রিয় প্রতিনিধি', ভাদ্র, ১২৯৮

নিন্দা-প্রশংসার নেপথ্যে

বিদ্যাসাগরের মহত্ত্ব স্বীকারে আজকের বাঙালিসমাজ কুণ্ঠাহীন, কিন্তু সমকালে তিনি ছিলেন রীতিমতো বিতর্কিত এক চরিত্র। একদিকে অসংখ্য মানুষের শ্রদ্ধা-ভালোবাসা, অন্যদিকে বেশকিছু মানুষের সমালোচনা জীবিতকালেই তাঁকে সহ্য করতে হয়েছিল। বিদ্যাসাগর সম্পর্কে সমকালীন বাঙালিসমাজের এই নিন্দা-প্রশংসার পিছনে বিশেষ কোনো কারণ ছিল কিনা সেটা একটু সন্ধান করে দেখা যেতে পারে।

তার আগে বিদ্যাসাগর-সমকালীন বাঙালিসমাজের চেহারাটা একনজরে দেখে নেওয়া যাক। উনিশ শতকের সূচনায় প্রধানত পাশ্চাত্য শিক্ষা-সংস্কৃতির প্রভাবে বাঙালি হিন্দুসমাজে নতুন এক যুগের সূত্রপাত হয়। এই যুগের পতাকাবাহকরা বাঙালি হিন্দুসমাজে প্রচলিত নানা রীতিনীতি নিয়ে যে প্রশ্ন তুললেন, তার সন্তোষজনক উত্তর সমাজপতিরা দিতে পারলেন না। ফলে বাংলার সামাজিক অচলায়তনে ফাটল ধরল। প্রচলিত হিন্দুধর্ম ও সমাজকে টিঁকিয়ে রাখতে একদল মানুষ এগিয়ে এলেন—শুরু হল বাঙালি হিন্দুসমাজে রক্ষণশীলতার সঙ্গে প্রগতিশীলতার দ্বন্দ্ব।

দ্বন্দ্বমুখর এই সামাজিক প্রেক্ষাপটে বিদ্যাসাগরের জন্ম। যে বছর তিনি শিক্ষার জন্য কলকাতায় আসেন, সেই বছরই আইন করে সতীপ্রথা বন্ধ করে দেওয়া হয়। সতী নিবারণকে কেন্দ্র করে বাঙালি হিন্দুসমাজ প্রাচীনপন্থী ও উদারপন্থী—এই দুই শিবিরে ভাগ হয়ে গেল। প্রাচীনপন্থী শিবিরের নেতৃত্ব দিলেন রাধাকান্ত দেব, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, রামকমল সেন-রা, আর উদারপন্থীরা রামমোহনের নেতৃত্বে ব্রাহ্মধর্মের পতাকাতলে সমবেত হলেন। রামমোহন ও তাঁর অনুগামীরা ধর্ম ও সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে ধীরে চলার পক্ষপাতী ছিলেন—বৈপ্লবিক কোনো পন্থায় তাঁরা বিশ্বাস করতেন না। জীবনের সবক্ষেত্রেই তাঁরা চাইতেন মধ্যপন্থা অনুসরণ করতে। তাঁদের দুকুল রক্ষা করে চলার এই নীতি সমকালেই সমালোচিত হতে আরম্ভ করে—সে সমালোচনায় প্রধান ভূমিকা নেন ডিরোজিও ও তাঁর ছাত্রশিষ্য ইয়ংবেঙ্গলের দল। বয়সে তরুণ, পাশ্চাত্য ধ্যান-ধারণায় উজ্জীবিত ইয়ংবেঙ্গল গোষ্ঠী রাতারাতি রক্ষণশীলতার দুর্গ ভেঙে ফেলতে চাইলেন। প্রকাশ্যে ঘোষণা করলেন, হিন্দুধর্মের প্রতি ঘৃণা, ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের প্রতি অবজ্ঞা, গো-মাংসে আসক্তি। তাঁদের কার্যকলাপে কলকাতার নগরজীবন হয়ে উঠল চঞ্চল, আলোড়িত। অশান্ত এই পরিস্থিতির সুযোগ নিতে এগিয়ে এলেন খ্রিস্টান মিশনারির দল। শিক্ষিত বাঙালি হিন্দু তরুণদের তাঁরা বললেন: খ্রিস্টধর্মকে জানো, সব প্রশ্নের উত্তর মিলবে, সব সমস্যার হবে সমাধান। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে বাংলার সমাজজীবনে রক্ষণশীল, ব্রাহ্মসমাজী, ইয়ংবেঙ্গল ও খ্রিস্টান মিশনারি—এই চারটি গোষ্ঠীই ছিলেন সমান তৎপর।

শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বিধবাবিবাহ আন্দোলনের সূত্রে বিদ্যাসাগর বাঙালি হিন্দু-সমাজে রীতিমতো আলোড়ন সৃষ্টি করেন। এইকালেই স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারে ও বহুবিবাহ নিবারণে তাঁর ভূমিকা জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রেও ধীরে ধীরে তিনি নিজের আসন করে নেন। তাঁর পাণ্ডিত্য, আত্মমর্যাদাবোধ ও দানশীলতার নানা কাহিনী লোকমুখে ছড়িয়ে পড়ে। ফলে কিছুদিনের মধ্যেই বিদ্যাসাগর বাঙালি হিন্দুসমাজের প্রতিনিধিস্থানীয় এক প্রবাদপুরুষে পরিণত হন। এই পরিণতিকে পূর্বোল্লিখিত চারটি গোষ্ঠী যে সমদৃষ্টিতে দেখেননি তা বলাই বাহুল্য। বিদ্যাসাগরের কর্মপ্রয়াসকে বিভিন্ন গোষ্ঠীর বিভিন্ন দৃষ্টিতে দেখার পিছনে যেসব ঘটনা, ঘাত-প্রতিঘাত কাজ করেছিল সেটা একটু আলোচনা করা যেতে পারে।

শুরু করা যাক ব্রাহ্মসমাজীদের দিয়ে। প্রথম যৌবনে বিদ্যাসাগর 'তত্ত্ববোধিনী সভা'র সভ্য হয়েছিলেন। 'তত্ত্ববোধিনী সভা' সেকালের শিক্ষিত তরুণদের মিলনস্থল হলেও, এটি ছিল ব্রাহ্মসমাজেরই অঙ্গ। ১৮৪৩-এ 'তত্ত্ববোধিনী সভা'র উদ্যোগে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকার সম্পাদক অক্ষয়কুমার দত্ত ছিলেন বিদ্যাসাগরের সমবয়স্ক—উভয়ের মধ্যে সম্পর্ক ছিল নিবিড় বন্ধুত্বের। এই কারণেই 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র সঙ্গে বিদ্যাসাগরের বন্ধন হয়ে ওঠে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য ছিলেন তিনি। এই পত্রিকায় ধারাবাহিক-ভাবে তিনি মহাভারতের অনুবাদ করতে শুরু করেন। ১৮৫৫-য় বিদ্যাসাগরের 'বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব' প্রথম ভাগ প্রকাশিত হলে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' কিভাবে এটিকে স্বাগত জানায় তা আমরা দেখে এসেছি। কিছুদিন পরে বিধবাবিবাহ বিষয়ে বিদ্যাসাগরের দ্বিতীয় পুস্তকটি প্রকাশিত হলে 'তত্ত্ববোধিনী' এটির 'উপক্রম ও উপসংহারভাগ' অনুকূল মন্তব্যসহ প্রকাশ করে। বিধবাবিবাহ আন্দোলনের সমর্থনে একাধিক লেখাও পত্রিকাটিতে প্রকাশিত হয়। শুধু তাই নয়, এইকালে বিদ্যাসাগর বহুবিবাহ নিবারণে উদ্যোগী হলে অক্ষয়কুমার দত্ত 'তত্ত্ববোধিনী'তে বহুবিবাহের বিরোধিতা করে বিরাট একটি প্রবন্ধ লেখেন। সমাজ-সংস্কারে ব্রাহ্মসমাজের তরুণগোষ্ঠীর এই আগ্রহকে দেবেন্দ্রনাথ প্রীতির চোখে দেখেননি। ঈশ্বরে নিবেদিত প্রাণ এই মানুষটি ধর্মতত্ত্ব সম্পর্কে যতখানি আগ্রহী ছিলেন, সমাজসংস্কারে ততখানি নয়। তবু অক্ষয়কুমারদের কার্যকলাপে তিনি কোনো বাধার সৃষ্টি করেননি। অসুস্থতাজনিত কারণে অক্ষয়কুমার 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র দায়িত্বভার ত্যাগ করার অল্পদিনের মধ্যে 'তত্ত্ববোধিনী সভা' বিলুপ্ত হয়। ১৮৫৯-এ দেবেন্দ্রনাথ ঘোষণা করেন, 'তত্ত্ববোধিনী সভা'র কাজের দায়িত্ব এখন থেকে গ্রহণ করবে ব্রাহ্মসমাজ এবং সভার মুদ্রাযন্ত্র, গ্রন্থাগার সবকিছুই হবে ব্রাহ্মসমাজের সম্পত্তি। দেবেন্দ্রনাথের এই আচরণ বিদ্যাসাগর সমর্থন করেননি। এর প্রতিবাদে তিনি 'তত্ত্ববোধিনী সভা' ও ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছেদ করেন।[১] এইকালেই 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' সম্পাদনার দায়িত্ব সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ওপর অর্পিত হয়।

ফলে পত্রিকাটির নিয়ন্ত্রণ পুরোপুরি দেবেন্দ্রনাথের হাতে চলে আসে। আসার পর পত্রিকাটি সমাজসংস্কারের চেয়ে ধর্মতত্ত্ব আলোচনায় গুরুত্ব আরোপ করে। ১৭৮৮ শকের অগ্রহায়ণ সংখ্যা 'তত্ত্ববোধিনী'তে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে বলা হয়, অনেকের ধারণা ব্রাহ্মধর্ম ও সমাজসংস্কার একই ব্যাপার, কিন্তু 'সমাজসংস্কার ও সভ্যতা নিতান্ত বাঞ্ছনীয় হইলেও তাহা ব্রাহ্মধর্মের লক্ষণ বলিয়া কখনই পরিগৃহীত হইতে পারে না।'[২]

ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করলেও, সমাজের তরুণগোষ্ঠীর সঙ্গে বিদ্যাসাগরের যোগাযোগ ছিল। এই গোষ্ঠীভুক্ত কয়েকজন দেবেন্দ্রনাথের কার্যকলাপে ক্ষুণ্ণ হয়ে ১৮৬৪-তে উপাসনা সমাজ গড়ে তোলেন। এটির কর্মকর্তাদের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। এইকালেই দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে কেশবচন্দ্রের ব্যক্তিত্বের সংঘাত শুরু হয়—যার পরিণামে ১৮৬৬-র নভেম্বরে রামমোহন প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসমাজ দ্বিধাবিভক্ত হয়ে যায়। ব্রাহ্মসমাজের রক্ষণশীল অংশের নেতা হলেন দেবেন্দ্রনাথ আর প্রগতিশীলরা এসে দাঁড়ালেন কেশবচন্দ্রের পাশে। 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' পরিণত হল আদি ব্রাহ্মসমাজের মুখপত্রে আর ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের মতামত প্রকাশিত হতে লাগল 'ধর্মতত্ত্ব' আর 'ইন্ডিয়ান মিরর'-এ। বিদ্যাসাগরের সঙ্গে দেবেন্দ্রনাথের মতানৈক্যের দরুন ১৮৬৬-তে বাঙালিসমাজে যখন নতুন করে বহুবিবাহবিরোধী আন্দোলন শুরু হল, তখন 'তত্ত্ববোধিনী' এ-বিষয়ে বিশেষ উৎসাহ প্রকাশ করল না। ১৭৮৮ শকের বৈশাখ সংখ্যা 'তত্ত্ববোধিনী'তে প্রকাশিত এক পাতার একটি নিবন্ধে আইনের সাহায্যে বহুবিবাহ বন্ধের অনুকূলে মতপ্রকাশ করা হয়। এই লেখাটিতে বিদ্যাসাগরের নাম পর্যন্ত উল্লেখ করা হয়নি।[৩] এইকালেই ফিমেল নর্মাল স্কুল স্থাপন সংক্রান্ত প্রশ্নে কেশবপন্থীদের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের মতভেদ দেখা দেয়। ফিমেল নর্মাল স্কুল স্থাপন সম্পর্কে বিদ্যাসাগরের বিচিত্র মনোভাব 'ইন্ডিয়ান মিররে' সমালোচিত হয়। বিধবাবিবাহ প্রচলনের ব্যাপারে বিদ্যাসাগরের অতিমাত্রায় হিন্দুশাস্ত্রনির্ভরতাকেও 'ইন্ডিয়ান মিরর' কটাক্ষ করে।

বিদ্যাসাগরের সঙ্গে কেশবপন্থীদের এই মতান্তর দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। তিন আইনে বিবাহ সংক্রান্ত প্রশ্নে কেশবপন্থীরা বিদ্যাসাগরের কতখানি সমর্থন পেয়েছিলেন তা আমরা দেখে এসেছি। আদি ব্রাহ্মসমাজ ও তার মুখপত্র 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' ছিল এই আইনের প্রচণ্ড বিরোধী। আদি ব্রাহ্মসমাজীরা একে 'ব্রাহ্ম বিবাহ আইন' বলতে প্রস্তুত ছিলেন না, এই আইনকে তাঁরা 'সত্যের বিপরীত' মনে করতেন।[৪] বিদ্যাসাগর এই আইনকে সমর্থন করায় স্বভাবতই আদিসমাজভুক্ত ব্যক্তিরা ক্ষুব্ধ হন। যে কারণে সত্তরের দশকে বিদ্যাসাগরের উদ্যোগে বাঙালিসমাজে পুনরায় বহুবিবাহ নিয়ে বাদানুবাদ শুরু হলে, 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' এ-বিষয়ে সম্পূর্ণ নীরবতা পালন করে। পত্রিকাটি বিদ্যাসাগরের বহুবিবাহ বিষয়ক প্রথম পুস্তকটির উল্লেখমাত্র করার প্রয়োজন মনে করেনি, যদিও বিদ্যাসাগরের মতের বিরোধিতা করে যেসব পুস্তিকা লেখা হয়েছিল, তার দু'একটির আলোচনা পত্রিকাটিতে প্রকাশিত হয়। বহুবিবাহ বিষয়ে

বিদ্যাসাগরের দ্বিতীয় পুস্তকটি প্রকাশিত হলে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় তার যে দায়সারা সমালোচনা প্রকাশিত হয়, সেটি এইরকম ঃ

'বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক বিচার। দ্বিতীয় পুস্তক। শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রণীত। সংস্কৃত যন্ত্রে মুদ্রিত। প্রথম তর্কবাচস্পতি প্রকরণ, উহা ৩ পরিচ্ছেদে সমাপ্ত। দ্বিতীয় ন্যায়রত্ন প্রকরণ। তৃতীয় স্মৃতিরত্ন প্রকরণ। চতুর্থ সামশ্রমী প্রকরণ। পঞ্চম কবিরত্ন প্রকরণ। ৬ষ্ঠ উপসংহার। সপ্তম পরিশিষ্ট। বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রথম বিচার পুস্তক প্রকাশ হওয়াতে কতকগুলি লোক তৎপাঠে অসন্তুষ্ট হইয়া উহার বিরুদ্ধে কয়েকখানি পুস্তক প্রচার করেন। উপস্থিত পুস্তকে বিদ্যাসাগর মহাশয় বিশেষ পরিশ্রম স্বীকার-পূর্বক শাস্ত্র ও যুক্তি দ্বারা উহাদিগের প্রত্যেকের আপত্তি খণ্ডন করিয়াছেন। বিশেষতঃ গঙ্গাধর কবিরত্নের ব্যবস্থার দৃষ্টান্তটি অতি কৌতুহলজনক হইয়াছে।'[৫] প্রসঙ্গত উল্লেখ-যোগ্য বিদ্যাসাগরের বইটির চেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়ে সত্যব্রত সামশ্রমীর 'বহুবিবাহ বিচার সমালোচনা' বইটির আলোচনা করেছিল 'তত্ত্ববোধিনী'। বহুবিবাহ নিবারণ সংক্রান্ত প্রশ্নে এইকালে বাঙালিসমাজ কি পরিমাণ উত্তাল হয়ে উঠেছিল, 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র পাতা উলটে তা বোঝার কোনো উপায় নেই। 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র বিদ্যা-সাগরী আন্দোলন সম্পর্কে এই শীতল মনোভাবের পাশাপাশি এইকালের আর একটি পত্রিকা 'ন্যাশনাল পেপার'-এর আচরণও স্মরণীয়। আদি ব্রাহ্মসমাজভুক্ত নবগোপাল মিত্র ছিলেন এটির সম্পাদক। পত্রিকাটিতে বিভিন্ন বিষয়ে আদি ব্রাহ্মসমাজের মতামত প্রকাশিত হত, এই পত্রিকার বিভিন্ন লেখা যথেষ্ট গুরুত্ব সহকারে 'তত্ত্ববোধিনী' পুনর্মুদ্রিত করত। পত্রিকাটি বিদ্যাসাগরের বহুবিবাহ পুস্তকটিকে কিভাবে আক্রমণ করে তা আমরা দেখে এসেছি। বহুবিবাহ আন্দোলনে বিদ্যাসাগরের ভূমিকাকে স্বীকৃতি জানাতে আদি ব্রাহ্মসমাজের এই কুণ্ঠার পাশাপাশি কেশবচন্দ্র সেন সম্পাদিত 'সুলভ সমাচার'-এর ভূমিকাও স্মরণীয়। পত্রিকাটি এইকালে কিভাবে বিদ্যাসাগরের প্রয়াসকে বারংবার সমর্থন জানায় তা আমরা দেখিয়েছি। 'ইন্ডিয়ান মিরর'ও বহুবিবাহ নিবারণে বিদ্যাসাগরের ভূমিকা সম্পর্কে যথেষ্ট শ্রদ্ধা পোষণ করত। পরবর্তীকালে সমাজসংস্কার বিষয়ে বিদ্যাসাগরের আগ্রহ হ্রাস পায়, ব্রাহ্মসমাজেও দলাদলি প্রকট হয়ে ওঠে, যার ফলে সত্তরের দশকেই ব্রাহ্মসমাজ ত্রিধাবিভক্ত হয়ে যায়।

তিন ব্রাহ্মসমাজেই বিদ্যাসাগর-অনুরাগীর অভাব ছিল না। আদি ব্রাহ্মসমাজের রাজনারায়ণ বসুর সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত মধুর। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে রাজনারায়ণ বিদ্যাসাগরের পরামর্শমতো চলতেন। দেবেন্দ্রনাথের সতর্কবাণী উপেক্ষা করে তিনি তাঁর দুই ভাইয়ের বিধবাবিবাহ দেন। এজন্য তিনি যখন অসহনীয় এক পরিস্থিতির সম্মুখীন হন, তখন বিদ্যাসাগর তাঁকে সান্ত্বনা জানিয়ে লেখেন, 'তোমাকে আপাতত যে গরল ভক্ষণ করিতে হইতেছে, অবশেষে তাহা অমৃতরূপে পরিণত হইবে।' বিদ্যাসাগরের সঙ্গে এত ঘনিষ্ঠতা থাকার জন্যই ১৮৭৮-এ বাংলা

সাহিত্য বিষয়ে বক্তৃতা দেবার সময় তিনি বিদ্যাসাগরের যথেষ্ট প্রশংসা করেন এবং বিদ্যাসাগরের লিখনশৈলী সম্পর্কে যেসব আপত্তি ওঠে সেগুলির জবাব দিতে চেষ্টা করেন। উনিশ শতকের শেষদিকে যখন সহবাস সম্মতি আইন নিয়ে বাঙালিসমাজে বাদানুবাদ শুরু হয়, তখন আদিসমাজভুক্ত অনেকে এই আইনের বিরোধিতা করতে থাকেন। নবগোপাল মিত্র ময়দানে অনুষ্ঠিত এ-বিষয়ক এক সভায় প্রস্তাবিত আইনের বিরোধিতা করে বক্তৃতা দেন। আদি ব্রাহ্মসমাজীদের একাংশ বিদ্যাসাগরকে এই আইনের বিরোধিতা করতে দেখে খুশি হয়েছিলেন। শতাব্দীর শেষপ্রান্তে আদি ব্রাহ্মসমাজীরা আবার নতুন করে বিদ্যাসাগর-ভক্ত হয়ে পড়েন। এই কারণেই ১৮৯১-এ বিদ্যাসাগরের মৃত্যু হলে 'তত্ত্বোধিনী' তাঁর প্রয়াণসংবাদ যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে ছাপে। কেশবপন্থীদের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের সুসম্পর্ক ১৮৭০-এর পর থেকে অটুট ছিল। যে কারণে নববিধানীদের নিজস্ব পত্রিকা 'ধর্মতত্ত্ব' বিদ্যাসাগর প্রয়াণে দীর্ঘ এক প্রবন্ধ প্রকাশ করে। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের শিবনাথ শাস্ত্রী, শিবচন্দ্র দেব, রামতনু লাহিড়ি ইত্যাদিদের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের সম্পর্ক ছিল অতি ঘনিষ্ঠ। এঁদের সকলের মধ্যে শিবনাথ শাস্ত্রী ছিলেন বিদ্যাসাগরের অত্যন্ত কাছের মানুষ। শিবনাথের আত্মজীবনীর বেশ কিছুটা অংশ অধিকার করে আছে বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গ, 'সখা'র সম্পাদক থাকাকালীন শিবনাথ বিদ্যাসাগরের মহত্ত্ব সম্পর্কে একাধিক প্রবন্ধ পত্রিকাটিতে প্রকাশ করেন। তাঁর দেখা স্মরণীয় মানুষগুলির অন্যতম ছিলেন বিদ্যাসাগর। বিদ্যাসাগর প্রয়াণে ব্যথিত হয়ে শিবনাথ বেশকিছু লেখালিখি করেন, লেখাগুলির অন্তরঙ্গ ভঙ্গি আমাদের মুগ্ধ করে। বিদ্যাসাগরের মৃত্যুর অল্পদিন পরে (আগস্ট, ১৮৯১) একটি স্মরণসভায় তিনি বলেন, মানবকুলে দুরকম রাজা আছেন। একপ্রকার রাজা রাজবংশজাত, অন্যপ্রকার রাজারা দরিদ্রঘরে জন্মেও মানবকুলের হৃদয়মনের ওপর রাজত্ব করেন। 'এই শ্রেণীর রাজাদিগের অগ্রগণ্য যথা যীশু, বুদ্ধ, মহম্মদ প্রভৃতি, কিন্তু ইহাঁদের সঙ্গে তুলনায় সামান্য ব্যক্তিদিগের মধ্যেও এইরূপ রাজা দেখিতে পাওয়া যায়। নানক এক রাজা, কবীর এক রাজা, চৈতন্য এক রাজা, কুকা রামসিংহ এক রাজা, গুজরাটের বিখ্যাত ধর্মসংস্কারক স্বামীনারায়ণ এক রাজা, রামমোহন রায় এক রাজা এবং বিদ্যাসাগর ঐ শ্রেণীর এক রাজা।'[৬]

বিদ্যাসাগর প্রয়াণে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মুখপত্র 'ইন্ডিয়ান মেসেঞ্জার' গভীর শোক প্রকাশ করে লেখে, তাঁর মৃত্যুতে যে বিরাট শূন্যতার সৃষ্টি হল তা পূরণ হবার নয়। পত্রিকাটি বিদ্যাসাগরের স্বাধীনচিত্ততা, অন্যায়ের প্রতি ঘৃণা, আপোসহীন মনোভাবের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে বলে, হিন্দু শাস্ত্রানুসারী সংস্কারক হলেও ব্রাহ্ম-সমাজের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল বন্ধুত্বপূর্ণ। তিনি যে আর পাঁচজন সাধারণ মানুষের মতো নন, সে কথা বলতে গিয়ে পত্রিকাটি লেখে:

'It may be said with the strictest truth that in tenderness of heart, strength of purpose, independence of spirit, and hatred of

injustice, he rose far above the level of the vast majority of men, and claimed proximity to the greatest men of the world. From the moral horizen of the land there has disappeared a figure of commanding features and we cannot expect to look upon the like again'[৭]

ব্রাহ্মদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপিত হবার আগেই বিদ্যাসাগর পরিচিত হয়েছিলেন ইয়ংবেঙ্গলের কার্যকলাপের সঙ্গে। তাঁর ছাত্রজীবনের সূচনায় ডিরোজিও ও তাঁর ছাত্রশিষ্যদের কার্যকলাপে কলকাতার বাঙালি হিন্দুসমাজ রীতিমতো অস্থির। ছাত্রজীবনে ডিরোজিও-শিষ্যদের কণ্ঠে বাল্যবিবাহ ও কৌলীন্যপ্রথা বন্ধ করার, বিধবাবিবাহ ও স্ত্রীশিক্ষা চালু করার দাবি বিদ্যাসাগর বারবার শুনেছিলেন। পত্রপত্রিকায় এসব নিয়ে লেখালিখিও তাঁর চোখ এড়ায়নি, বিভিন্ন বিদ্বৎসভায় এসব প্রসঙ্গে আলোচনার খবরাখবরও তিনি রাখতেন। এধরনের দু'একটি বিদ্বৎসভার সঙ্গে তিনি নিজেও যুক্ত ছিলেন। ১৮৩৮-এ ডিরোজিও-শিষ্যদের আগ্রহে 'সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা' স্থাপিত হয়। এই সভার অন্যতম সভ্য ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র। এই সভায় যাতায়াতের সূত্রেই তিনি চন্দ্রশেখর দেব, গোবিন্দচন্দ্র বসাক, হরচন্দ্র ঘোষ, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, মাধবচন্দ্র মল্লিক, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, প্যারীচাঁদ মিত্র, শিবচন্দ্র দেব, রামগোপাল ঘোষ, তারাচাঁদ চক্রবর্তী, রামতনু লাহিড়ি—ইয়ংবেঙ্গল গোষ্ঠীর এইসব তরুণদের সঙ্গে পরিচিত হন। ১৮৪২-এ ইয়ংবেঙ্গলের মুখপত্র 'বেঙ্গল স্পেক্টেটর'-এ প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে বিধবাবিবাহের সমর্থনে পরাশর সংহিতার বিখ্যাত শ্লোকটি ('গতে মৃতে প্রব্রজিতে') উদ্ধৃত হয়। শিবনাথ শাস্ত্রীর অনুমান এই শ্লোকটি সংগ্রহের ব্যাপারে বিদ্যাসাগর ও মদনমোহন তর্কালঙ্কারের হাত ছিল। এ মত মেনে নেওয়া কঠিন। কারণ এই শ্লোকটি ১৮৪২-এই যদি বিদ্যাসাগর-মদনমোহনরা উদ্ধার করে থাকেন, তাহলে পরবর্তীকালে শাস্ত্র থেকে বিধবাবিবাহের সমর্থন খুঁজে বার করতে বিদ্যাসাগরকে এত পরিশ্রম করতে হল কেন? উনিশ শতকের পঞ্চাশের দশকে বিদ্যাসাগর বিধবাবিবাহের পক্ষে জনমত সৃষ্টির কাজে নামলে ইয়ংবেঙ্গল গোষ্ঠীভুক্ত ব্যক্তিরা একে স্বাগত জানান। জানালেও, ইয়ংবেঙ্গলের পূর্বের সেই প্রভাব তখন আর ছিল না। মধ্যবয়সী ডিরোজিও-শিষ্যরা এইসময় চাকরি-বাকরি, ঘর-সংসারে ভীষণভাবে জড়িয়ে পড়ায় পরস্পর থেকে অনেকটাই বিচ্ছিন্ন। তার ওপর এইসময় তাঁদের না ছিল নিজস্ব কোনো সংগঠন, না ছিল নিজস্ব কোনো পত্রিকা ('মাসিক পত্রিকা'র সম্পাদক দুই ইয়ংবেঙ্গল হলেও, পত্রিকাটি ছিল বিশেষভাবে মেয়েদের জন্য)। তা সত্ত্বেও বিদ্যাসাগরী প্রচেষ্টাকে সমর্থন জানাতে তাঁরা ইতস্তত করলেন না। তবে কিভাবে একে কার্যকর করা যায় সে সম্পর্কে তাঁদের নিজস্ব কিছু চিন্তাভাবনা ছিল। ৭ ফেব্রুয়ারি, ১৮৫৬-য় ডিরোজিয়ানদের পক্ষ থেকে বিধবাবিবাহের

সমর্থনে সরকারের কাছে একটি আবেদন পেশ করা হয়। বিধবাবিবাহকে কেন্দ্র করে ভবিষ্যতে আইনগত কোনো সমস্যার সৃষ্টি যাতে না হয়, সেইজন্য তাঁরা প্রস্তাব করলেন, বিধবাবিবাহে আগ্রহী পাত্রপাত্রীকে দুটি অঙ্গীকারপত্রে স্বাক্ষর করে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হতে হবে—এই অঙ্গীকারপত্র দুটি বিয়ের ছ মাসের মধ্যে রেজিস্ট্রি করা হবে বাধ্যতামূলক। এই আবেদনপত্রটিতে রসিককৃষ্ণ মল্লিক, রাধানাথ শিকদার, প্যারীচাঁদ মিত্র প্রভৃতি সই করেছিলেন। ১৮৫৬-র জুলাই মাসে বিধবাবিবাহ আইন প্রণীত হলে দেখা গেল, সরকার তাঁদের প্রস্তাব গ্রহণ করেননি। না করলেও, তাঁরা কিন্তু এই আইনকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য বিদ্যাসাগরের পাশে দাঁড়ালেন। ইয়ংবেঙ্গলের অন্যতম নেতা কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় আইন পাস হবার আগেই এর সমর্থনে কলম ধরেছিলেন।[৮] প্যারীচাঁদ মিত্র 'ক্যালকাটা রিভিউ'-এ প্রবন্ধ লিখে বিধবাবিবাহ আন্দোলনকে সমর্থন জানালেন। ১৮৫৫-র এপ্রিল মাস থেকে 'মাসিক পত্রিকা'য় ধারাবাহিকভাবে বিধবাবিবাহের সমর্থনে তিনি একটি লেখা লিখতে শুরু করেন। ব্রজনাথ-মনোমোহিনীর এই উপাখ্যানটিতে প্যারীচাঁদ সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করলেন 'বিধবাবিবাহে কিছুমাত্র দোষ নাই'। ১৮৫৬-র ডিসেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত প্রথম বিধবাবিবাহ সভায় ইয়ংবেঙ্গল দলের রামগোপাল ঘোষ ও প্যারীচাঁদ মিত্র উপস্থিত ছিলেন।

শুধু বিধবাবিবাহ আন্দোলনকেই নয়, বহুবিবাহ নিবারণে বিদ্যাসাগর যখন উদ্যোগী হলেন, তখনও ইয়ংবেঙ্গল তাঁকে সমর্থন জানালেন। বহুবিবাহ বন্ধের দাবিতে ইয়ংবেঙ্গলরা বিদ্যাসাগরের অনেক আগেই সোচ্চার হয়েছিলেন। ১৮৩১-এ কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় বহুবিবাহের সমালোচনা করে 'এনকোয়েরার'-এ একটি প্রবন্ধ লেখেন।[৯] ইয়ংবেঙ্গলের মুখপত্র 'জ্ঞানান্বেষণ' তিরিশের দশকে এর কুফল সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করতে থাকে। ১৮৩৬-এর এপ্রিল মাসে 'জ্ঞানান্বেষণ'-এ প্রকাশিত 'কুলীনের বহুবিবাহ' নামক একটি প্রবন্ধে এ-প্রথার ভয়াবহ এক ছবি তুলে ধরা হয়। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বিদ্যাসাগর এ-প্রথার বিরুদ্ধে সংগ্রামে নামলে ইয়ংবেঙ্গল তাঁকে সমর্থন জানাতে দ্বিধা করলেন না। ১ ফেব্রুয়ারি, ১৮৬৬-তে বিদ্যাসাগরের উদ্যোগে বহুবিবাহের বিরুদ্ধে একুশ হাজার লোকের স্বাক্ষরযুক্ত যে আবেদনটি সরকারের বিবেচনার জন্য পেশ করা হয়, তাতে ইয়ংবেঙ্গল দলের একাধিকজন স্বাক্ষর করেন। এঁদের মধ্যে রামগোপাল ঘোষ, প্যারীচাঁদ মিত্র ও শিবচন্দ্র দেবের নাম স্মরণীয়। এই আবেদনটি সরকারের কাছে পেশ করার জন্য যে দলটি লাটভবনে গিয়েছিলেন, সেই দলে ইয়ংবেঙ্গলের দু'একজনও ছিলেন। ১৮৬৮-তে ইয়ংবেঙ্গলের অন্যতম নেতা কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় 'ক্যালকাটা রিভিউ'-এ বহুবিবাহের বিরুদ্ধে এক দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখে আইনের সাহায্যে এ-প্রথা বন্ধের পক্ষে জোরালো সওয়াল করেন। ১৮৭৩-এ 'বেঙ্গল খ্রিস্চান হেরাল্ড'-এ প্রকাশিত 'Certain Social Problems of the day' নামক একটি প্রবন্ধেও তিনি কৌলীন্যপ্রথার কুফল সম্পর্কে আলোচনা

করেন। স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রেও ইয়ংবেঙ্গল গোষ্ঠী বিদ্যাসাগরের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। শিবচন্দ্র দেব, প্যারীচাঁদ মিত্র, রামগোপাল ঘোষ ও দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় এ-বিষয়ে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। ১৮৪৯-এর ৭ মে বেথুনের উদ্যোগে ক্যালকাটা ফিমেল স্কুল প্রতিষ্ঠিত হলে রামগোপাল ঘোষ, প্যারীচাঁদ মিত্র ও দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় তাঁদের বাড়ির মেয়েদের এই স্কুলে ভর্তি করে দেন।[১০] ইয়ংবেঙ্গল গোষ্ঠীর একাধিকজনের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের ব্যক্তিগত সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত মধুর। এই গোষ্ঠীর একজনের সঙ্গেই বিদ্যাসাগরের সম্পর্ক ভালো ছিল না—তিনি কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। সমাজসংস্কারের ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগরের মতামতের সঙ্গে তাঁর কোনো বিরোধ ছিল না, কিন্তু বিদ্যাসাগরের সাহিত্যপ্রতিভা সম্পর্কে তিনি ভিন্নমত পোষণ করতেন। 'বেতালপঞ্চবিংশতি'র কি কঠোর সমালোচনা তিনি করেছিলেন তা আমরা দেখেছি। কৃষ্ণমোহন নিজে বাংলা গদ্যচর্চা করতেন, সংস্কৃতেও তাঁর অধিকার ছিল। খ্রিস্টীয় নীতিবোধের দ্বারা চালিত হবার দরুন শ্লীল-অশ্লীল সম্পর্কে বিদ্যাসাগরের সঙ্গে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির মৌলিক পার্থক্য ছিল। এইসব কারণেই সাহিত্যসেবক বিদ্যাসাগরকে তিনি খুব প্রসন্ন চোখে দেখতে পারেননি। প্রসঙ্গত স্মরণীয়, বিদ্যাসাগরও কিন্তু কৃষ্ণমোহনকে অবজ্ঞার চোখে দেখতেন। কেউ কখনও তাঁকে কৃষ্ণমোহনের প্রশংসা করতে শোনেননি। কৃষ্ণমোহন সম্পর্কে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে তিনি বলতেন, 'লোকটার রকম দেখেছ? টুলো পণ্ডিতের মত কথায় কথায় ভট্টির শ্লোক Quote করে।'[১১]

রেভাঃ কৃষ্ণমোহনের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের সম্পর্ক মধুর না হলেও খ্রিস্টান মিশনারিদের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের সম্পর্ক ছিল খুবই ভালো। শ্রীরামপুর মিশনারিদের সঙ্গে তাঁর সুসম্পর্কের কিছু পরিচয় আমরা দিয়েছি। জন ক্লার্ক মার্শম্যান, জেমস লং, রেভাঃ ডাল, জে. ওয়েঙ্গার, রেভাঃ লালবিহারী দে প্রভৃতির সঙ্গে তাঁর গভীর প্রীতির সম্পর্ক ছিল। ডাল সাহেব যে প্রায়ই বিদ্যাসাগরের 'গুণব্যাখ্যা' করতেন, এ খবর বিহারিলাল সরকারের বিদ্যাসাগর-জীবনীতে পাওয়া যায়। মিশনারি স্কুলগুলিতে তাঁর বই পড়ানো হত, মিশনারিদের একাংশ তাঁকে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সেরা লেখক মনে করতেন, বাঙালি হিন্দুসমাজ সংস্কারের জন্য তাঁর বিভিন্ন প্রয়াসকে মিশনারিরা প্রশংসার চোখেই দেখতেন। তবে বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ আন্দোলন সম্পর্কে মিশনারিদের সবাই খুব বেশি উৎসাহী ছিলেন না। যে কারণে শ্রীরামপুর মিশনারিদের পত্রিকা 'ফ্রেন্ড অফ ইন্ডিয়া' এ-বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করেনি। তবে একালের আর একটি মিশনারি পত্রিকা হিন্দুদের বহুবিবাহ নিবারণ ও বিধবাবিবাহ প্রচলনের জন্য যে আন্দোলন গড়ে ওঠে তাকে স্বাগত জানায়। বিধবাবিবাহ আন্দোলনে বিদ্যাসাগরের ভূমিকা সম্পর্কে পত্রিকাটি লেখে:

'a proposal to remove the legal obstacles which now prevent the Marriage of Hindu widows. This also has originated with

natives, and has excited the most lively attention among them. The elegant pen of Ishwar Chunder Vidyasagar—the best Bengali writer has been engaged in pleading the cause of the widow. We have not had an opportunity of reading the two pamphlets which he has published on the subject ; but a brief glance at one of them has shown us that he can quote Sanskrit slokes by the score in support of his theme.'[১২]

বহুবিবাহ রদকল্পে বিদ্যাসাগরের প্রচেষ্টাকে স্বাগত জানাতে দলমতনির্বিশেষে মিশনারিরা দ্বিধা করেননি। এ-বিষয়ে বিদ্যাসাগরের ভূমিকার প্রশংসা করে 'ফ্রেন্ড অফ ইন্ডিয়া' একাধিক সম্পাদকীয় লেখে। 'মিশনারি ইন্টেলিজেনসার'ও বহুবিবাহ নিবারণে বিদ্যাসাগরের ভূমিকার প্রশংসা করে। অবশ্য বিদ্যাসাগরের জন্য যেসব মিশনারির ব্যক্তিস্বার্থ ক্ষুণ্ণ হচ্ছিল, তাঁরা বিদ্যাসাগরকে ভালোচোখে দেখতেন না। প্রসঙ্গত জন মার্ডকের নাম স্মরণীয়। কেন মার্ডক দীর্ঘদিন ধরে বিদ্যাসাগরের বিরোধিতা করেছিলেন, তার কারণ আমরা যথাস্থানে বিশ্লেষণ করেছি। আশ্চর্যের বিষয়, বিদ্যাসাগরের সঙ্গে মার্ডকের বিরোধকালে বিদ্যাসাগরের পক্ষ সমর্থনে এগিয়ে এসেছিলেন খ্রিস্টান মিশনারিরাই। কতখানি সুসম্পর্ক থাকলে এটি সম্ভব তা সহজেই অনুমেয়।

মিশনারিদের বিদ্যাসাগর সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে রক্ষণশীল হিন্দুদের দৃষ্টিভঙ্গির কোনো মিল ছিল না। ১৮৫৫-য় বিদ্যাসাগর যখন বিধবাবিবাহের পক্ষে জনমত গড়ে তুলতে উদ্যোগী হলেন, তখন রক্ষণশীল হিন্দুদের কাছ থেকে তিনি প্রচণ্ড বাধা পেয়েছিলেন। এইসময় রক্ষণশীল বাঙালি হিন্দুসমাজ নানা দলে বিভক্ত। এই দলগুলির মধ্যে রাধাকান্ত দেব, রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায় ও আশুতোষ দেবের দল ছিল খুব শক্তিশালী। সবকটি দলের সদস্যরাই ছিলেন বিধবাবিবাহের ঘোর বিরোধী। কিন্তু বিধবাবিবাহের বিরুদ্ধাচরণে অন্য দলপতিদের ছাপিয়ে গেলেন রাধাকান্ত দেব। বিদ্যাসাগরের মতের প্রতিবাদ করলেন তিনি, তাঁর অনুগত পণ্ডিতদের দিয়ে বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ পুস্তকের একাধিক প্রত্যুত্তর লেখালেন, সরকার যাতে এ-বিষয়ে কোনো আইন পাস না করেন সেজন্য তৎপর হলেন। রক্ষণশীল হিন্দু পত্রিকাগুলি বিদ্যাসাগরের নিন্দাবাদে মুখর হয়ে ওঠে। বিধবাবিবাহ আইন পাস হলে 'ধর্মসভা' বিধবাবিবাহকারক ও এ-বিষয়ে উৎসাহদাতাদের একঘরে করতে শুরু করে। বিধবাবিবাহ প্রবর্তনের জন্য বিদ্যাসাগর রক্ষণশীলদের কাছে যতখানি সমালোচিত হয়েছিলেন, বহুবিবাহ নিবারণে উদ্যোগী হওয়ার জন্য ততখানি হননি। রাধাকান্ত দেব ছাড়া প্রথম সারির কোনো রক্ষণশীল নেতা বহুবিবাহ বিষয়ে বিদ্যাসাগরী প্রয়াসের সমালোচনা করেননি। ১৮৬৭-তে আইনের সাহায্যে বহুবিবাহ নিবারণের প্রধান

প্রতিপক্ষ রাধাকান্তের মৃত্যু হয়। এর পরবর্তীকালে কৌলীন্যের কুফল সম্পর্কে রক্ষণশীল হিন্দুদের একটা অংশ সচেতন হয়ে ওঠেন। এইসব হিন্দুরা মিলিত হয়েছিলেন 'সনাতন ধর্মরক্ষণী সভা'য়। উনিশ শতকের সত্তরের দশকে সভা বহুবিবাহ নিবারণের জন্য রাজদ্বারে আবেদন করার কথা চিন্তা করছে একথা জানার পর বিদ্যাসাগর সভার উদ্দেশ্য পূরণের কাজে সহায়তা করতে এগিয়ে এলেন। সনাতন ধর্মরক্ষণী সভার সঙ্গে বিদ্যাসাগরের সুসম্পর্কের সূত্রপাত এখান থেকেই। সনাতন ধর্মরক্ষণী সভার সভাপতি কালীকৃষ্ণ দেব একদা বিদ্যাসাগরের কঠোর সমালোচনা করলেও, এইকালে তিনি তাঁর প্রশংসায় হয়ে ওঠেন পঞ্চমুখ। সনাতন ধর্মরক্ষণী সভা অত্যন্ত সম্ভ্রমের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের কাজকর্মের উল্লেখ করতে থাকে। কিছুদিন পরে বহুবিবাহ নিবারণ সংক্রান্ত প্রশ্নে সভার সভ্যরা দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে যান-- একদলের মতে আইনের সাহায্য নিয়ে এ-প্রথা বন্ধ করা উচিত। মহারাজা কালীকৃষ্ণ ছাড়াও সনাতন ধর্মরক্ষণী সভার সম্পাদক চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় ছিলেন এই মতের সমর্থক। সভার অন্য একদল সদস্য কিন্তু বিদ্যাসাগরের কাজকর্মকে ভালোচোখে দেখতেন না। তারানাথ তর্কবাচস্পতি ও খেলাতচন্দ্র ঘোষ ছিলেন এই দলের প্রধান পুরুষ। বহুবিবাহ নিবারণে সনাতন ধর্মরক্ষণী সভার দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিবাদে তারানাথ সভার সদস্যপদ ত্যাগ করেন। শুধু তাই নয়, বহুবিবাহ সম্পর্কে বিদ্যাসাগরের মতের সমালোচনা করে পুস্তিকাও লেখেন তিনি। কেন তারানাথ বিদ্যাসাগরের প্রতি এতখানি বিরূপ হয়ে উঠলেন, তার কারণ আমরা যথাস্থানে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছি। শুধু সনাতন ধর্মরক্ষণী সভার সঙ্গেই নয়, এইকালে গঠিত আরো দু'একটি হিন্দু ধর্মরক্ষা সমিতির সঙ্গে বিদ্যাসাগর যুক্ত হয়ে পড়েন। সমাজসংস্কার সম্পর্কেও তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি পালটাতে থাকে। এর ফলে বিধবাবিবাহ প্রবর্তন ছাড়া তাঁর অন্যান্য কাজকর্মকে রক্ষণশীল হিন্দুরা প্রশংসার চোখে দেখতে থাকেন। সনাতন ধর্মরক্ষণী সভার উৎসাহী সদস্য মনোমোহন বসুর 'মধ্যস্থ' পত্রিকা এইকালে বিদ্যাসাগরের সমর্থনে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে। সহবাস সম্মতি বিষয়ে বিদ্যাসাগরের ভূমিকার তারিফ করলেন রক্ষণশীল হিন্দুরা। এ-বিষয়ে বিদ্যাসাগরের ভূমিকা রক্ষণশীল পত্রিকায় প্রশংসিত হবার কিছু বিবরণ আমরা দিয়ে এসেছি। এইকারণেই বিদ্যাসাগরের মৃত্যুর পর 'অনুসন্ধান', 'সুবোধিনী'র মতো রক্ষণশীল পত্রিকাও বিধবাবিবাহ ছাড়া তাঁর অন্যান্য সমস্ত কাজকর্মের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে। রক্ষণশীল হিন্দুদের বিদ্যাসাগর সম্পর্কে ধারণা কতখানি পালটে গিয়েছিল, তার উদাহরণ কালীকৃষ্ণ দেব বা অক্ষয়চন্দ্র সরকারের আচরণ থেকে পরিষ্কার। বিদ্যাসাগরের এই দুই কঠোর সমালোচক কালক্রমে বিদ্যাসাগর-অনুরাগীতে পরিণত হতে ও তাঁর গুণগান করতে ইতস্তত করেননি।

বিদ্যাসাগর যে যুগের সন্তান, সে যুগে সমাজব্যবস্থায় ব্যক্তির প্রাধান্য সূচিত হতে

আরম্ভ করেছে। মধ্যযুগীয় বাঙালিসমাজে ব্যক্তির ভূমিকা ছিল নিতান্ত নগণ্য। কিন্তু উনিশ শতকের সূচনা থেকে গোষ্ঠীকে অতিক্রম করে সমাজে ব্যক্তিই হয়ে উঠতে থাকেন প্রধান। বাঙালিসমাজে এর প্রথম উদাহরণ রামমোহন রায়। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের এই জয়যাত্রা বিদ্যাসাগরেও অব্যাহত। বিদ্যাসাগরের যাবতীয় প্রয়াস বা যাবতীয় সংগ্রাম তাই একক প্রয়াস বা একক সংগ্রাম। বিদ্যাসাগরের কিছু অনুরাগী থাকলেও, কোনো দল ছিল না। তাঁর বিরোধীপক্ষও কিন্তু ছিল না সংগঠিত। যে কারণে বিদ্যাসাগর সম্পর্কে একই গোষ্ঠীভুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য ধরা পড়ে। অর্থাৎ বিদ্যাসাগরের নিন্দা-প্রশংসার গোটা ব্যাপারটা দাঁড়িয়ে আছে ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্কের ওপর।

ব্যক্তিগত সম্পর্কের এই ঘাত-প্রতিঘাত আরো জমে ওঠে একটি বিচিত্র মানসিকতাকে কেন্দ্র করে। উনিশ শতকে যাঁরা বাংলা সাহিত্যচর্চা করতেন মোটামুটি-ভাবে তাঁরা ছিলেন দুটি দলে বিভক্ত—ইংরেজিনবিশ আর সংস্কৃতনবিশ। ইংরেজি-নবিশরা তাঁদের সাহিত্যের আদর্শ গ্রহণ করেছিলেন পাশ্চাত্য থেকে, আর সংস্কৃত-নবিশরা সংস্কৃত সাহিত্য অবলম্বনেই সৃষ্টি করতেন সাহিত্যসম্ভার। সমাজের মতো সাহিত্যক্ষেত্রেও দলাদলি ছিল। যে কারণে ইংরেজিনবিশ লেখকরা সংস্কৃতনবিশদের কিছুটা অবজ্ঞার চোখে দেখতেন। দেখলে কি হবে, সংস্কৃতনবিশ একজন লেখকই ধীরে ধীরে বাংলার শ্রেষ্ঠ লেখকের সম্মানজনক আসনটি অধিকার করে নেন। ব্যাপারটাকে মেনে নিতে না পারলেও, উনিশ শতকের সত্তরের দশকের আগে এর প্রতিবাদ জানাতে তেমনভাবে কেউ এগিয়ে আসেননি। ১৮৬৫-তে বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাব—কয়েক বছরের মধ্যে সাহিত্যক্ষেত্রে তিনি নিজের স্থান করে নিলেন। করে নিলেও, বাংলার শ্রেষ্ঠ লেখকের সম্মান কিন্তু পেতে লাগলেন ঈশ্বর-চন্দ্র। একজন অনুবাদক ও পাঠ্যপুস্তকলেখক এই সম্মান পেতে পারেন কিনা এই কালেই সে সম্পর্কে প্রশ্ন তুললেন কেউ কেউ। ১৮৭২-এ বঙ্কিমচন্দ্রের সম্পাদনায় 'বঙ্গ-দর্শন' প্রকাশিত হবার কিছুদিনের মধ্যে বঙ্কিম-অনুরাগী এক লেখকগোষ্ঠী গড়ে ওঠে। এই লেখকগোষ্ঠী বিদ্যাসাগরের সমালোচনায় এগিয়ে এলেন। এই ক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করলেন বঙ্কিমচন্দ্রের দুই কাছের মানুষ—অক্ষয়চন্দ্র সরকার ও হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। অক্ষয়চন্দ্রের 'সাধারণী' আর সঞ্জীবচন্দ্রের 'ভ্রমর' সেকালে বিদ্যাসাগর-বিরোধী পত্রিকা হিসাবে পরিচিত ছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে সেকালের বিশিষ্ট লেখক দামোদর মুখোপাধ্যায়ের আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিল, দামোদর মুখোপাধ্যায় 'প্রবাহ' নামে একটি পত্রিকা সম্পাদনা করতেন। 'প্রবাহ' সাহিত্যসেবক বিদ্যাসাগরকে কি চোখে দেখত তা বলে এসেছি। বঙ্কিমের অন্য এক অনুরাগী রমেশচন্দ্র দত্ত বিদ্যাসাগরকে বড়মাপের সাহিত্যিক বলে মনে করতেন না। বঙ্কিম-অনুরাগী শ্রীশচন্দ্র মজুমদারও বিদ্যাসাগরের সমালোচনায় কুণ্ঠাবোধ করেননি। সাহিত্যক্ষেত্রে এই দলাদলি কত তীব্র ছিল চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়ের আচরণেই তা প্রমাণিত। প্রথমজীবনে 'জ্ঞানাঙ্কুরে' তিনি বিদ্যাসাগরের

পক্ষ সমর্থনে কিভাবে এগিয়ে আসেন তা আমরা দেখেছি। 'জ্ঞানাঙ্কুরে' প্রকাশিত তাঁর 'বিদ্যাবিড়ম্বনা' লেখাটি পড়ে বঙ্কিমচন্দ্র মুগ্ধ হন এবং তাঁকে বঙ্গদর্শনের লেখক-গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত করে নেন। এরপর চন্দ্রশেখর আর কখনও বিদ্যাসাগরের সমর্থনে কলম ধরেননি। বঙ্কিম গোষ্ঠীভুক্ত হবার পর তাঁর নিজস্ব পত্রিকা 'মাসিক সমালোচক'-এ বিদ্যাসাগরকে আক্রমণ করে লেখা প্রবন্ধ ছাপতেও তিনি ইতস্তত করেননি। তবে বিদ্যাসাগরের সঙ্গে ইংরেজিশিক্ষিত গোষ্ঠীর একাংশের পরিচয় ছিল নিবিড়। এঁরা বিদ্যাসাগরের প্রশংসায় ছিলেন উচ্চকণ্ঠ। প্রসঙ্গত দীনবন্ধু মিত্রের নাম স্মরণীয়। বিদ্যাসাগরের অন্যতম জীবনীকার সুবলচন্দ্র মিত্র জানিয়েছেন, বিদ্যাসাগরের সঙ্গে দীনবন্ধু মিত্রের সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। দীনবন্ধুর মৃত্যুর পর বিদ্যাসাগর নিয়মিত তাঁর স্ত্রী-পুত্রের খবরাখবর নিতেন। এই ঘনিষ্ঠতার জন্যই দীনবন্ধু বিদ্যাসাগরকে ললিত মধুর বাংলাভাষার জনক বলতে ইতস্তত করেননি। বাঙালি সম্পাদিত সেকালের দুটি বিখ্যাত ইংরেজি পত্রিকা 'হিন্দু পেট্রিয়ট' ও 'ওয়েল-উইশার'-এর সম্পাদকের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও কৃষ্ণদাস পালের আমলে 'হিন্দু পেট্রিয়ট' কিভাবে বিদ্যাসাগরের বিভিন্ন কাজকে সমর্থন জানিয়েছিল তা আমরা বলে এসেছি। আর 'ওয়েলউইশার' সম্পাদক প্যারীচরণ সরকার তো ছিলেন তাঁর বিশ্বস্ত বন্ধুদের অন্যতম। তাঁর যেসব বন্ধু কোনো অবস্থাতেই তাঁকে ত্যাগ করেননি—প্যারীচরণ তাঁদের অন্যতম।

ব্যক্তিগত জীবনে বিদ্যাসাগর অনেককে জীবনে প্রতিষ্ঠা পেতে সাহায্য করেছিলেন, চরম দুঃসময়ে এগিয়ে গিয়ে অনেককে উদ্ধার করেছিলেন বিপর্যয়ের হাত থেকে। বিদ্যাসাগরের এই করুণাধারায় যাঁরা সিক্ত হয়েছিলেন, তাঁদের অনেকেই পরবর্তীকালে বিদ্যাসাগর সম্পর্কে প্রচুর উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন। নবীনচন্দ্র সেনের নাম প্রসঙ্গত স্মরণীয়। নবীনচন্দ্র সেনকে বিদ্যাসাগর কিভাবে সাহায্য করেছিলেন তার বিবরণ স্বয়ং নবীনচন্দ্রই দিয়ে গেছেন 'আমার জীবন'-এ। যখন তাঁর জীবনের সব আশা নিভে গেছে, তখন তিনি বিপদভঞ্জন হরির শরণ নিলেন, 'তিনি প্রহ্লাদের মত আমাকেও তাঁহার নরমূর্তিতে দেখা দিলেন। সেই নরনারায়ণ শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।' 'পলাশির যুদ্ধ' বইটি 'দয়ারসাগর' বিদ্যাসাগরকে উৎসর্গ করতে গিয়ে তিনি তাঁর কাছে নিজের ঋণ স্বীকার করে বললেন :

'যে যুবক দুঃখের সময়ে অশ্রুজলে একদিন আপনার চরণ অভিষিক্ত করিয়াছিল, আজি সেই যুবক আবার আপনার শ্রীচরণে উপস্থিত হইল। আপনার আশীর্বাদে ততোধিক আপনার অনুগ্রহে, আজি তাহার বদন প্রফুল্ল, হৃদয় আনন্দে পরিপূর্ণ। আপনার দয়াসাগরের বিন্দুমাত্র সিঞ্চনে দরিদ্রতা দাবানল হইতে সেই মানস কানন রক্ষা পাইয়াছিল, আজি সেই কানন প্রসূত একটি ক্ষুদ্র কুসুম আপনার শ্রীচরণে উৎসর্গীকৃত হইল'।

ব্যক্তিগত এই কৃতজ্ঞতাবোধের জন্যই রামগতি ন্যায়রত্ন তাঁর 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য

বিষয়ক প্রস্তাব'-এ বিদ্যাসাগরের উচ্ছ্বসিত গুণকীর্তন করেন। মনে রাখব, রামগতি শুধু বিদ্যাসাগরের প্রিয় ছাত্রই ছিলেন না, রামগতির সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত সম্পর্কও ছিল অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। এই ঘনিষ্ঠতার জন্যই বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদর্শন'-এ রামগতিকে তীব্রভাবে আক্রমণ করেন। এই আক্রমণে ব্যথিত হয়ে সমকালে একজন মন্তব্য করেন :

'যদি বঙ্গদর্শনের ন্যায় পত্রিকাও এইরূপ বিদ্বেষ ও বাচালতা প্রকাশের স্থল হইয়া উঠিল, তবে আর যৎসামান্য পত্রিকা হইতে উহার প্রভেদ কোথায়।...বঙ্গদর্শন... ন্যায়রত্ন মহাশয়কে বৃথা তিরস্কার করিয়া স্বীয় গৌরবের মস্তকে পদাঘাত করিতে যথেষ্ট যত্ন পাইয়াছেন।'

ব্যক্তিগত জীবনে বিদ্যাসাগর যেমন অনেকের উপকার করেছিলেন, তাঁর কার্যকলাপ আবার কারো কারো স্বার্থকে ক্ষুণ্ণ করে। এইসব মানুষদের কেউকেউ পরবর্তীকালে বিদ্যাসাগরের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হন। মদনমোহন তর্কালঙ্কারের সঙ্গে প্রথমজীবনে বিদ্যাসাগরের যতখানি সুসম্পর্ক ছিল, শেষজীবনে ততখানি ছিল না। মদনমোহনের জনপ্রিয় গ্রন্থ 'শিশুশিক্ষা'র স্বত্ব বিদ্যাসাগরের হাতে চলে যাওয়ায় মদনমোহনের আত্মীয়দের গভীর ক্ষোভ ছিল। এই ক্ষোভ থেকেই মদনমোহনের জামাই যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ বারবার বিদ্যাসাগরকে লোকচক্ষে হেয় করার চেষ্টা করেন। পাঠ্যপুস্তক নির্বাচনকালে ও প্রকাশক হিসাবে বিদ্যাসাগরের কার্যকলাপ কারোকারো স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করেছিল। যেসব বইকে তিনি ছাত্রপাঠ্য বিবেচনা করেননি, সেইসব গ্রন্থের লেখক বা প্রকাশকরা অনেক সময়ই বিদ্যাসাগরের তীব্র সমালোচনা করেছিলেন। বহুবিবাহের বিরুদ্ধে বিদ্যাসাগরের ভূমিকা লক্ষ্য করে কোনো কোনো কুলীন ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। বিদ্যাসাগরের প্রয়াস সফল হলে তাঁদের ব্যবসা উঠে যাবে—এই আশঙ্কা থেকে কেউ কেউ বিদ্যাসাগরকে আক্রমণ করলেন। 'হালিসহর পত্রিকা'য় প্রকাশিত এই ধরনের একটি আক্রমণের পরিচয় আমরা দিয়ে এসেছি।

সমকালীন কয়েকজন বিশিষ্ট বাঙালির সঙ্গে বিদ্যাসাগরের সম্পর্ক ভালো ছিল না। বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের বিরোধকাহিনী সুপরিচিত, কিন্তু ভূদেব মুখোপাধ্যায় ও রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক কতখানি জটিল ছিল তা অনেকেরই অজানা। বিদ্যাসাগর ও ভূদেব দুজনেই একসময় সরকারি শিক্ষাবিভাগের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। দুজনেই ছিলেন সেকালের জনপ্রিয় পাঠ্যপুস্তকলেখক। দুজনেরই সাহেবমহলে প্রতিপত্তি ছিল। শিক্ষাবিভাগে বিদ্যাসাগরের প্রধান মুরুব্বি ছিলেন শিক্ষাসমাজের কর্মাধ্যক্ষ মোয়াট (শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন জানিয়েছেন, বিদ্যাসাগরের বাদুড়বাগানের বাড়িতে মার্শাল, বেথুন ও মোয়াটের প্রতিমূর্তি ছিল। বিদ্যাসাগর প্রতিদিন ঐ প্রতিমূর্তিগুলি একবার না দেখে থাকতে পারতেন না—কারণ এই তিনজনই ছিলেন তাঁর 'উন্নতি, প্রতিপত্তি ও মানসম্ভ্রমের আদি কারণ'[১৩])। ভূদেব ছিলেন উড্রোর প্রিয়পাত্র। উড্রোর জন্যই তাঁর চাকরিতে উন্নতি হয়, ভূদেবের পদোন্নতির

জন্য মিসেস উড্রোও ছিলেন উদ্‌গ্রীব। মোয়াটের সঙ্গে উড্রোর সম্পর্ক ভালো ছিল না। সেইকারণে মোয়াটের প্রিয়পাত্র বিদ্যাসাগরকেও উড্রো প্রীতির চোখে দেখতেন না। অনুরূপ কারণেই উড্রোর প্রিয়পাত্র ভূদেবকে বিদ্যাসাগর একেবারেই পছন্দ করতেন না। রুশ সম্রাট পিটারের জীবনচরিত লিখে ভূদেব মুখোপাধ্যায় ভার্নাকুলার লিটারেচর সোসাইটির হাতে দেন। বইটি কৃষ্ণমোহন ছাপার জন্য মনোনীত করেন, কিন্তু বিদ্যাসাগর আপত্তি করায় এটি প্রকাশিত হয়নি।[১৪] 'শিক্ষাবিধায়ক প্রস্তাব' বইটি ভূদেব বিদ্যাসাগরকে দিতে গেলে তিনি বিদ্রূপ করে বলেন, 'এই যে ক্লেম দেওয়া হইয়াছে।' ভূদেব-চরিতকারের মতে 'ভূদেব বাবু নর্মাল স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদপ্রাপ্তির সুবিধা করার জন্য সত্বরে শিক্ষাসম্বন্ধীয় ঐ পুস্তকখানি লিখিয়া ফেলিয়াছেন, এইরূপ মনে করিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় উক্তরূপ 'দাবি দেওয়ার' কথা বলিয়াছিলেন।'[১৫] ভূদেবও বিদ্যাসাগরের ভদ্রঘরে বিধবাবিবাহ প্রবর্তনের চেষ্টা এবং স্কুলপাঠ্য বইতে শুধু বিদেশিদের আদর্শপুরুষ হিসাবে দেখানোর তীব্র সমালোচনা করতেন। সৃষ্টিক্ষমতা বলতে যা বোঝায় তা যে বিদ্যাসাগরের নেই একথা ভূদেব 'ভ্রান্তিবিলাস'-এর সমালোচনা করতে গিয়ে বলেন। সমকালে বিদ্যাসাগরের খুব কম বই-ই এত নির্মমভাবে সমালোচিত হয়েছিল। বিদ্যাসাগরের যেমন প্রিয়পাত্র ছিলেন রামগতি ন্যায়রত্ন, ভূদেবের তেমনি যশোদানন্দন সরকার। যশোদানন্দন তাঁর পত্রিকায় বিদ্যাসাগরের সঙ্গে ভূদেবের তুলনামূলক আলোচনা করার ফল কি হয়েছিল, তা আমরা বলে এসেছি। শেষবয়সে অবশ্য ভূদেবের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের 'বড়ই প্রীতিকর সম্বন্ধ জন্মিয়াছিল।' সমকালীন আর এক বিশিষ্ট ব্যক্তি রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সঙ্গেও বিদ্যাসাগরের সম্পর্ক ভালো ছিল না। রাজেন্দ্রলাল ইংরেজি ও সংস্কৃত দুটি ভাষাই ভালো জানতেন, সাহেবমহলেও তাঁর প্রতিপত্তি ছিল। বেশ কয়েকটি পাঠ্যপুস্তক তিনি লিখেছিলেন। রাজেন্দ্রলালকে বিদ্যাসাগর সহ্য করতে পারতেন না। কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, 'আমি কখনও তাঁহাকে রাজেন্দ্রলাল মিত্র, Revd. K.M. Banerjee প্রভৃতি তাঁহার সমকক্ষদিগকে সমুচিত প্রশংসা করিতে শুনি নাই।' রাজেন্দ্রলাল কতখানি ধূর্ত তা বোঝাতে গিয়ে বিদ্যাসাগর বলতেন, 'ও লোকটা ইংরাজিতে একজন ধনুর্দ্ধর পণ্ডিত, কহিতে লিখতে খুব মজবুত, কিন্তু সাহেবদের কাছে বোলে বেড়ায়—ইংরাজি আমি যৎসামান্য জানি; যদি আমার কিছু জানাশুনা থাকে তো সংস্কৃত শাস্ত্রে। ইহাতে সাহেবরা মনে ভাবেন—বাসরে, ইংরাজিতে এত সুপণ্ডিত হোয়ে যখন সে বিদ্যাকে যৎসামান্য বলে, তখন না জানি সংস্কৃততে এর কতই বিদ্যা আছে।' এই ধরনের লোকরা সাহেবদের কাছে পশার জমিয়ে তোলায় বিদ্যাসাগর ক্ষোভপ্রকাশ করেন। ব্যাপারটা কিন্তু একতরফা ছিল না। রাজেন্দ্রলালও বিদ্যাসাগরকে পছন্দ করতেন না, বিদ্যাসাগরের ভুল-ত্রুটি সন্ধানে তিনি ছিলেন ব্যস্ত। বেথুন সোসাইটির একটি অধিবেশনে রাজেন্দ্রলাল কিভাবে বিদ্যাসাগরকে অপদস্থ করার চেষ্টা করেন সে পরিচয় আমরা দিয়ে এসেছি।

বিদ্যাসাগরের সংস্কৃতজ্ঞানের গভীরতা সম্পর্কে তাঁর মনে সংশয় ছিল বলেই তিনি তাঁকে প্রাচীনপন্থী সংস্কৃত পণ্ডিতদের দলভুক্ত করতে চাননি। তিনি মনে করতেন ইংরেজিভাষা ও সাহিত্যচর্চা তাঁর সংস্কৃতজ্ঞানকে সমৃদ্ধ করেছে। তবে গদ্য-সাহিত্যে বিদ্যাসাগরের অবদান তিনি স্বীকার করতেন।[১৬]

বিদ্যাসাগরের ছাত্ররা অধিকাংশই গুরুর গৌরবে গৌরব অনুভব করতেন। কিছুটা ব্যতিক্রম কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য। কৃষ্ণকমল বিদ্যাসাগরের সীমাবদ্ধতা খুব ভালোভাবেই জানতেন এবং সেগুলি জনসমক্ষে প্রকাশ করতে দ্বিধা করেননি। প্রশ্ন জাগে এ কাজ কৃষ্ণকমল করলেন কেন? কারণটা কৃষ্ণকমল নিজেই বলে গেছেন। বিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও কৃষ্ণকমল একবার দারান্তর গ্রহণের জন্য আকুল হয়ে ওঠেন। এ নিয়ে নানা কথা রটতে থাকায় বিদ্যাসাগর একদিন তাঁকে বলেন—'আমার বন্ধুবান্ধব আমায় কি বলে জানিস? তুই আমার কথা শুনিস, চিরকাল তুই আমার বাধ্য। আমি যদি তোকে এই বিয়ে করতে বারণ করি, তা হলে তুই শুনবি আমার কথা।' কৃষ্ণকমল উত্তর দিলেন—'আপনি কেন তাঁদের বলেন না যে, আমি আপনার কথা না শুনতে পারি; আমি আপনার অবাধ্য।' এই কথা শুনে বিদ্যাসাগরের ধারণা হয়, কৃষ্ণকমল তাঁকে অবজ্ঞা করছেন। এর পর থেকে কৃষ্ণকমল বিদ্যাসাগরের বিরাগভাজন হন। বিরাগভাজন হবার পরই কৃষ্ণকমল বিদ্যাসাগরের সীমাবদ্ধতা প্রকাশে উৎসাহী হয়ে ওঠেন। বিদ্যাসাগর যে দোষশূন্য পুরুষ ছিলেন না, তা তাঁর আর এক ঘনিষ্ঠ সঙ্গী শিবনাথ শাস্ত্রীও জানতেন। জানা সত্ত্বেও বিদ্যাসাগরের এইসব 'উৎকট দোষ' তিনি জনসমক্ষে প্রকাশ করেননি।

সবমিলিয়ে একটা জিনিস পরিষ্কার, যাঁদের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের সুসম্পর্ক ছিল বা যাঁরা প্রত্যক্ষভাবে বিদ্যাসাগরের দ্বারা উপকৃত হয়েছিলেন, তাঁরা তাঁর গুণকীর্তনে যতটা সোচ্চার, অন্যরা ততখানি নন। ঠিক তেমনি সমকালে বিদ্যাসাগরের সঙ্গে যাঁদের ছিল স্বার্থের বিরোধ বা ব্যক্তিত্বের সংঘাত, বিদ্যাসাগরের সমালোচনার যাবতীয় দায়দায়িত্ব তাঁরা তুলে নিয়েছিলেন নিজেদের কাঁধে। সমকালীন নিন্দা-প্রশংসার মধ্য দিয়ে বিদ্যাসাগরের যে ছবিটি বেরিয়ে আসে, সেটিও কিন্তু কম উজ্জ্বল নয়। আর নয় বলেই, বিদ্যাসাগর আজও বাঙালিসমাজে সমাদৃত এক পুরুষ হয়ে আছেন, থাকবেন-ও।

নির্দেশিকা